১৬ মার্চ ১৯৯৪ ❑ আনন্দবাজার প্রকাশন ❑ দশ টাকা

আনন্দমেলা

- লীলা মজুমদারের গল্প : কাশী-কাহিনী
- কেরিয়ার গাইড : ভর্তি ও চাকরির পরীক্ষার নানা খবর
- বিদেশি খেলোয়াড়দের কদর বাড়ছে স্পেনে
- ব্যাডমিন্টনে ইন্দোনেশিয়াই সেরা
- খেলার অঙ্ক

স্কুলে কম্পিউটার

স্কুলজীবনে কম্পিউটার শিক্ষা মানেই ভবিষ্যৎ-জীবনে অনেকটা এগিয়ে থাকা। দৈনন্দিন জীবনে কম্পিউটার কী কী সাহায্য করে ?

এখন

কেম্ব্রিজ প্রস্তুত করছে বম্বে থেকে মেল অর্ডার মারফৎ আধুনিক ফ্যাশনের শার্ট্

এ এক মেল-অর্ডার-সার্ভিস। তাঁদের জন্যে যাঁরা বম্বেতে এসে কেম্ব্রিজের শো- রূমে দ্যাখা করতে পারেননা - যেখানে আছে নানা ধরণের অনন্য শার্টের সম্ভার যেগুলি সঠিক ভাবে তৈরী করা হয় উচ্চমানের ফ্যুজিং এবং নিখুঁত সেলাই-এর দ্বারা।

পূরো দামের ৫০% এখন পাঠান। বাকীটা দিতে হবে ভী.পী.পী.-র দ্বারা ডেলিভারীর সময়। কুপনটি বিবরণ-সহ ভরুন এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, এ্যাকাউণ্ট কেম্ব্রিজ টেক্সটোরিয়্যাম নামের ৫০% দামের মানিঅর্ডার/ড্রাফ্‌ট সহ ডাক মারফৎ এই ঠিকানায় পাঠান -

কেম্ব্রিজ টেক্সটোরিয়্যাম,
করতার ভবন,
১২১, শহীদ ভগতসিংহ রোড, কোলাবা,
বম্বে ৪০০ ০০৫।

ছবিতে দেখানো শার্টগুলি পূরো হাতার শার্ট

৪২ সাইজের শার্টগুলির জন্যে শার্ট প্রতি ৫ টাকা ক'রে বেশী লাগবে।

Cambridge বম্বের সর্বাধিক বিক্রীর শার্ট্‌স্

NAME :

ADDRESS :

ITEM CODE	NO OF PIECES	COLLAR SIZE	COLOUR	PRICE
VA 2			RED ☐ BLUE ☐ BLACK ☐	Rs.
VA 3			RED ONLY ☐	Rs.
VA 60			WHITE ☐ CREAM ☐ BLUE ☐	Rs.
VA 54			RED ☐ BLUE ☐	Rs.
			Add Rs.10/- per shirt as mailing costs.	Rs.
			TOTAL	Rs.
			50% of TOTAL Rs.	

* ডেলিভারীর জন্যে অর্ডার পাবার পর ১৫টি কাজের দিনের সময় লাগতে পারে।
* টেকনিক্যাল কারণে শার্টের রং-এ সামান্য হের-ফের হতে পারে।

VENART 071 BN

২ চৈত্র ১৪০০ ❑ ১৬ মার্চ ১৯৯৪ ❑ ১৯ বর্ষ ২৫ সংখ্যা

আনন্দমেলা

প্রচ্ছদকাহিনী
স্কুলে কম্পিউটার বিমল বসু, অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী ১৪
সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)
ভূতের বিচার শিবতোষ ঘোষ ৬০
ধারাবাহিক উপন্যাস
মন্দারগড়ের রহস্যময় জ্যোৎস্না বিমল কর ৭৫
শিউলি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৭৭
গল্প
কাশী-কাহিনী লীলা মজুমদার ৬
ইতিহাসে প্রথম চুনীলাল রায় ৩৬
এখন দুঃখ করার কোনও মানে হয় না
শিবায়ন ঘোষ ৫৫
কমিক্স
টিনটিন ৩১, অরণ্যদেব ৫৩, গোয়েন্দা শার্লক হোম্‌স ৬৯, আর্চি ৭১,
গাবলু ৭৩, টারজান ৭৪
বিশ্ববিচিত্রা
ফুলের নাম মুগানগোয়া কাজল চক্রবর্তী ৫
প্রাণিবিজ্ঞান
আড়াই হাজার বছর আগেও...অভিষেক বসু ২৫
বিশেষ নিবন্ধ
গোপালচন্দ্র ছিলেন স্বভাববিজ্ঞানী মালা ভট্টাচার্য ২৬
অ্যাডভেঞ্চার
হিমালয়কে দেবতার আসনে...সুমন ভট্টাচার্য ৩৩
বাইরের জানালা
কথা বলার সমস্যা দূর করবে...পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী ৫৯
ইতিহাস
সলোমন রাজার রত্নভাণ্ডার...সুব্রত রায় ৭৯
কবিতা
আমার আছে চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৬৬
কেরিয়ার গাইড
ভর্তি ও চাকরির পরীক্ষার খবর অমর দাশ ২৮
খেলাধুলো
ডেভিস কাপে আমেরিকার...সমীরণ সেন ৪৪
বিদেশি খেলোয়াড়দের কদর...দিব্যজ্যোতি মুখোপাধ্যায় ৪৫
ব্যাডমিন্টনে ইন্দোনেশিয়াই সেরা প্রতাপ জানা ৪৬
বিশ্বকাপে মাঝমাঠের সেরা...তানাজি সেনগুপ্ত ৫০
খেলার খবর ৪৯, খেলার অঙ্ক ৫২
রঙিন পোস্টার : জন্টি রোড্‌স ৪১
নিয়মিত বিভাগ
চিঠিচাপাটি ৪, কুইজ ৮, বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১১, ক্যাম্পাস ৩৫,
শব্দসন্ধান ৬৪, বিনোদন ৬৮, আঁকিবুকি ৭৮, হাসিখুশি ৭৮,
বইয়ের খবর ৮১, নানারকম ৮২
প্রচ্ছদ
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক : দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম ১০ টাকা।
বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

১৪

বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য আবিষ্কার কম্পিউটার। জটিল অনেক বিষয়ের চটপট সমাধান করে দিতে পারে এই যন্ত্রটি। কম্পিউটার ছাড়া আজকের জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা অসম্পূর্ণ। একেবারে স্কুল স্তরেই কম্পিউটার শেখানো হচ্ছে আজকাল। আমাদের এই রাজ্যও পিছিয়ে নেই। বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রদের হাতে-কলমে কম্পিউটার শেখানো হচ্ছে, যাতে তারা প্রথম থেকেই এই যন্ত্রটির আশ্চর্য কর্মক্ষমতার পরিচয় পায়। এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ-জীবনে তাদের আরও কাজে লাগবে। ঠিক কোন ধরনের কম্পিউটার এখানকার ছাত্রদের শেখানো হচ্ছে, লেখাপড়ার কাজে তা ছাত্রদের কতটা সাহায্য করছে, এ নিয়েই এবারের প্রচ্ছদকাহিনী। দৈনন্দিন জীবনে যখন আরও বেশি করে কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে, তখন ছাত্রছাত্রীরা এই প্রচ্ছদকাহিনী থেকে কিছু পথনির্দেশ পেতে পারবে।

৫০

ফুটবল এখন অঙ্কের নিয়মে খেলা হয়। আগে থেকেই ছক ঠিক করা থাকে। সেইমতো খেলোয়াড়দের নির্দেশ দিয়ে থাকেন কোচ। কোচের 'স্ট্র্যাটেজি'-র অনেকটাই আবার নির্ভর করে মাঝমাঠের খেলোয়াড়দের দক্ষতার ওপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসন্ন বিশ্বকাপে মাঝমাঠের খেলোয়াড়দের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা যাবে।

৬

কাশীর হনুমানরা জগদ্বিখ্যাত। তাদের জ্বালায় ছাদে কাচা কাপড়, কিংবা বড়ি বা আমসত্ত্ব, বা আচার কি আমসি শুকনো দায় হয়ে উঠেছিল। ...লীলা মজুমদারের গল্প 'কাশী-কাহিনী'।

■ আগামী সংখ্যা ■

বিশেষ কমিক্স সংখ্যা

টিনটিনের
সম্পূর্ণ কমিক্স
চাঁদে টিনটিন

দু' সংখ্যায় সমাপ্য টিনটিনের সম্পূর্ণ কমিক্স। পুরোটাই রঙিন। আগাগোড়াই রোমাঞ্চে ভরপুর আশ্চর্য এক চিত্রকাহিনী।

এ ছাড়াও অন্যান্য নিয়মিত কমিক্স

চিঠিচাপাটি

নতুন ডাইনোসর

শুভসরাস প্রচ্ছদকাহিনী (৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৩) বেশ ভাল লেগেছে। ট্রায়াসিক, জুরাসিক যুগ সম্বন্ধে আগেও কয়েকটি লেখা পড়েছিলাম। কিন্তু এবার ১০ বছরের ছেলে শুভর অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার আমাদের রীতিমত অবাক করে দিয়েছে। চিঠি লিখতে লিখতে ভাবছি, আমি কি কোনও অলীক কল্পনার রাজ্যে আছি? শুভর চেয়ে চার বছরের বড় হয়েও মাটি খুঁড়ে কিছু একটা আবিষ্কার করতে পারলাম না! শুভর বুদ্ধি ও সৌভাগ্যের প্রশংসা করতেই হয়। শুভর এই আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা যাঁরা 'আনন্দমেলা'য় লিখেছেন, তাঁদের লেখারও প্রশংসা করছি এইসঙ্গে। বিজ্ঞানের অত্যন্ত কঠিন একটা বিষয়কে তাঁরা সহজভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন।

অর্ণবকুমার দাস
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ,
পুরুলিয়া

■ *এ-সম্পর্কে আরও চিঠি লিখেছেন : উত্তম অধিকারী, বারাতলা, বাহিরকুঞ্জ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ; সপ্তর্ষি ভৌমিক, শ্রেয়া মজুমদার, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি ; অর্ণব মুখোপাধ্যায়, নেপাল ভট্টাচার্য ফার্স্ট লেন, কলকাতা-২৬ ; সুজিত দাস, লিচুবাগান, কাঁচড়াপাড়া*

প্রিয় খেলোয়াড়দের ছবি

একদিনের ক্রিকেট নিয়ে 'আনন্দমেলা'র ২৪ নভেম্বর সংখ্যায় যে প্রচ্ছদকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে, তা খুবই সময়োপযোগী। কারণ, সেদিনই ছিল ইডেনে হিরো কাপের সেমিফাইনাল। শুধু খেলাধুলোই নয়, মাঝে-মধ্যেই আপনারা এ-ধরনের সময়োপযোগী প্রচ্ছদকাহিনী ও অন্যান্য নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এভাবে আপনারা সমকালীন অনেক বিষয়কেই যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এর ফলে আনন্দমেলা এখনকার পাঠকদের খুব কাছাকাছি আসতে পেরেছে। পত্রিকার জনপ্রিয়তাও বেড়েছে। তবে খেলাধুলোর বিষয়ে একটা কথা বলার আছে। রঙিন পোস্টার নিয়মিত বেরোয় না কেন? খেলোয়াড়দের বড়-বড় ছবি অনেকেই ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে। বিশেষ করে প্রিয় খেলোয়াড়দের ছবি। তাই নিয়মিত পোস্টার প্রকাশ করলে ভাল হয়। আমার মনে হয়, অনেক পাঠকই এই কথাটায় সায় দেবেন।

সমীর করগুপ্ত
কলকাতা-২৯

একদিনের ক্রিকেটের সংগ্রহযোগ্য পরিসংখ্যান

আমি একজন ক্রিকেট-অনুরাগী। ২৪ নভেম্বর ও ৮ ডিসেম্বর 'আনন্দমেলা' পত্রিকায় একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পরিসংখ্যান দেওয়ার জন্য তাই আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু ৮ ডিসেম্বর সংখ্যায় একদিনের ক্রিকেটের সেরা ১০ ব্যাটসম্যানের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে দশম ব্যাটসম্যান হিসেবে সেলিম মালিকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেরা ১০ ব্যাটসম্যানের তালিকায় দশম ব্যাটসম্যান হবেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন। ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৩ পর্যন্ত পরিসংখ্যান তা'ই বলে। আমার মনে হয়, লেখক এই বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন। তবে আবার জানাই, এত বড় একটা পরিসংখ্যান দেওয়ার জন্য লেখকের সাধুবাদ প্রাপ্য। সংখ্যা দু'টি সংগ্রহে রাখার মতো।

দীপাঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ব্যারাকপুর,
উত্তর ২৪ পরগনা

একদিনের ক্রিকেট সংখ্যাটি পড়লাম। এই সংখ্যাটি আমার মন জয় করেছে। প্রচ্ছদকাহিনীটি পড়ে একদিনের ক্রিকেট সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারলাম। তবে সবচেয়ে খুশি হয়েছি একদিনের সমস্ত আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলির পূর্ণ পরিসংখ্যান পেয়ে। কয়েকজন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের পোস্টার থাকলে ভাল হত। ভবিষ্যতে টেবল টেনিস নিয়ে একটি প্রচ্ছদকাহিনী ছাপলে খুব খুশি হব। এ ছাড়া, 'বিজ্ঞানে এবারের নোবেল' প্রবন্ধটিও ভাল লেগেছে।

শান্ত চ্যাটার্জি
মধ্যমগ্রাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগনা

■ *এই প্রসঙ্গে আরও যাঁরা চিঠি লিখেছেন : অসীমকুমার সামন্ত, গড়বেতা, মেদিনীপুর ; অনিল আগরওয়াল, মাজদিয়া, নদীয়া ; পূষণ আচার্য, বেলেঘাটা মেন রোড, কলকাতা-১০ ; সঞ্জু নাথ, হাইলাকান্দি, অসম ; সুব্রতকুমার দাস, গারিফা, উত্তর ২৪ পরগনা ; সুস্মিতা দত্ত, যাদবপুর, কলকাতা-৩২ ; জয় রায়, চন্দননগর, হুগলি ; ত্রিদিব সরকার, জলপাইগুড়ি ; অনন্যা মাইতি, গড়িয়া, কলকাতা-৮৪ ; কাজরি ঘোষ দস্তিদার, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৪০*

ক্রিকেটের পরিসংখ্যান

একদিনের ক্রিকেট বিশেষ সংখ্যাটি এক কথায় দারুণ হয়েছে। যেসব পরিসংখ্যান দিয়েছেন, তা ক্রিকেট অনুরাগীরা সংগ্রহে রাখবেন। কিন্তু এক জায়গায় তানাজি সেনগুপ্ত লিখেছেন, প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক খেলায় অস্ট্রেলিয়া চার উইকেটে জিতেছিল। আবার হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিসংখ্যানে দেখলাম, অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল পাঁচ উইকেটে। কোনটা ঠিক?

দেবদুলাল মণ্ডল,
মাথাভাঙা, কোচবিহার

■ *অস্ট্রেলিয়া পাঁচ উইকেটে জিতেছিল। এটাই সঠিক পরিসংখ্যান।*

ভূমিকম্প

প্রচ্ছদকাহিনী 'কেন এই ভূমিকম্প' ভাল লাগল। ভাল লাগল ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত বিভিন্ন স্থানের ছবিগুলি। ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা এই ছবিগুলিতে দারুণভাবে ফুটে উঠেছে। ভারতের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলির একটি মানচিত্র পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু সারা পৃথিবীর ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার একটি মানচিত্র থাকলে ভাল হত।

অম্বরীশ মল্লিক
সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯

ভূমিকম্প নিয়ে অনেক কিছু জানার ছিল। প্রচ্ছদকাহিনীটি (২৭ অক্টোবর, ১৯৯৩) পড়ে বেশ কিছু তথ্য জানতে পারলাম। প্রাকৃতিক অন্যান্য বিপর্যয় নিয়ে এরকম একটি প্রচ্ছদকাহিনী প্রকাশ করুন।

শৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বেহালা ☛

বিশ্ববিচিত্রা

ফুলের নাম মুগানগোয়া

কোরিয়ার জাতীয় ফুল মুগানগোয়া একসময় রোগব্যাধির উপশমে ব্যবহার হত। এই ফুলের পাপড়ি থেকে জার্মানির মানুষ তৈরি করতেন চা। লিখেছেন **কাজল চক্রবর্তী**

সুপ্রাচীনকাল থেকেই কোরিয়াতে ছিল একরকম ফুল, যার নাম 'মুগানগোয়া'। মাঝারি মাপের, লম্বা সোনালি ডাঁটিওয়ালা এই ফুলটি কোরিয়ার সংস্কৃতি এবং জনজীবনের নানা উত্থান-পতনের সঙ্গে, নিজেকে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। তাই আজ 'মুগানগোয়া' কোরিয়ার জাতীয় ফুল।

ফুলটি কোরিয়াতে পাওয়া যায় খ্রিস্ট জন্মেরও বহু আগে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে তারও আগে থেকে ফুলটির অস্তিত্ব কোরিয়ার উপদ্বীপে প্রচুর পরিমাণে দেখা গিয়েছিল। এই ফুলটির কথা আমরা প্রথম জানতে পারি রাজা হুগোং ওয়াং-এর লেখা একটা চিঠি থেকে। চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন তাং সম্রাটকে। সেখানে অনেক দুঃখে তিনি বলছেন যে, এই সেই মুগানগোয়ার দেশ, যা খুবই সুজলা সুফলা ছিল, তা ক্রমেই রুক্ষ হয়ে পড়ছে দিনে-দিনে।

কুনওয়া হচ্ছে মুগানগোয়ার আসল (পূর্বতন) নাম। 'কুনওয়ার দেশ' বলতে লোকে কোরিয়াকে বোঝায়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোরিয়াতে এই ফুল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত।

১৮৯০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কোরিয়াবাসীদের জীবনের এক অন্ধকার সময়। যখন জাপান কোরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন এই ফুলটি লাগানো বা এই ফুল গাছ পোঁতা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এমনকী, জাপানিরা ফতোয়া জারি করেছিলেন যে, কেউ মুগানগোয়ার গাছ পুঁততেই পারবে না। জাতীয় প্রতীককে বিলুপ্ত করে একটা জাতিকে, একটা দেশকে নিশ্চিহ্ন করতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হয়েছে। কোরীয়দের দমিয়ে রাখা যায়নি।

তারা জাপানিদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়েও এই মুগানাগোয়ার গাছ পুঁতত। এবং কোরিয়ান মেয়েরা তাদের কাপড়ে এই ফুলের নকশা দিয়ে কোরিয়ার ভৌগোলিক সীমানা ফুটিয়ে তুলত এবং গর্ব অনুভব করত। এই ফুলটিকে কেন্দ্র করে কোরীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের বিকাশ হতে লাগল এবং এই ফুলের গুচ্ছকেই তারা নিজেদের ঐক্যের প্রতীক বলে ভাবতে শুরু করল।

খুবই মজার ব্যাপার যে, একজন চিনা ভৌগোলিকের নথি থেকেও এই ফুলের বিষয়ে জানা যায়। যেখানে লেখা আছে যে, একটি দেশ যখন সভ্যতার আলো দেখছে,

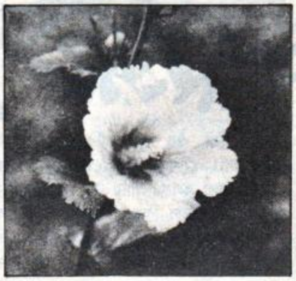

মুগানগোয়া

এই সেই মরণজয়ী ফুল

অর্থাৎ দেশের মানুষ সভ্য হয়ে পরিচ্ছদ এবং অস্ত্রের ব্যবহার শিখছে, যুদ্ধ করাকে ঘৃণা করতে শিখছে, বাঘকে পোষ মানাতে শিখছে, তখন সেখানে প্রচুর পরিমাণে মুগানগোয়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে ফোটে এবং সন্ধেবেলা ঘুমিয়ে পড়ে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুগানগোয়া হচ্ছে কোরিয়ার আদি অকৃত্রিম মৌলিক দেশীয় ফুল।

মুগানগোয়া আবার 'হিবিশ্‌কাস' বা 'রোজ অব শ্যারন' নামেও পরিচিত। 'হিবিশ্‌কাস' কথাটার উৎপত্তি পারসিক 'হিবিস' শব্দ থেকে, যিনি মিশরের সৌন্দর্যের দেবতা। এই ফুলগুলি নাতিশীতোষ্ণ জায়গাতেই বেশি দেখা যায়। এদের প্রজাতি প্রায় ১০০। মুগানগোয়া ফুলের পাতলা, ছড়ানো পাতায় আছে অনেক শিরা, ফুলগুলি দেখতে বেশ বড় আকারের ঘণ্টার মতো এবং সাধারণত সেগুলি চার রঙের হয়। গাঢ় বেগুনি, গোলাপি, হলদে এবং সাদা। এর পাঁচটি করে পাপড়ি থাকে। জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের প্রথম পর্যন্ত এই ফুল বেঁচে থাকে। তাই এর নাম মুগানগোয়া বা মৃত্যুঞ্জয়ী ফুল।

এই গাছ জনজীবনে খুবই উপকারী। আগেকার দিনে চিকিৎসকরা মুগানগোয়া ফুল নানা রোগব্যাধির উপশমে, বিশেষত চর্মরোগ সারানোর কাজে ব্যবহার করতেন। জার্মানির মানুষ এর পাপড়ি থেকে চা তৈরি করতেন ও জাপানিরা এই ফুল দিয়ে তৈরি করতেন লোভনীয় খাবার।

কোরীয়রা এখনও বেঁচে আছে। অনেক চেষ্টা করেও তাদের ধ্বংস করা যায়নি। এই মুগানগোয়াকেও শত চেষ্টায়ও নির্মূল করা যায়নি। দু'জনেরই এই বেঁচে থাকার লড়াইয়ের মানসিকতার জন্য হয়তো এই ফুল কোরীয়দের জীবনে, তাদের সাহিত্য, সংস্কৃতিতে জাতীয় ফুল হিসেবে গর্বের বস্তু হয়ে উঠেছে। হয়তো এই ফুলের মাধ্যমেই কোরীয়রা আজ আরও ঐক্যবদ্ধ। তারা বেঁচে থাকার লড়াই ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

গল্প

কাশী-কাহিনী

লীলা মজুমদার

আমার এক ননদের কাছে সেকালের কাশী সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য গল্প শুনেছি। তা ছাড়া, প্রায় ৬০ বছর আগে নিজেও কাশী গিয়ে স্বচক্ষে অনেক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার দেখে এসেছি। সে কাশীকে এখন খুঁজো না, কারণ, পাবে না।

সেকালে আমার শ্বশুরবাড়ির অনেক আত্মীয়স্বজন মনের পবিত্রতা-রক্ষার জন্য এবং জিনিসপত্রের শস্তা দরের কারণে, খানকতক ঘর ভাড়া করে, কিংবা ছোটখাটো একটা বাড়ি কিনে বা তৈরি করে, শেষ জীবনটা সুখেশান্তিতে কাটাবার আশায় কাশীবাসী হতেন। অনেকের আত্মীয়রা কাশীতেই কাজকর্ম করতেন, তাই কাশীবাসী হওয়াটা কিছু বিদেশ যাওয়ার মতো মনে হত না।

নীরদদিদি সম্পর্কে হন আমার পিসতুতো ননদ, ওঁরা কাশীতেই বারো মাস থাকতেন; ওঁর স্বামী আর পরে ওঁর ছেলেরাও ওখানেই চাকরিবাকরি করতেন। কলকাতার আত্মীয়স্বজনরা অনেক সময় ওঁদের বাড়ি উঠতেন। ভারী অতিথিবৎসল ছিলেন সবাই। হেসে বলতেন, "আমাদের বাড়িতেই উঠো, ভাই। বড্ড খুশি হব। তবে হনুমানদের সঙ্গে বনিয়ে সংসার করতে হবে। এসে দ্যাখোই না, ভালই লাগবে।"

কাশীর হনুমানরা জগদ্বিখ্যাত। শ্রীরামের অনুচর তো, ওঁর সঙ্গে নাকি ওরাও স্বর্গে গিয়েছিল। সেখানে যারা থেকে গিয়েছিল, তাদের কথা বলতে পারি না, কিন্তু কাশীর হনুমানদের স্বভাব কিছু বদলায়নি। এদিকে কে না জানে যে, তাদের মারলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। ফলে আশকারা পেয়ে-পেয়ে অন্তত কাশীর হনুমানরা একটা বড়-গোছের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তাদের জ্বালায় ছাদে কাচা কাপড়, কিংবা বড়ি বা আমসত্ত্ব বা আচার কি আমসি শুকনো দায় হয়ে উঠেছিল। যা ছাদের রোদে দেওয়া যায়, তাই চেখে খেয়ে চেটে চিবিয়ে, মাটিতে ছিটিয়ে সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড করত। কাপড়চোপড় রোদে দিলে, সেগুলো টেনে ছিঁড়ে, মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে, আচার, বড়ি ঘেঁটেঘুঁটে এমন একটা যাচ্ছেতাই অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে, কাশীর বারোমেসে বাসিন্দারা সমস্ত ছাদটাকে শক্ত তারের জালের খাঁচায় বন্দি করে ফেলতেন। হনুমানরা কিছু করতে না পেরে আশপাশে ছোঁকছোঁক করে বেড়াত।

নীরদদিদির বাড়ির নীচে একটু বাঁধানো উঠোন ছিল। একফালি বাগানও ছিল, তার ফলপাকুড় অবশ্য হনুমানজির আত্মসেবায় লাগত। তবে ওই একটু খোলা হাওয়ার পথ ছিল। রান্নাঘর লাগোয়া একটা চওড়া বারান্দা ছিল। সেখানে বড় গুমোট। রাতের রান্না দুপুরে সেরে ফেলে, বিকেলে গা ধুয়ে, ওই বারান্দায় মোড়ায় বসে নীরদদিদি বড়-বড় মোটা-মোটা আটার রুটি সেঁকছেন আর মাঝে-মাঝে উঠোনের ওপাশের একতলা বাড়িটার ছাদের দিকে তাকাচ্ছেন।

আমার ননদও সেখানে ছিলেন, তাঁর কাছেই গল্পটা শোনা। তিনি দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে বসে নীরদদিদির সঙ্গে গল্প করছেন। হেনকালে একটা প্রকাণ্ড কেঁদো হনুমান কে জানে কোত্থেকে জোগাড় করে বিরাট একছড়া বড়-বড় কলা নিয়ে, পাশের বাড়ির ছাদে এসে বসে, ভালমানুষের মতো মুখ করে, রুটি সেঁকা দেখতে লাগল। যেন শেখার ইচ্ছে!

রুটি সেঁকা সারা হলে, নীরদদিদি উঠে রান্না ঘরে ঢুকেছেন একটা ডেকচি আনতে। রুটিগুলো ঢাকা-চাপা দিয়ে উনুনের পাশে রেখে দেবেন, গরম থাকবে। সঙ্গে-সঙ্গে ভগবান হনুমান এক লাফে ছাদ থেকে নেমে থালাসুদ্ধু হাত-রুটি তুলে নিয়ে পুনরায় পূর্বস্থানে ফিরে গেলেন।

ডেকচি হাতে ফিরে এসে নীরদদিদির সে কী আক্ষেপ! সবাইকে গঞ্জনা দিতে লাগলেন, "তোমরা কী! ওকে তাড়াতে পারলে না!" অবশ্য তিনি ভাল করেই জানতেন ভগবান হনুমানকে ঠেকানো সহজ নয়।

হাঁ করে তাঁর কাণ্ড দেখা ছাড়া কোনও উপায়ই রইল না। তিনি ওইখানে বসে নির্বিকার মুখে একটা করে পাকা কলা গরম রুটিতে জড়িয়ে নিজের সেবায় লেগে গেলেন! শেষ কলাটি মুখ-স্থ করেছেন, এমন সময় সদর দরজায় নীরদদিদির ছেলের গলা শোনা গেল। অমনই এক নিমেষে থালাটি উঠোনে নামিয়ে রেখে শ্রীভগবান পাঁচিল টপকে অন্তর্ধান করলেন।

সব শুনে ছেলে হেসেই কুটোপাটি! দেবতার সঙ্গে রেষারেষি করে কেউ কখনও জেতে নাকি! ভালই তো! আর-এক তরফা তাজা-তাজা রুটি করো আর আমরা গরম-গরম খাই।"

নীরদদিদির কাছে আর-একটা আশ্চর্য গল্প শুনেছিলাম। একদিন সকালে তিনি প্রতিদিনের মতো রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। কানে আসছে দূরে কোথায় দুই দল হনুমানে ঝগড়া লেগেছে! এমন সময় কে কড়া নাড়ল। মনে পড়ে গেল দুপুরের দিকে কাপড়-কাচা বউয়ের আসার কথা ছিল। খুব সকালেই সে এসে গেছে।

উঠোন পেরিয়ে দরজা খুলেই নীরদদিদি হাঁ! একটি মা-হনুমান, দু' হাতে নিজের বুকে কী একটা জাপটে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে তখনও হনুমানদের ঝগড়া চলেছে। মা-হনুমান সে কী করুণভাবে দু' চোখ তুলে নীরদদিদির মুখের দিকে চেয়ে, দু' হাত বাড়িয়ে ধরল।

নীরদদিদি অবাক হয়ে দেখেন, খুদে এক হনুমানের ছানা! চোখ বোজা, মনে হয় দিন-সাতেকের বেশি নয়। আর বলতে হল না। সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের-মা হনুমানের মায়ের মনের দুঃখ বুঝে নিলেন। ছানাটাকে নিজের বুকে তুলে নিয়ে মা-হনুর দিকে চেয়ে বললেন, "কোনও ভয় নেই। আমার কাছে ও নিরাপদে থাকবে। পরে এসে নিয়ে যেয়ো।"

সঙ্গে-সঙ্গে মা-হনু ছুটে বেরিয়ে গেল, পিসি এক হাত বাড়িয়ে খিড়কিদোরে খিল দিলেন। হনুমানদের হট্টগোলটা যেন অন্য দিকে সরে গেল মনে হল।

নীরদদিদি চিন্তিত মুখে ছানাটাকে বুকে করে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। তিনি জানতেন, এ-ব্যাপারে বাড়ির পুরুষদের সহানুভূতি পাবেন না। মায়ের মনের কথা তারা কিচ্ছু জানে না। ভাগ্যিস, কেউ বাড়ি নেই।

নীরদদিদি একটা বড় জুতোর বাক্সে, পুরনো নরম ন্যাকড়া দিয়ে বিছানা করে ছানাটাকে শোওয়ালেন। ন্যাকড়ার পলতে দিয়ে তার মুখে কয়েক ফোঁটা দুধ দিয়ে, মুখ মুছিয়ে, বাক্সসুদ্ধু নিজের ঠাকুরঘরের তাকে তুলে রাখলেন। ও-ঘরে অন্যদের প্রবেশ নিষেধ।

সারাদিনে আরও চার-পাঁচবার বাচ্চাটা দুধ খেল। বার-দুই ন্যাকড়া বদলাতে হল। কেমন যেন বড্ড মায়া লাগছিল। হাসি পাচ্ছিল ভেবে, ঠাকুরঘরে হনুমান সেঁধিয়েছে জানলে ছেলেরা কী বলবে! সুখের বিষয়, সারাদিন বাড়িতে তিনি ছাড়া কেউ ছিল না।

বেলা বাড়বার অনেক আগেই হনুদের লড়াই মিটে গিয়েছিল। দূরে মন্দিরে ঘন্টা বাজছিল। কোথায় যেন স্তবগান হচ্ছিল। আর সব চুপচাপ।

গা ধুয়ে, সন্ধ্যা দেবেন বলে প্রদীপ জ্বালছেন, এমন সময় খিড়কিদোরে কে যেন ভয়ে-ভয়ে টোকা দিল। দোর খুলতেই মা-হনুমান নিঃশব্দে ঢুকে, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। নীরদদিদিও সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুরঘরে গিয়ে, বাক্স থেকে বাচ্চা তুলে এনে তার মায়ের কোলে দিলেন।

এক মুহূর্তের জন্য দুই মায়ের দৃষ্টি বিনিময় হল। তারপরেই হনু-মা ছানা বুকে করে খিড়কিদোর পেরিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল।

নীরদদিদিও তাঁর খুদে অতিথির সব চিহ্ন সরিয়ে ফেলে দিয়ে, হাত-পা ধুয়ে নিশ্চিন্ত মনে আটা মাখতে বসলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, কে যেন কোথায় মনের আনন্দে গান গাইছে।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

কুড়ি

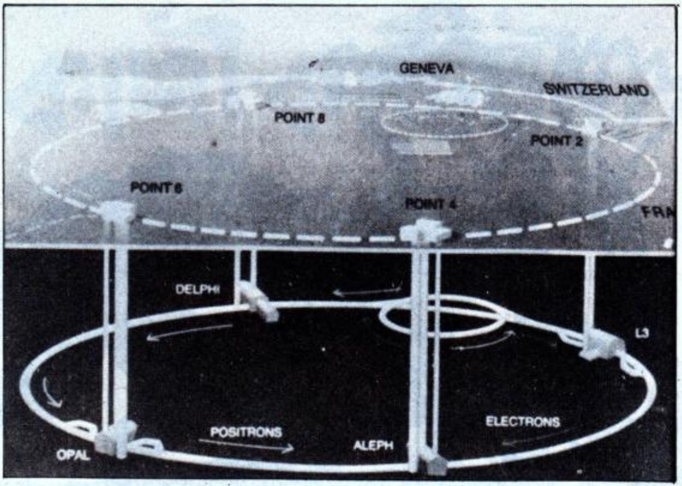

আশ্চর্য ইলেকট্রন

একটা পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে 'নিউক্লিয়াস'। এই নিউক্লিয়াসের চারদিকে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘোরে ইলেকট্রন।

এ পর্যন্ত সবচেয়ে হালকা ও স্থায়ী যে কণিকা জানা গেছে তা হল ইলেকট্রন। এর ঋণাত্মক আধান। এর চেয়ে কম আধানসম্পন্ন কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। আর ইলেকট্রনের ভরকে যদি গ্রামে প্রকাশ করতে হয়, তা হলে দশমিকের পরে ২৭টা শূন্যর পরে একটা নয় বসাতে হবে। অর্থাৎ প্রায় ভরশূন্য। পরমাণুর ভেতরে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। ঠিক যেভাবে সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহরা ঘুরছে। গ্রহরা যেমন নিজেদের অক্ষের চারদিকে পাক খেতে-খেতে ঘুরতে থাকে, ইলেকট্রনও তেমনই দুটো বিপরীত দিকে পাক খেতে-খেতে ঘুরতে থাকে।

ফার্মি-ডাইর‍্যাক গবেষণায় 'ফার্মিয়ন' বলে যে কণিকা চিহ্নিত করা হয়েছিল, ইলেকট্রন সেই শ্রেণীতেই পড়ে। সবচেয়ে মজার কথা, ইলেকট্রন দুর্বল তড়িৎচুম্বকীয় ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। অথচ খুব শক্তিশালী কম দূরত্বের নিউক্লীয় বল যা প্রোটন ও নিউট্রনকে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে বেঁধে রাখে, তা ইলেকট্রনকে প্রভাবিত করে না। ইলেকট্রনের ঠিক বিপরীতধর্মী, ধনাত্মক আধানযুক্ত সমান ভরের প্রতিপক্ষ কণিকা হল পজিট্রন। পজিট্রন অবশ্য উচ্চশক্তির পদ্ধতি ছাড়া উদ্ভূত হয় না। সেটাই যা আশার কথা। কারণ ইলেকট্রন ও পজিট্রন একসঙ্গে পজিট্রোনিয়াম গঠন করে এবং পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। আর দু'জনের ভর আইনস্টাইনের শক্তি = ভর × (আলোকের বেগ)^{২} অনুযায়ী গামা রশ্মিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আমরা জানি যে, ইলেকট্রন পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের চারদিকে কক্ষপথে ঘোরে আর এদের মধ্যের আকর্ষণ শক্তি ইলেকট্রনকে পরমাণুতে বেঁধে রাখে। প্রতিটি কক্ষপথকে কয়েকটা উপকক্ষপথে ভেঙে ফেলা যায় এবং পরমাণুর বাইরের দিকে যতই যাওয়া যায়, এই উপকক্ষপথের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কোনও উপকক্ষপথেই এক জোড়ার বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে না। তাই নিউক্লিয়াসের একেবারে কাছের কক্ষপথে দুটো, তারপরের কক্ষপথে আটটা, তারপরেরটায় ১৮টা,এভাবে ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

একেবারে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রনের ওপর কেন্দ্রের আকর্ষণের প্রভাব অনেক কম থাকে বলে সহজেই পরমাণু থেকে বের করে নেওয়া সম্ভব। ইলেকট্রনই পরমাণুর বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে থাকায় পরমাণুর আয়তন ইলেকট্রনের ওপরই নির্ভর করে। এ ছাড়াও ইলেকট্রনই ঠিক করে দেয়, সেই পরমাণু আর একটা পরমাণুর ওপর কীভাবে কাজ করবে এবং তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণে কীভাবে প্রভাবিত হবে। ১৯২৪ সালে লুইস ডি ব্রগলি জানিয়েছিলেন, যে-কোনও কণিকার মতো ইলেকট্রনেরও তরঙ্গদৈর্ঘ্য আছে এবং যত বেগ বাড়ে তত তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছোট হয়। অর্থাৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্য = ধ্রুবক কণিকার ভরবেগ। যে-কোনও কণিকার মধ্যে তরঙ্গের ধর্ম বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় আবিষ্কার। যে-কোনও পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান। পজিট্রন অস্থায়ী কণিকা। তাই ইলেকট্রনের ঋণাত্মক আধান (=১.৬×১০^{-১৯} কুলম্ব) ও প্রোটনের ধনাত্মক আধান সমান হওয়ায় পরমাণু নিষ্ক্রিয় ও আধানশূন্য হয়।

ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে পরমাণু ধনাত্মক আধানযুক্ত আয়ন ও ইলেকট্রন যুক্ত হলে পরমাণু ঋণাত্মক আধানযুক্ত আয়ন গঠন করে। ইলেকট্রনের ব্যাস প্রোটনের ব্যাসের এক-সহস্রাংশেরও কম, ভরের দিক থেকেও প্রোটনের তুলনায় খুব কম।

একটা পরমাণুর বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে থাকে ইলেকট্রন। কিন্তু ইলেকট্রনের ভর তা সত্ত্বেও পরমাণুর ভরের তুলনায় প্রায় কিছুই নয়। যে-কোনও পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান। ইলেকট্রনের ঋণাত্মক আধান প্রোটনের ধনাত্মক আধানের সমান হয় বলে পরমাণু হয় আধানশূন্য। অথচ ইলেকট্রনের ব্যাস প্রোটনের ব্যাসের এক-সহস্রাংশের থেকেও কম।

আর ইলেকট্রনের ভর যদি গ্রামে প্রকাশ করতে চাই তা হলে দশমিকের পরে সাতাশটা শূন্যের পরে নয় বসাতে হবে। ১৮৯৭ সালে জোসেফ জে থমসন ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন, তাঁর ১৬ বছর পরে ১৯১৩ সালে রবার্ট মিলিকান ইলেকট্রনের আধান নির্ণয় করেন।

প্রশ্ন

নিল ও'ব্রায়েন

(১) চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে কী নামে পরিচিত ছিলেন সঙ্গীতকার আর· ডি· বর্মন ? **শিলাদিত্য চক্রবর্তী**, আলিপুরদুয়ার কলেজ।
(২) ভারতে প্রথম রেল-যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রচলন করেন কে ? **বাবন কর**, আলিপুরদুয়ার।
(৩) বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্বর্ণভাণ্ডারটি কোথায় ? **কথাকলি ভট্টাচার্য**, সন্তোষপুর, কলকাতা।
(৪) "মাধ্যাকর্ষণই আমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী"— কোন বিখ্যাত অ্যাথলিট করেছেন এই মন্তব্যটি ? **শ্রেয়সী ভৌমিক**, সর্বমঙ্গলা পল্লী, মালদা।
(৫) 'রুদালি' চলচ্চিত্রের কাহিনীকার কে ? **মৃগাঙ্ক মৌলি মর্দন্যা**, কুলগোড়া, পুরুলিয়া।
(৬) বাংলা সাহিত্যে 'অনিলা দেবী' ছদ্মনামে লিখেছেন কে ? **মৃন্ময় রায়**, নিউটাউন, আলিপুরদুয়ার।
(৭) রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কত সালে ? **অয়ন ভট্টাচার্য**, নাকতলা, কলকাতা।
(৮) এক বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯০৭ সালে। কে তিনি ? **সুপ্রিয় কর্মকার**, দমদম, কলকাতা।
(৯) এস· কে· এফ· লিন দলের একমাত্র 'গ্র্যান্ডমাস্টার' ফুটবলার কে ? **দীনেশকুমার ঘোষ**, একব্বরপুর, হাওড়া।
(১০) ভারতের রাষ্ট্রপতি পদের জন্য একবার এক বিশিষ্ট নর্তকীর নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল। তাঁর নাম কী ? **বিশ্ববন্ধু দত্ত**, উত্তরপাড়া, হুগলি।
(১১) কী বিষয়ে গবেষণার জন্য বিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছিলেন মাদাম কুরি ? **রূপান্তর ভট্টাচার্য**, যোধপুর পার্ক, কলকাতা।
(১২) ডিম্পল কাপাডিয়া সম্প্রতি কোন বাংলা ছবিতে অভিনয় করলেন ? **রাজেশ রায়**, যাদবপুর, কলকাতা।
(১৩) ছোটদের কল্পকাহিনীর চরিত্র পিটার র‍্যাবিটের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে ১৯৯৩ সালে। বিখ্যাত এই চরিত্রটির স্রষ্টা কে ? **শুভব্রত সরকার**, ভেনাস স্কোয়ার, কোচবিহার।
(১৪) হোভার-ক্রাফটের আবিষ্কারক কে ? **রাজশ্রী দাস**, রামচন্দ্রপুর, হাওড়া।
(১৫) টিনটিনের স্রষ্টা 'হার্জে'-এর প্রকৃত নাম কী ? **শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী**, উত্তরপাড়া রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়।
(১৬) নেপালের পার্লামেন্টকে কী নামে ডাকা হয় ? **রূপন পাল**, মডার্ন পার্ক, কলকাতা।
(১৭) 'ইনভিজিব্‌ল ম্যান' গল্পের লেখক কে ? **শৌনক সিংহ রায়**, মির্জাপুর রোড, কলকাতা।
(১৮) 'দ্য ওরিজিন অব স্পিসিস' গ্রন্থের লেখক কে ? **ভাস্করব্রত পতি**, পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর।
(১৯) 'মিডনাইট্‌স চিলড্রেন' গ্রন্থটি লিখেছেন কে ? **শমিত চট্টোপাধ্যায়**, চম্পাসারি, শিলিগুড়ি।
(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

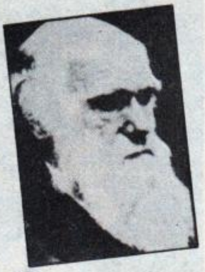

গত সংখ্যার উত্তর

(১) সুস্মিতা সেন।
(২) জাপানের আকিরা কুরোশাওয়া।
(৩) রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব ডাগ হ্যামারশিল্ড।
(৪) অযোধ্যার নবাব আফাক-উদ-দৌলা।
(৫) আল্লারাখা।
(৬) হো চি মিন।
(৭) ভলাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ।
(৮) ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, সার সি. ভি. রমন।
(৯) আর. ই. ফস্টার।
(১০) মেরিলিন মনরো।
(১১) প্রখ্যাত সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট।
(১২) হোয়াইট সক্স।
(১৩) 'দ্য রেড ভাইন'।
(১৪) সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।
(১৫) ইতালির রবার্তো বাজ্জিও।
(১৬) অনুরাধা পড়োয়ালের ছেলে আদিত্য।

সুস্মিতা সেন

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

আদিত্য পড়োয়াল

আল্লারাখা

বিষয় : বিবিধ

প্রশ্ন

(১) কোন ভারতীয় মনীষীর নামে সবচেয়ে বেশি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে ?
(২) উত্তর কেরলের তেল্লিচেরি অঞ্চল কোন ধরনের বিনোদনের জন্য বিখ্যাত ?
(৩) অ্যাস্টেরিক্স তার কোন অভিযানে ভারতে এসেছিল ?
(৪) 'সুপারম্যান'-এর জন্মদিন কবে ?
(৫) 'লপ স্টপ'-এ তুমি কী খাও ?
(৬) বোম্বাই-এ যাকে 'পানি-পুরি' বলা হয়, কলকাতায় তাকে আমরা কী নামে ডাকি ?
(৭) 'ফাইডেলিটি' নামে স্পিডবোটটি রয়েছে কাদের হেফাজতে ?
(৮) 'মেরিলেগ্স' ও 'জিনজার' কোন কাল্পনিক চরিত্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ?
(৯) কোন চলচ্চিত্রে রাহুল রায় বাঘে রূপান্তরিত হয়েছেন ?
(১০) সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' ছবিতে অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শা-র চরিত্রে অভিনয় করেছেন কে ?
(১১) রান্নাঘরের প্রতিদিনের ব্যবহারের কোন জিনিসটি দিয়ে বল পয়েন্ট পেনের কালির দাগ তোলা যায় ?
(১২) পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্রটির নাম বলতে পারো ?
(১৩) রঞ্জি ট্রোফি ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ শতরানকারী কে ?
(১৪) কোন ক্রীড়াবিদকে 'পায়োলি এক্সপ্রেস' নামে ডাকা হয় ?
(১৫) হিন্দু পুরাণের কোন বিখ্যাত চরিত্রের মৃত্যু হয়েছিল গোড়ালিতে তীর বিঁধে ?
(১৬) রামের ধনুক নির্মাণ করেছিলেন কোন দেবতা ?
(১৭) পৃথিবীর সর্বোচ্চ যুদ্ধক্ষেত্র কোনটি ?
(১৮) পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষিণের রাজধানী শহর কোনটি ?
(১৯) কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতীকচিহ্ন 'জায়েন্ট পাণ্ডা' ?
(২০) এশিয়ার সিংহ পাওয়া যায় একটিই মাত্র অরণ্যে । তার নাম বলতে পারো ?
(২১) আরজুমান্দ বানু বেগমকে আমরা কী নামে চিনি ?
(২২) ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের কোন শহরে এসেছিলেন ?
(২৩) ঘড়ির বিজ্ঞাপনে সর্বদাই একটি বিশেষ সময় ব্যবহৃত হয় । সেটি কোন সময় ?

(ক)

(খ)

(গ)

প্রশ্ন

(ক) জার্মান সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব । কে ইনি ?
(খ) মেদিনীপুর জেলার তমলুকের এক বিখ্যাত মন্দির । নাম বলতে পারো ?
(গ) 'আ ব্রিফ হিস্টরি অব টাইম' বইটির লেখক এই বিজ্ঞানী মহাকাশবিদ্যায় নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন ? এঁকে চিনতে পারো ?

ছবির পরিচয় : (ক) উলফগ্যাঙ ভন গেটে । (খ) বর্গাভীমার মন্দির । (গ) স্টিফেন হকিং ।

মহাত্মা গান্ধী

প্রশ্নগুলি সংকলিত হয়েছে 'নিউ বোনাভিটা বুক অব নলেজ' (প্রথম খণ্ড) থেকে ।

উত্তর : (১) মহাত্মা গান্ধী । (২) এই অঞ্চলে রয়েছে অনেক সার্কাসের ট্রুপ । (৩) অ্যাস্টেরিক্স অ্যান্ড দ্য ফ্লাইং কার্পেট । (৪) ২৯ ফেব্রুয়ারি । (৫) ক্যাডবেরি'জ ডলপস আইসক্রিম । (৬) ফুচকা । (৭) দ্য হার্ডি বয়েজ । (৮) ব্ল্যাক বিউটি । (৯) জুনুন । (১০) আমজাদ খান । (১১) দুধ । (১২) সূর্য । (১৩) শচীন তেণ্ডুলকর । (১৪) পি· টি· উষা । (১৫) কৃষ্ণ । (১৬) বিশ্বকর্মা । (১৭) সিয়াচেন হিমবাহ । (১৮) নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটন । (১৯) ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফাণ্ড । (২০) গির অরণ্য । (২১) মমতাজ মহল । (২২) কালিকট । (২৩) ১০টা বেজে ১০ মিনিট ।

বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে

নতুন ইলেকট্রনিক নোটবুক

এটি বের করেছে জাপানের বিখ্যাত তোশিবা কোম্পানি। এতে আছে দুটি স্পিকার, যা দিয়ে গান বা কথা শোনা যায়। ভিডিও ক্যাসেট এবং কমপ্যাক্ট ডিস্ক বা সি ডি চালানোরও ব্যবস্থা আছে এই যন্ত্রে। আছে একটি ছোট্ট ভিডিও স্ক্রিন, যা বাক্সের ঢাকনার মতো খুলে দেখা যায়, প্রয়োজনে বন্ধও করা যায়। একে বলা হচ্ছে, কমপ্লিট মাইক্রোমিডিয়া সিস্টেম।

এক্সপ্লোরেশন বাব্‌ল

একসময় নৌকো বা জাহাজ থেকে নদী বা সমুদ্রে যখন ডুবুরি নামানো হত, জলের নীচে শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য থাকত একটা লাইফ-লাইন। যা আসলে রবারের লম্বা নল, ওপর থেকে অক্সিজেন পৌঁছে দিত ডুবুরির নাকে। এর পর ১৯৪৩ সালে বেরিয়ে গেল অ্যাকোয়া-লাং, জলের নীচে অক্সিজেন সিলিন্ডারযুক্ত শ্বাসযন্ত্র, যা পিঠে বেঁধে নিয়ে ডুবুরি মুক্তভাবে ইচ্ছেমতো ঘোরাফেরা করতে পারে। কাচের ঢাকনা দেওয়া জল ও বায়ু নিরোধক মুখোশ এবং উপযুক্ত পোশাক পরা ডুবুরি চালিয়ে যেতে পারে সমুদ্রের নীচে নানা অনুসন্ধানের কাজ। এরই নাম 'স্কুবা-ডাইভিং'। পুরো কথাটা হল Self-Contained

Underwater Breathing Apparatus, যার সংক্ষেপ হল, SCUBA। বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে স্কুবা-ডাইভিং ডুবুরি অনুসন্ধানের কাজে বিপ্লব নিয়ে আসে। শুধু অনুসন্ধান নয়, স্পোর্টস হিসেবেও স্কুবা-ডাইভিং খুব জনপ্রিয়। তবে ডুবুরির পোশাক বিবর্তন স্কুবাতেই থেমে নেই। এর যেমন অনেক উন্নতি হয়েছে, তেমনই দেখা দিয়েছে নতুনতর মডেল। 'এক্সপ্লোরেশন বাব্‌ল' নামে এই যন্ত্রটি তারই এক সাম্প্রতিকতম নজির। স্কুবা মাস্ক-এর বদলে জ্যাকেটের মতো জিনিসটি ডুবুরিরা পরে নিতে পারেন। অক্সিজেন-সিলিন্ডার অবশ্য আলাদা। প্লেক্সিগ্লাসের তৈরি এই জ্যাকেটের ওজন ৩০ পাউন্ড। এর সঙ্গে আছে একটি প্রোপালশন ইউনিট, মোটরচালিত একরকম ব্যবস্থা, যা ডুবুরিকে বিভিন্ন দিকে চালিয়ে নিয়ে যায়, হাত-পা ছুড়ে সাঁতার কাটতে হয় না। এটি পরে ডুবুরি ৪০ ফুট গভীরতায় নামতে পারেন।

ভয়ে, ভালবাসায়, ক্রোধে, আনন্দে রং বদলায় বহুরূপী...

যুদ্ধবাজ গিরগিটি

নানা সাজে সেজে বহুরূপীরা বাড়ি-বাড়ি যায় বকশিশ আদায় করতে। এক শ্রেণীর মানুষের এটা পেশা। রুজিরোজগারের অন্যতম উপায়। প্রাণিজগতেও বহুরূপী আছে, যারা আসলে এক শ্রেণীর গিরগিটি, ইংরেজি নাম ক্যামেলিয়ন, আমরা বলি 'বহুরূপী'। ইচ্ছেমতো দেহের রং বদলাতে পারে ওরা। রাগলে, ভয় পেলে বা খুশি হলে ওরা বদলে ফেলে গায়ের রং। ছবিতে দেখা যাচ্ছে যুদ্ধোদ্যত এমনই দুই বহুরূপীকে। মাদাগাস্কারের ওই বহুরূপীদের বলা হয় 'প্যান্থার-ক্যামেলিয়ন' বা 'ব্যাঘ্র-বহুরূপী'। পুরুষরা আকারে বেশ বড়সড়, ফুট দুয়েক লম্বা। রেগে গেলে এমনই রং খেলায় যে, দেখে মনে হবে যেন নিয়ন আলো। ডান দিকের বহুরূপী পুঙ্গব সারা দেহে সেই রঙের আলো জ্বালিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হয়ে একেবারে ফুঁসছে। প্রতিদ্বন্দ্বীটি অবশ্য এখনও চেগে ওঠেনি, যেন শান্তভাবে মেপে নিচ্ছে চ্যালেঞ্জারের শক্তি, তাই তার গায়ের রং এখনও নরম সবুজ। ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে তারও জ্বলে উঠতে দেরি হবে না। নিজের অঞ্চলের দখল রাখতে পুরুষ প্যান্থার-ক্যামেলিয়নরা প্রায়ই একে অন্যের মুখোমুখি হয়, মরণপণ লড়াই করে। আবার সঙ্গিনী খুঁজতে গিয়েও ওরা রঙের মশাল জ্বালে শরীরে, তবে সে-আলো ভালবাসার আলো। ছোট-বড় সবরকমের বহুরূপীর ত্বকেই আছে একরকমের রংদার কোষ, যাদের বলা হয় 'ক্রোমাটোফোর্‌স'। ভালবাসা, ভয়, ক্রোধ, আনন্দ, আত্মসমর্পণ ইত্যাদি বিভিন্ন আবেগের মুহূর্তে রং বদলের খেলা দেখায় এইসব কোষ। মেয়ে প্যান্থার ক্যামেলিয়নও রং বদলায়, তবে তাতে বৈচিত্র্য কম। এমনিতে স্ত্রী-প্যান্থার ক্যামেলিয়নের গায়ের রং হালকা বাদামি, আবেগের মুহূর্তে কখনও ধরে কমলা, কখনও-বা কালো রং। আমাদের আশপাশে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে ছোট আকারের বহুরূপী প্রায়ই দেখা যায়। আগ্রহ থাকলে তাদেরও রং বদলের ধরন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব।

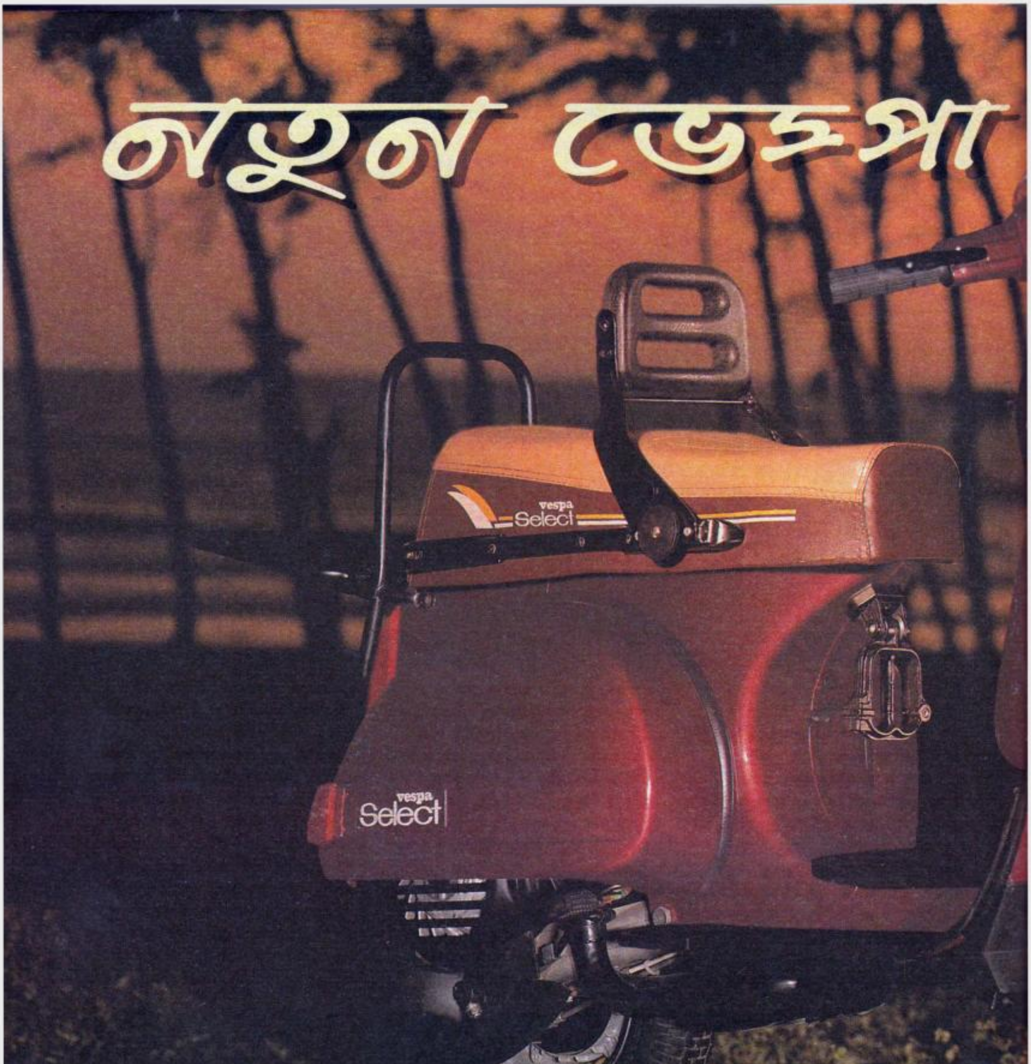

দেখলে যেন চোখ ফেরে না,

এক নজরেই মন জয় ক'রে নেবে ভেস্পা সিলেক্ট। আর একবার চালালেই বুঝবেন, এর অনুভূতি এমনই জবরদস্ত যে না নিয়ে থাকতে পারবেন না।

ভেস্পা সিলেক্ট চালানোর অসাধারণ অনুভূতির শুরু, এর পুশ বটন স্টার্টে। বটনে আঙ্গুল ছোঁয়াতেই 7.8 হর্সপাওয়ারের (বি এইচ পি) নতুন ইঞ্জিন আপনাকে দেবে অতুলনীয় পিক-আপ—0 থেকে 60 কিঃ মিঃ প্রতি ঘণ্টা গতি স্রেফ 8.7 সেকেণ্ডে যা স্কুটারের মধ্যে সবথেকে বেশী। আর জ্বালানী সাশ্রয়ও সবথেকে বেশী।

UNDER TEST DRIVING CONDITIONS
70 KMPL
55 NORMAL DRIVING

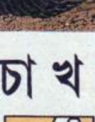

নতুন সিলেক্টের সীটে আছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম এ্যাড্জাস্টেবল ব্যাক রেস্ট (পেটেন্ট বিবেচনাধীন) আপনার প্রতি সফর আরো আরামদায়ক করার জন্যে। সঙ্গে দেওয়া আছে এক হেলমেট লক্ যা আপনাকে হাতে করে হেলমেট বয়ে বেড়ানোর বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দেয়।

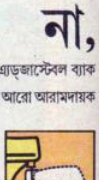

এইসব পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই চলেছে ভেস্পাকে আরো উন্নত আরো উত্তম করার নিরন্তর প্রয়াস। সিলেক্টে কিছু জিনিষ আছে যা

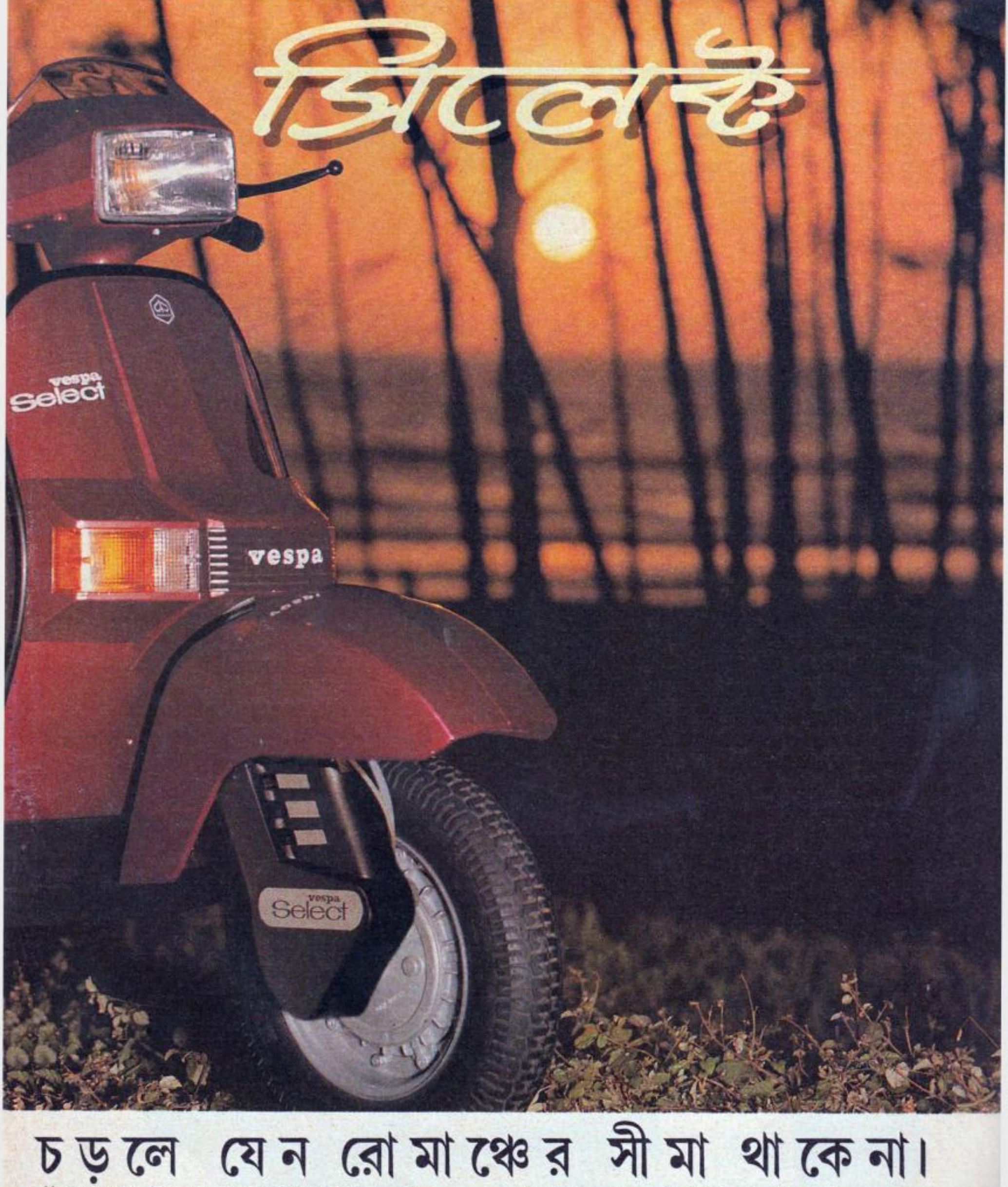

চড়লে যেন রোমাঞ্চের সীমা থাকে না।

অটুট, সেখানে কোন হেরফের নয়। যেমন, ভেস্পার সুরক্ষা ও নির্ভরযোগ্যতা। তাই তো, ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের ওপর 5 বছরের ওয়ার‍্যান্টি এবং 1 বছরের ফ্রি সার্ভিস ওয়ার‍্যান্টি। সঙ্গে দেশব্যাপী 600-এরও বেশী সার্ভিস সেন্টারের নেটওয়ার্ক।

তবে হ্যাঁ, আমাদের কথা শুনে বা পড়েই সবকিছু বিশ্বাস করতে বলি না। আপনি স্বয়ং আসুন যে-কোন ডীলারের কাছে। তারপর নিজেই চালিয়ে দেখুন, পরখ করুন নতুন ভেস্পা সিলেক্ট। তাহ'লেই বুঝবেন এর ফারাকটা কোথায়।

ELECTRONIC PARTS
5 YEAR
WARRANTY

আকর্ষণীয় মেটালিক রঙে পাওয়া যায়—মিডনাইট ব্রোঞ্জ, এমারেল্ড গ্রীন, মালবেরী রেড আর এস্ট্রাল ব্লু।

vespa
Select

সফরের অনবদ্য আনন্দ, এখন যেন তুলনাহীন।

ULKA 20324 BEN

জীবনের সব ক্ষেত্রেই আজ ঢুকে পড়েছে কম্পিউটার। বিদেশের মতো আমাদের দেশেও কম্পিউটার এখন লেখাপড়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ-পর্যন্ত রাজ্যের ১২টি জেলার শ'দেড়েক স্কুলে দেওয়া হয়েছে কম্পিউটার। লিখেছেন বিমল বসু

স্কুলে কম্পিউটার

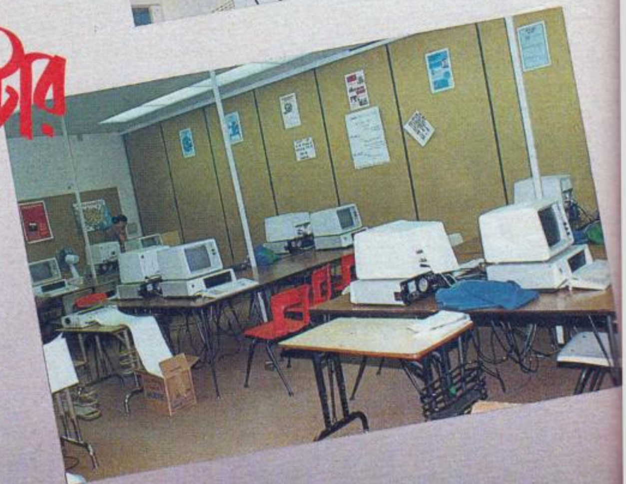

বার্ষিক পরীক্ষার মাত্র সাতদিন বাকি। অথচ কেমিস্ট্রির দুটো অধ্যায় এখনও ভাল করে তৈরি হয়নি অনিন্দ্যর। তাই প্রাণপণ পড়ে চলেছে। পড়তে-পড়তে হঠাৎ একটা জায়গায় আটকে গেল। একটা 'কেমিক্যাল রিঅ্যাকশান' কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না। কিন্তু এই মুহূর্তে কে তাকে এটা বুঝিয়ে দেবে ? আবার রিঅ্যাকশানটা এখনই বুঝতে না পারলে পড়াও এগোবে না। ছটফট করছে অনিন্দ্য। এমনই তার স্বভাব। ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকলেন মা। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "কী, আবার আটকেছে তো !" বলেই পড়ার

কম্পিউটার ক্লাসে মনোযোগী ছাত্র
ফোটো : প্রদীপ সান্যাল

টেবিলের একধারে রাখা পি সি সেটটার দিকে আঙুল তুললেন। "আরে, তাই তো! একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।" বলতে-বলতেই ঝট করে চেয়ারটা সরিয়ে একটা ড্রয়ার টেনে এক গাদা 'ফ্লপি' হাতড়ে একটা বেছে নিল অনিন্দ্য এবং পি সি-তে সেটা ঢুকিয়ে দিয়ে অন করে দিল সুইচগুলো। আর চিন্তা নেই। সি আর-টু-বাই-এ নম্বর সফটওয়্যার প্যাকেজটাতেই অধ্যায়টা ভাল করে বোঝানো আছে। অনিন্দ্য এই সময়ের এক স্কুলপড়ুয়া। যখন স্কুল আর বাড়ির মধ্যে তফাত সামান্যই। যখন কম্পিউটার লেখাপড়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাড়িতে বসেই পাওয়া যায় স্কুলের 'লেস্‌ন'। প্রায় প্রত্যেক ছাত্রের বাড়িতেই মজুত ডেস্ক-টপ পার্সোনাল কম্পিউটার, যাকে সংক্ষেপে বলা হয় পি সি (PC), আর সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান—প্রতিটি বিষয়ের অনেক লেস্‌ন আছে, এইরকম দুর্ধর্ষ সব 'প্যাকেজ' মানে ফ্লপি ডিস্কে ধরা নানা ধরনের পাঠ। ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান ইত্যাদি উন্নত দেশে এটা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

স্কুলে-স্কুলে, এমনকী অনেক ছাত্রছাত্রীর পড়ার ঘরেও ঢুকে পড়েছে কম্পিউটার। আমাদের দেশেও বহু স্কুলে কম্পিউটার শেখানো শুরু হয়ে গেছে। কম্পিউটারের আয়তন ক্রমশ ছোট আর সুবিধাজনক হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দামও যেভাবে কমে আসছে, তাতে ১০-১৫ বছরের মধ্যেই এদেশেও অনিন্দ্যর মতো ছাত্রের হয়তো অভাব হবে না। জীবনের সবক্ষেত্রেই আজ কম্পিউটার ঢুকে পড়েছে বা পড়ছে বলেই ভারত সরকার ১৯৮৪-'৮৫ সালে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষা চালু করেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা গবেষণা পরিষদ এন সি ই আর টি-র অধীনে 'কম্পিউটার লিটারেসি অ্যান্ড স্টাডিজ ইন স্কুল্‌স', সংক্ষেপে 'ক্লাস প্রোজেক্ট' নামে একটি কর্মসূচি নেওয়া হয়, যাতে বিভিন্ন রাজ্যের বাছাই করা কিছু স্কুলকে দেওয়া হয় দুটি করে ছোট কম্পিউটার সেট। সেটগুলি ছিল ব্রিটেনে তৈরি 'বিবিসি-মাইক্রো'। পাঁচের দশকের গোড়ার দিকে ব্রিটেনেই প্রথম স্কুল-স্তরে কম্পিউটার শিক্ষা চালু হয়েছিল। তখনও মিনি কিংবা 'মাইক্রো-কম্পিউটার' তৈরি হয়নি। মেন্ ফ্রেম অর্থাৎ কোনও কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বসানো বড় আকারের কম্পিউটার থেকেই 'টার্মিনাল' বা 'সংযোগ' দেওয়া হয়েছিল কিছু-কিছু স্কুলে। সেই

পোর্টেবল অ্যানালাইজার

টার্মিনালের 'ভিডিও মনিটর' মারফত পাওয়া যেত কম্পিউটার-প্রোগ্রাম। এর অনেক পরে মাইক্রো-প্রসেসর সিলিকন চিপের দৌলতে তৈরি হল ছোট আকারের মাইক্রো-কম্পিউটার। এক্ষেত্রে বিবিসি-মাইক্রোকে পথিকৃৎ বলা চলে। অনেকের মতেই, স্কুল-স্তরে শিক্ষার জন্য আজও বিবিসি-মাইক্রোর জুড়ি মেলা ভার। যদিও উন্নততর আই বি এম-পি সি অর্থাৎ বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন কম্পিউটার সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন বা আই বি এম-এর তৈরি পার্সোনাল কম্পিউটারই এখন বেশি চলছে।

এ-নিয়ে কথা হচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর জয়দেব

স্কুলে-স্কুলে, এমনকী অনেক ছাত্রছাত্রীর পড়ার ঘরেও ঢুকে পড়েছে কম্পিউটার। আমাদের দেশেও বহু স্কুলে কম্পিউটার শেখানো শুরু হয়ে গেছে। কম্পিউটারের আয়তন ক্রমশ ছোট আর সুবিধাজনক হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দামও যেভাবে কমে আসছে তাতে ১০-১৫ বছরের মধ্যে আমাদের দেশেও কম্পিউটারের ব্যবহার সহজ হয়ে উঠবে।

দাশগুপ্তের সঙ্গে। তাঁর কাছেই জানা গেল, ১৯৮৪-'৮৫ সালে 'ক্লাস' প্রকল্প যখন চালু করা হয়, প্রথম পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি স্কুলে দুটি করে বিবিসি-মাইক্রো সেট দেওয়া হয়েছিল। এজন্য তিনটি 'রিসোর্স সেন্টার' বা দেখাশোনার কেন্দ্রও ঠিক করা হয়। এই তিনটি কেন্দ্র হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং খড়গপুর আই আই-টির কম্পিউটার বিভাগ। প্রথম পর্যায়ে কম্পিউটার দেওয়ার জন্য বাছাই করা হয়েছিল এই তিন কেন্দ্রের ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত কিছু স্কুলকে, যাতে স্কুলগুলি প্রয়োজনমতো সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের পরামর্শ পেতে পারে, যন্ত্র খারাপ হলে সারিয়ে নিয়ে আসতে পারে সেখান থেকে। পরে অবশ্য এলাকাটা

একনজরে কম্পিউটার

মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম কম্পিউটার মানুষের হাতের দশটি আঙুল। পরে আরও বড় সংখ্যা গোনার প্রয়োজনে হাড় বা কাঠের টুকরোর গায়ে দাগ কাটার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। তারও অনেক, অনেক পরে চিনে উদ্ভাবিত হয় প্রথম যোগ-বিয়োগ করার যন্ত্র, প্রথম 'মেকানিক্যাল কম্পিউটার অ্যাবাকাস'। এর পরের ধাপে এল ফরাসি বিজ্ঞানী ব্লেইজ পাস্কাল উদ্ভাবিত 'ক্যালকুলেটর'। তারপর চার্লস ব্যাবেজের বহুগুণে উন্নত 'ডিফারেন্স' এবং 'অ্যানালিটিক্যাল এঞ্জিন'। যা দিয়ে জটিল গুণ-ভাগও করা যেত, এমনকী যার ছিল আধুনিক ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের মতোই মেমারি, মানে স্মৃতিভাণ্ডার। আজকের মাইক্রোচিপ বা মাইক্রোপ্রসেসরভিত্তিক তুখোড় কম্পিউটারও এসেছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ পেরিয়ে। মাইক্রোপ্রসেসরই হল কম্পিউটারের 'ব্রেন, যা আসলে আঙুলের নখের মাপের একটুকরো সিলিকন-পাতের ওপর চেপে বসানো কয়েক হাজার ট্রানজিস্টার। ট্রানজিস্টারগুলো সুইচের কাজ করে—একবার বিদ্যুৎ 'অন' অর্থাৎ চালু করে, একবার 'অফ' বা বন্ধ করে। বিদ্যুৎ মানেই ইলেকট্রনের প্রবাহ। এই প্রবাহের আরম্ভ আর নামার পর্যায়-ক্রমিক সঙ্কেতে চলে বলেই এর নাম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। আর এইসব সঙ্কেতের আনাগোনা চলে প্রায় আলোর গতিবেগে। তাই কম্পিউটারও গণনার কাজ করে অবিশ্বাস্য গতিতে ; মস্ত-মস্ত যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করে দেয় চোখের নিমেষে, মানুষের মস্তিষ্কের পক্ষে যা সম্ভব নয়। তবে মস্তিষ্কের মতো চিন্তা করবার, স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কম্পিউটারের নেই। মানুষ তাকে যা করতে বলে, যেমনভাবে করতে বলে, সে তাই করে। কম্পিউটারকে যে পথে নির্দেশ দেওয়া হয়, তার নাম 'ইনপুট'। পাঞ্চড কার্ড, ফ্লপি ডিস্ক, কি-বোর্ড ইত্যাদির মাধ্যমে এই নির্দেশ প্রথমে যায়

কম্পিউটারের মেমারি বা স্মৃতিভাণ্ডারে। সেখান থেকে যায় 'সি পি ইউ' বা 'সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটে'। সি পি ইউ হল একই সঙ্গে কম্পিউটারের মস্তিষ্ক এবং হৃৎপিণ্ড। 'কন্ট্রোল' বা নিয়ন্ত্রক এবং 'অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট' (অ্যালু) নামে দুটি অংশ মিলে সি পি ইউ। কন্ট্রোলের কাজ কম্পিউটারের যাবতীয় প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা, মেমারি থেকে তথ্যাদি বা ডেটা অ্যালুতে পাঠিয়ে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি অঙ্ক কষিয়ে নিয়ে তার ফলাফলগুলি হয় মেমারিতে ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় করে রাখা অথবা সরাসরি আউটপুটে পাঠিয়ে দেওয়া। কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত মনিটরের টিভি-স্ক্রিন অথবা তথ্যগুলো সঙ্গে-সঙ্গে ছেপে বের করে দেওয়ার জন্য প্রিন্টারকেই বলা হয় 'আউটপুট' বা ফলাফল প্রকাশের বহির্পথ। কম্পিউটার বলতে সাধারণত ডিজিটাল কম্পিউটারকেই বোঝায়, যে শুধু অঙ্কের ভাষাই বোঝে। আর সে-ভাষার মাত্র দুটি অঙ্ক—০ এবং ১। বিদ্যুৎ বন্ধ থাকার অবস্থাকে বলা হয় শূন্য, আর চললে ১। যাবতীয় সংখ্যাকে তাই ০ এবং ১-এর হিসেবে অনুবাদ করে নেয় কম্পিউটার। এরই নাম 'বাইনারি সিস্টেম' বা দ্বিসাংখ্যিক পদ্ধতি। এটাই হল কম্পিউটারের বোধগম্য যান্ত্রিক ভাষা। অক্ষরের ভাষায় নির্দেশ পাঠালেও কম্পিউটার তাকে অঙ্কের ভাষায় বদলে নেয়। কম্পিউটারকে দেওয়া নির্দেশাবলীই হল প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার। আর এর যাবতীয় যন্ত্রাংশকে বলে হার্ডওয়্যার ; যার মধ্যে আছে কি-বোর্ড, মনিটর এবং তার নীচে একটি আয়তাকার বাক্সের মধ্যে একাধিক মাইক্রোচিপ এবং সংশ্লিষ্ট জটিল সব বিদ্যুৎবর্তনী।

বাড়িয়ে ১০০ কিলোমিটার করা হয়েছে। এবং এ-পর্যন্ত রাজ্যের ১২টি জেলার শ' দেড়েক স্কুলকে দেওয়া হয়েছে কম্পিউটার। সবচেয়ে বেশি কলকাতায়। স্কুলের সংখ্যা ৪০। তারপর মেদিনীপুর—৩০। এর পর হুগলি—২৬। পার্বত্য অঞ্চল হিসেবে বিশেষ বিবেচনায়, অনেক দূরে থাকা সত্ত্বেও, দার্জিলিঙের চারটি স্কুলে কম্পিউটার দেওয়া হয়েছে। আবার দূরত্বের জন্যই শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলার কোনও স্কুলই এর আওতায় আসেনি।

জয়দেববাবু বললেন, "ক্লাস প্রোজেক্টের মূল উদ্দেশ্য হল 'কম্পিউটার-অ্যাওয়ারনেস' অর্থাৎ এই আশ্চর্য যন্ত্রটির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক পরিচয় ঘটানো, কম্পিউটারের উপযোগিতা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলা। তবে বিষয়টি এখনও স্কুল পাঠক্রমের বাইরেই রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এটা 'এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির' মধ্যে পড়ে।"

কিন্তু তাতে কি ছেলেমেয়েদের আগ্রহ ধরে রাখা যাবে ? স্কুলে প্রথম কম্পিউটার আনার চমক এবং উত্তেজনায় একসময় ভাটা তো পড়বেই। কম্পিউটার আছে এমনই দু-একটি স্কুলের প্রধানশিক্ষকরাও এ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। আঙুলে গোনা দু-চারটি স্কুল বাদ দিলে গত ৬-৭ বছরে এক্ষেত্রে অগ্রগতিও আশাব্যঞ্জক নয়। কয়েকটি স্কুলে খোঁজ নিয়ে এরকমই চিত্র পাওয়া গেল। আই.সি.এ.সি এবং সি.বি.এস.ই-র অধীন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির কথা অবশ্য আলাদা। কারণ, দিল্লি এবং সেন্ট্রাল— এই দুটি বোর্ডেই কম্পিউটার শিক্ষাকে সিলেবাসের মধ্যেই রাখা হয়েছে।

এর উত্তরে জয়দেববাবু জানালেন, "প্রোগ্রেস যে ভাল নয়, উৎসাহে ভাটা পড়তে শুরু করেছে, সেটা আমরা জানি। তাই 'এন.সি.ই.আর.টি'ও গোটা ব্যাপারটা নতুন করে খতিয়ে দেখছে। আমরাও পুরনো ধাঁচের বি বি সি-মাইক্রো সেটগুলি পালটে উন্নততর আই.বি.এম.পি.সি চালু করার প্রস্তাব দিয়েছি। কম্পিউটার শিক্ষাকে সিলেবাসের মধ্যে আনা যায় কি না তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে।"

শুধু পাঠক্রমের আওতায় আনলেই চলবে না, ছেলেমেয়েদের কম্পিউটারের উপযোগিতা সম্পর্কে প্রকৃত সচেতন করে তুলতে 'টিচিং-এইড' অর্থাৎ চক, ব্ল্যাকবোর্ড, চার্ট, ল্যাবরেটরি এক্সপেরিমেন্টের মতোই

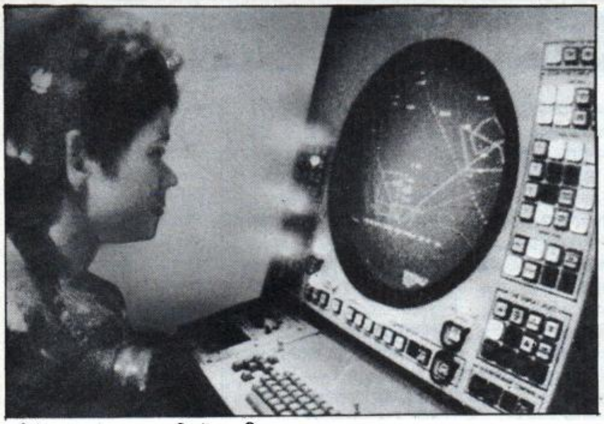

কম্পিউটার কাজে লাগানো হয়েছিল উপসাগরীয় যুদ্ধে

স্কুলে দুটি কম্পিউটার আসে। কিছুদিন চলার পরই খারাপ হয়ে যায়। বেথুন স্কুলের সংশ্লিষ্ট 'রিসোর্স সেন্টার' হল শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। যেসব সরকারি স্কুল কম্পিউটার পেয়েছে সেখানে যন্ত্রের তদারকি এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব ওঁদেরই। ওঁরা এসে সারিয়েসুরিয়ে দিয়ে যান। আবার কিছুদিন চলে। ক্লাসটাস হয়। ফের বন্ধ। এখন 'স্টেবিলাইজার' খারাপ। সারানো হচ্ছে, আবার খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বছরখানেক আগে ছায়া দেবী বেথুনে যোগ দেওয়ার পর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন কম্পিউটার ক্লাস চালু রাখার। কিন্তু যন্ত্রে এত ঘন-ঘন গোলমাল হলে এবং নিয়মিত ক্লাস না হলে উৎসাহে ভাটা তো পড়বেই।

বেথুনের অন্যতম কম্পিউটার শিক্ষিকা মিনতি মজুমদারের সঙ্গেও এ-নিয়ে কথা হল।

পাঠ-সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। এবং এজন্য চাই বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের ওপর নানা 'সফ্‌টওয়্যার'। কম্পিউটার বিদ্যুৎশক্তিতে চলা একটি জটিল যন্ত্র মাত্র, সফ্‌টওয়্যারই তার আসল শক্তি। সফ্‌টওয়্যার মানে কম্পিউটারকে দেওয়া বিভিন্ন নির্দেশ এবং তাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া বিভিন্ন কাজ। সে কাজ অঙ্কচর্চা হতে পারে, হতে পারে নানারকম গ্রাফিক্‌স, অর্থাৎ ছবি ও নকশা আঁকিয়ে নেওয়া অথবা ভাষা, সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে লেস্‌ন তৈরি। কয়েকটি উন্নত দেশে স্কুলের ছেলেমেয়েদের কম্পিউটার শেখানোর সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তৈরি সফ্‌টওয়্যার ক্লাসে পড়ানোর সময় সহায়ক হিসেবেও শিক্ষকরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছেন। এদিক দিয়ে আমরা এখনও অনেক পেছনে। স্কুলে-স্কুলে কম্পিউটার দেওয়ার সময় শিক্ষামূলক কিছু সফ্‌টওয়্যার ডিস্কও দেওয়া হয়েছিল। বেশিরভাগই বিদেশ থেকে আনানো। কিছু এন সি ই আর টি'র তৈরি। কিন্তু পাঠন সহায়ক হিসেবে ক্লাসে-ক্লাসে নিয়মিত ব্যবহার করার জন্য এরকম শিক্ষামূলক ডিস্ক আরও অনেক বেশি সংখ্যায় যেমন চাই, তেমনই চাই উপযুক্ত পরিকাঠামো, সুষ্ঠু ব্যবস্থা। যা এখনও এদেশে গড়ে ওঠেনি। কম্পিউটার শিক্ষা কেমন চলছে, তা নিয়ে কলকাতা এবং শহরতলির কয়েকটি স্কুলে খোঁজখবর করতে গিয়ে কিছুটা হতাশই হতে হল। বেথুন স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা শ্রীমতী ছায়া সেনগুপ্ত জানালেন, বছরপাঁচেক আগে

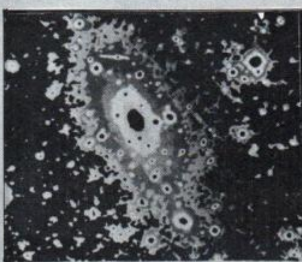

কম্পিউটার বিদ্যুৎ-শক্তিতে চলা একটি জটিল যন্ত্র মাত্র, সফ্‌টওয়্যারই তার আসল শক্তি। সফ্‌টওয়্যার মানে কম্পিউটারকে দেওয়া বিভিন্ন নির্দেশ এবং তাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া বিভিন্ন কাজ। সে কাজ অঙ্কচর্চা হতে পারে, হতে পারে নানারকম গ্রাফিক্‌স।

কম্পিউটারের প্রয়োজন এখন সবক্ষেত্রে

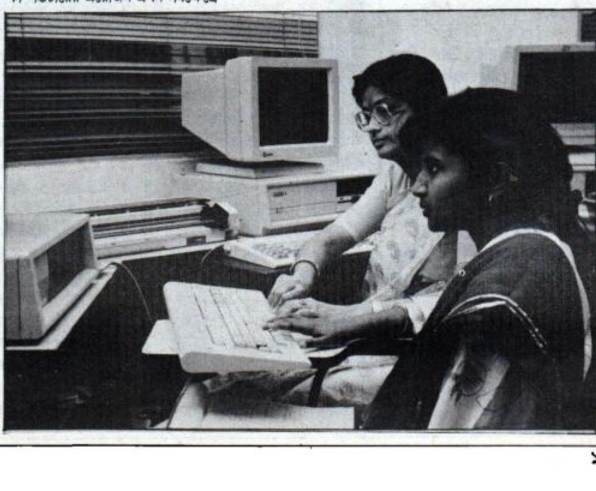

অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো দেখা যাবে পরিবার প্রতি একটা কম্পিউটার। তাই

এটা অনেকেরই হয়তো জানা নেই, কম্পিউটারের সংখ্যা বৃদ্ধির হার পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ছ' গুণ। অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো দেখা যাবে পরিবার প্রতি একটা কম্পিউটার। গৃহকর্তা বাড়িতে বসেই অফিসের কাজ সারছেন। কারণ, বাড়ির পার্সোনাল কম্পিউটার অফিসের মূল কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। অফিসে আর যাতায়াতের ধকল নেই। বাড়ির ছোট-ছোট ছেলেদেরও পোস্টবক্সে উঁকিঝুঁকি মারতে হচ্ছে না। শুধু বাড়ির মাইক্রোকম্পিউটার চালালেই জানা যাচ্ছে কেউ চিঠি পাঠিয়েছে কি না! সমস্ত আত্মীয়স্বজন, সমস্ত শহরবাসীর পার্সোনাল কম্পিউটার যুক্ত আছে একটা মূল কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের মাধ্যমে। বাড়িতে বসে চিঠি টাইপ করে পাঠানোর নির্দেশ দিলেই হল! একে বলে ইলেকট্রনিক মেল। বাড়ির ছেলেদের পিঠে বড় ব্যাগের বোঝা নিয়ে আর স্কুল-কলেজে দৌড়তে হচ্ছে না। কম্পিউটারের মাধ্যমেই শিখতে পারছে অঙ্ক, নানারকমের ভাষা। অবসর বিনোদন? তারও ব্যবস্থা আছে। ভিডিও গেমস তো বাদই দিলাম, সবচেয়ে বেশি বুদ্ধির খেলা বলে যার পরিচয়, সেই দাবাও খেলা যেতে পারে কম্পিউটারের সঙ্গে। এখানে আবার বাড়তি সুবিধে হচ্ছে, চাল দেওয়ার পর আবার ফিরিয়ে নেওয়া যায়। কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল দেখিয়ে দেয়। এ ছাড়া বাড়ি বসে ব্যাঙ্কের কাজ, দোকানের কেনাকাটা সবই করে ফেলা সম্ভব এরকম কম্পিউটার বাড়িতে থাকলে। তবে সেই সময় এখনও আসেনি। কম্পিউটার বলতে আমরা বুঝি এমন একটা যন্ত্র, যাকে কী ভাবে কাজ করতে হবে তা যদি বলা যায় এবং সঙ্গে-সঙ্গে উপযুক্ত তথ্য দেওয়া যায়, তা হলে তা সে নিজেই করে নিতে পারবে। আধুনিক ডিজিটাল কম্পিউটারে পাঁচটা প্রধান অংশ আছে :

(১) ইনপুট সেকশন : এর মাধ্যমেই কম্পিউটারকে বিভিন্ন তথ্য ও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। (২) কন্ট্রোল সেকশন : এর কাজ অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে ঠিকভাবে যোগাযোগ রাখা ও নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে নির্দেশমতো কাজ সম্পাদিত হয়। (৩) অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক সেকশন : এখানে সমস্ত হিসেবনিকেশ তুলনা ইত্যাদি করা হয়। (৪) মেমারি : এখানে বিভিন্ন তথ্য, নির্দেশ প্রভৃতি সংরক্ষিত থাকে। (৫) আউটপুট

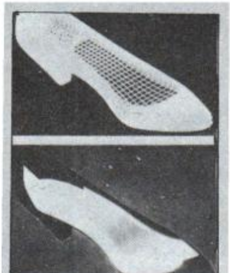

জুতোর নকশাও করে কম্পিউটার

ডিভাইসেস : সমাধানের ফল এবং আরও প্রয়োজনীয় তথ্য যা চাওয়া হয়েছিল তা কম্পিউটারের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়। এগুলো কিন্তু কাজের ভিত্তিতে বিভাগ— এই নয় যে একটা অংশে কন্ট্রোল, আর একটা অংশে মেমারি। এরা মিলেমিশে ছড়িয়ে থাকে। মেমারি, কন্ট্রোল সেকশন আর অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিটকে একসঙ্গে বলা হয় সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU) যা কম্পিউটারের প্রাণ। কম্পিউটার মূলত তিন ধরনের। অ্যানালগ কম্পিউটার, ডিজিটাল কম্পিউটার এবং হাইব্রিড কম্পিউটার। অ্যানালগ কম্পিউটার কাজ করে সেসব জায়গায়, যেখানে তথ্যের সমানে পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন, একটা তারের ভোল্টেজ বা একটা পাইপের ভেতরের পরিবর্তনশীল চাপ। এরোডাইনামিকসে এর বিশেষ প্রয়োগ আছে। উচ্চতার সঙ্গে-সঙ্গে বাতাসের প্রবাহ, চাপ খুব জটিলভাবে পরিবর্তন হয়। অ্যানালগ কম্পিউটার এসব ক্ষেত্রে খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে। ডিজিটাল কম্পিউটার কাজ করে সংখ্যা কিংবা অঙ্ক হিসেবে প্রকাশিত শব্দ ও প্রতীকের ওপর। ডিজিটাল কম্পিউটার এইসব তথ্যের ওপর গণনা করে বিচ্ছিন্নভাবে। ডিজিটাল কম্পিউটার আজ প্রসেস কন্ট্রোল, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সেও ব্যবহৃত হচ্ছে। একটা বিশাল কারখানায় বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় উপাদান মেশানো, সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে কম্পিউটার। অনেক শহরে স্বয়ংক্রিয় যানবাহন নিয়ন্ত্রণও হচ্ছে কম্পিউটারের মাধ্যমে। রাস্তার ধারে থাকা সংবেদী যন্ত্রের মাধ্যমে কম্পিউটার এও জানতে পারছে যে, কোন রাস্তায় জ্যাম হয়েছে বা কোন রাস্তায় গাড়ি বেশিক্ষণ ধরে ছাড়া দরকার। ট্রেনের ক্ষেত্রেও একই জিনিস ডিজিটাল কম্পিউটার করতে পারে। অটোমেটিক সিগন্যালিং, কোন মালগাড়ি কোন রেলে যাবে তা কম্পিউটার নির্ধারণ করছে। আবার কোনও যন্ত্রাংশ প্রস্তুতির কারখানায় যেখানে ঠিক-ঠিক মাপ করা খুবই দরকার সেখানেও এই কম্পিউটারে ওই যন্ত্রাংশ ঢোকালে ওই মিনি কম্পিউটার থেকে নির্দেশ আসবে ঠিক কত বড় বা ছোট করা দরকার এবং সেভাবে পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করবে। হাইব্রিড কম্পিউটার অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মিশ্রণ। প্রথম দিকে হাইব্রিড কম্পিউটারে ডিজিটাল অংশ থাকত মূলত অ্যানালগ অংশের সহকারী হিসেবে। কিন্তু এখনকার হাইব্রিড কম্পিউটার আবার মূলত ডিজিটালের ওপরই নির্ভরশীল। হাইব্রিড কম্পিউটারে অ্যানালগ কম্পিউটারের চেয়ে আরও নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। হাইব্রিড কম্পিউটার পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের প্ল্যান্টে, যুদ্ধবিমানে, মহাকাশ যানে এবং ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতে আজ এই তিন ধরনের কম্পিউটারই পাওয়া যায়। আমাদের মেট্রোতে, দুর্গাপুর প্ল্যান্ট আধুনিকীকরণে ও নানা ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটারের মান মূলত নির্ভর করে এতে ব্যবহৃত ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা আই সি-র ওপরে। লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন (LSI) প্রয়োগের পর থেকে হাজার হাজার যন্ত্রাংশ একটা ছোট সেমি কন্ডাক্টরের ওপর লাগানো গেছে। যার ফলে কম্পিউটারের আয়তন অনেক ছোট হয়ে গেছে, সঙ্গে-সঙ্গে কাজ করার বেগও অনেক বেড়ে গেছে। ১৯৫০ সালের কম্পিউটারের চেয়ে আজকের কম্পিউটার প্রায় এক লক্ষ গুণ দ্রুততর। সেইসঙ্গে তথ্য সংরক্ষণ ক্ষমতাও অনেক বেড়েছে। আগামী দিনেও এতে ব্যবহৃত সিলিকন চিপের কার্যক্ষমতা যত বাড়বে, আমরা পাব আরও দ্রুত কার্যক্ষমতা সম্পন্ন ছোট কম্পিউটার। আজ আমরা সবাই কম্পিউটারের দিকে ঝুঁকছি তার প্রধান কারণ মানুষের চেয়ে অনেক দ্রুত, সঠিক এবং বিশ্বস্তভাবে কম্পিউটার কাজ করে। তা ছাড়া কম্পিউটার থেকে যে-কোনও পুরনো তথ্য বারবার প্রয়োগ, সংগ্রহ এবং প্রয়োজনে সংশোধন করা এই সবের জন্যই আমেরিকায়, জাপানে কম্পিউটারের প্রয়োগ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা হচ্ছে অনেক কম বয়স থেকে। অনেকের বাড়িতেই পার্সোনাল কম্পিউটার

আগামী দিনের কথা ভেবে স্কুলজীবন থেকেই কম্পিউটার শেখা উচিত ...

আছে। বিভিন্ন শিক্ষামূলক সফটওয়্যার প্যাকেজও পাওয়া যায়। এতে সব পরিষ্কারভাবে বোঝানো থাকে। ব্যবহারকারীকে প্রতি মুহূর্তে নির্দেশ দেওয়া হয় কী করতে হবে ; মাঝে-মাঝে পরীক্ষাও করা হয় শিক্ষার্থী কতটা শিখেছে। আমাদের দেশে পার্সোনাল কম্পিউটারের চল না বাড়লেও আজকাল বিভিন্ন স্কুলে কম্পিউটার শেখানো হয়। ভিডিও গেমস ইত্যাদির মাধ্যমে প্রথমে কি-বোর্ডের সঙ্গে পরিচিতি বাড়ানো হয়। বেসিক, ফোরট্রান শেখানো হয় আর-একটু উঁচু ক্লাসে। এ-প্রসঙ্গে কম্পিউটার ল্যাঙ্গোয়েজ কী, একটু বলা দরকার। কোবল, ফোরট্রান ইত্যাদি কম্পিউটার ল্যাঙ্গোয়েজকে বলে 'হাই লেভেল ল্যাঙ্গোয়েজ'। এগুলোর সাহায্যেই মূলত অঙ্ক কিংবা ইংরেজিতে 'প্রোগ্রাম' করা যায়। এবার 'কম্পাইলার'-এর সাহায্যে এই হাই লেভেল ল্যাঙ্গোয়েজে লেখা প্রোগ্রাম মেশিন ল্যাঙ্গোয়েজে রূপান্তরিত হয়। এই মেশিন ল্যাঙ্গোয়েজই কম্পিউটার বোঝে এবং সেইমতো কাজ করে। দেড়শোর বেশি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গোয়েজ আজকাল ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতিটিরই কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধে আছে। বেসিক, অ্যালগল, ফোরট্রান, ফোর্থ, লোগো, স্নোবল, লিস্প, প্রোলগ, প্যাস্কাল সি— এরকমই কয়েকটি প্রচলিত ল্যাঙ্গোয়েজ। বেসিক সোজা হওয়ায় এর অজস্র প্রয়োগ হয়। স্কুলে থাকতে-থাকতেই বেসিক শিখে নেওয়া ভাল। এর পরে ফোরট্রান। বেসিকের থেকে অ্যালগল বা ফোরট্রান অনেক শক্তিশালী ও নানা ধরনের কাজ করা যায়। তবে ফোরট্রানও এখন অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। সি-ই সাধারণত বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে-কোনও ল্যাঙ্গোয়েজেরই মূল ভিত্তি একই রকম, তাই একটা জানলেই অন্যটা শেখা অনেক তাড়াতাড়ি সম্ভব।

এইসঙ্গে কিছু স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজও কোনও-কোনও জায়গায় ব্যবহার করতে শেখানো হয়। যেমন, ওয়ারডস্টার, লোটাস, ডি-বেস, এগুলো ব্যবহার করে কোনও কিছু লেখা, দরকার মতো সারি ও শ্রেণী করে তথ্য সাজানো ইত্যাদি করা সহজেই সম্ভব। ছাত্রদের উচিত যে-কোনও একটা ল্যাঙ্গোয়েজের ওপর ভিত্তি করে প্রোগ্রাম শেখার চেষ্টা করা, যেমন বেসিক দিয়ে প্রয়োজনীয় ফর্মুলা লিখে জটিল অঙ্কের সমাধান সম্ভব। কিছু তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গ্রাফ আঁকার চেষ্টা করা। অনেক স্কুলেই কম্পিউটার শেখালেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তা সফল হয়নি, তার প্রধান কারণ ছাত্ররা একটা বিশেষ ল্যাঙ্গোয়েজের ওপর নির্ভর করে চিন্তাভাবনা তৈরি না করে বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করে। অথচ একটা ল্যাঙ্গোয়েজ ভালভাবে জানতে পারলে আর-একটা নতুন ল্যাঙ্গোয়েজ তাড়াতাড়ি জানা সম্ভব।

এখন ডিজিটাল কম্পিউটারের মাধ্যমে ব্রিজ, পাওয়ার প্ল্যান্ট, মেশিনের যন্ত্রাংশ, বিমান, গাড়ি ইত্যাদি ডিজাইন করা হয়ে থাকে। একে বলে কম্পিউটার এডেড ডিজাইন। এঞ্জিনিয়ারিং-এর বিভিন্ন ক্ষেত্র ছাড়াও কাপড়ের ডিজাইন, বইয়ের প্রচ্ছদে এর প্রয়োগ করা হচ্ছে। ব্যাপকভাবে এতে অটোলিস্প ল্যাঙ্গোয়েজ ব্যবহৃত হয়। অটোক্যাড অটোলিস্পে লেখা এরকমই এক বহুপ্রচলিত প্যাকেজ। হার্ভাও গ্রাফিক্সও এরকমই আর-একটা অতি শক্তিশালী প্যাকেজ, যার মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক ছবি থেকে শুরু করে নানান খুঁটিনাটি যন্ত্রাংশ নিখুঁতভাবে আঁকা সম্ভব। ১৯৪৩ সালের কলোসার্স কম্পিউটার ছিল একদম প্রথম দিককার বিশেষ ধরনের কম্পিউটার। প্রথম আধুনিক কম্পিউটার অবশ্য বলা যায় ১৯৪৬ সালের 'এনিয়াক'-কে। এর পরে এওডাক, ইউনিভ্যাক ইত্যাদি বিভিন্ন উন্নততর প্রযুক্তির কম্পিউটার সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এসেছে। এখন 'ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন' প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মাইক্রোপ্রসেসর, মেমারি ও চিপ-এর সাইজ অত্যন্ত ছোট করা সম্ভব হয়েছে। এখনকার দ্রুততম কম্পিউটারকে সুপার কম্পিউটার বলা হয়, যা প্রতি সেকেন্ডে প্রায় পাঁচ কোটি নির্দেশ গ্রহণ করতে পারে। ভারতে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার টেকনোলজি সেভাবে না এগোলে সফটওয়্যার টেকনোলজিতে ভারতের বিশাল সম্ভাবনা আছে। সফটওয়্যার রফতানিতে ভারত ইতিমধ্যেই এগিয়ে গেছে। এয়ারপোর্টে বিমান নিয়ন্ত্রণ, শরীরের উষ্ণতা, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, রেলওয়ে রিজার্ভেশন, হোটেল, ব্যবসায়ী সংগঠনে ও নানা ক্ষেত্রে কম্পিউটার ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে। তাই স্কুলজীবন থেকেই কম্পিউটার শেখা উচিত।

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

জার্মানিতে কাঠের কলেও লাগে কম্পিউটার

ছাত্রীদের কম্পিউটার শেখানোর জন্য তাঁদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তিনি জানালেন, স্কুলের তিনজন বিজ্ঞানশিক্ষিকাকে এজন্য শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তিন সপ্তাহের ট্রেনিং দেওয়া হয়। ছাত্রীদের তাঁরা শেখান একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের কয়েকটি জিনিস,'কি-বোর্ড অপারেশন'এবং সেইসঙ্গে একটু-আধটু 'প্রোগ্রামিং', কিন্তু সেও একেবারে অ-আ-ক-খ স্তরের।

"বছরচারেক আগে দুটি কম্পিউটার আমরা পেয়েছি। কিন্তু সেভাবে এখনও চালু করা সম্ভব হয়নি। চালাতে গেলেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। স্কুলের তিনজন বিজ্ঞানশিক্ষক দু' সপ্তাহের ট্রেনিংও নিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওঁদের কম্পিউটার বিভাগই আমাদের রিসোর্স সেন্টার। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, বোতাম টিপে ছবি দেখানো ছাড়া ছাত্রদের বিশেষ কিছুই আমরা শেখাতে পারছি না।" খেদের সঙ্গেই এ-কথা বললেন মিত্র ইনস্টিটিউশন (মেন)-এর প্রধানশিক্ষক বাঁশরীমোহন ভট্টাচার্য। তাঁর মতে, কম্পিউটার শেখানোর জন্য শিক্ষকদের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তা যথেষ্ট নয়। গোটা ব্যাপারটাই নতুন করে খতিয়ে দেখা দরকার। কয়েকটি শর্তে কিছু স্কুলে কম্পিউটার দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু শিক্ষণ চালিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। এর চেয়ে বরং কয়েকটি আঞ্চলিক কেন্দ্র করে প্রতিটি স্কুল থেকে ১০-১৫ জন আগ্রহী ছাত্রদের নিয়ে শেখানোর ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়।

এরই মধ্যে একটু আশার কথা শোনালেন বাঁশরীবাবু। বললেন, "আমরা দু-একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে কথা বলছি। যদি তাদের সাহায্য নিয়ে কোর্সটা আমরা চালু রাখতে পারি। এজন্য ছাত্রদের কাছ থেকে কিছু টাকা-পয়সাও নিতে হবে। এখন অবশ্য কম্পিউটার শেখার জন্য তাদের আলাদা কোনও ফি দিতে হয় না। সরকার হাজার তিনেক টাকার মতো একটা বাৎসরিক'গ্রান্ট' দেন।"

বিধাননগর রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়েও মোটামুটি একই চিত্র পাওয়া গেল। ওঁরা জানালেন, কোর্সটা প্রথম যখন চালু হয় তখন ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যে খুবই উৎসাহ ছিল। তারপরই ভাটা পড়তে শুরু করে। এখন ছুটিতে বা শীতকালে মাঝে-মাঝে ক্লাস হয়। তা ছাড়া পড়াশোনার এত চাপ, স্কুল আওয়ারের বাইরে নিয়মিত কম্পিউটার ক্লাস হবেই বা কী করে? ছাত্রদের সত্যি-সত্যিই যদি কম্পিউটার

আগামী দিনের কম্পিউটার

চল্লিশের দশকে তৈরি হয় প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার 'এনিয়াক'। ১০০ ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া আর ১০ ফুট উঁচু সেই কম্পিউটারের আয়তন যাকে বলে ঘর জোড়া। প্রায় সাড়ে ১৭ হাজার'থার্মোআয়নিক ভাল্‌ভ'ছিল তাতে। ৫০ বছরের মধ্যেই কম্পিউটার প্রযুক্তি লাফিয়ে-লাফিয়ে আজ চলে এসেছে একদিকে ডেস্ক-টপ পার্সোনাল কম্পিউটার বা পিসি, এবং অন্যদিকে অবিশ্বাস্য গণন-ক্ষমতাসম্পন্ন সুপারকম্পিউটার এবং'থিঙ্কিং মেশিন'বা'আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স'-এর যুগে। সুপারকম্পিউটারকে বলা হয় 'নাম্বার ক্রাঞ্চিং মেশিন'। অকল্পনীয় এর গণনার গতি। সেকেন্ডে প্রায় ১০০ কোটি। আমেরিকার ক্রে কোম্পানি প্রথম অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করে,তারাই এই সুপারকম্পিউটার তৈরি করে। ভারতও একটি ক্রে-মেশিন কিনে দিল্লির'ন্যাশনাল সেন্টার ফর ওয়েদার ফোরকাস্টিং'-এ বসিয়েছে, আবহ পূর্বাভাস সংক্রান্ত জটিল সব তথ্য বিশ্লেষণের কাজে। এখন তৈরি হচ্ছে 'প্যারালাল প্রসেসর' অর্থাৎ পাশাপাশি বসানো একাধিক মাইক্রোচিপ সংবলিত আরও বেশি ক্ষমতার সুপার কম্পিউটার। এ-নিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে। আগামী শতকে হয়তো এসে যাবে সুপারকন্ডাকটরভিত্তিক সুপারকম্পিউটার। শূন্যের নীচে ২৬৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কোনও-কোনও ধাতুর বৈদ্যুতিক রোধ একেবারে চলে যায়, তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলে বিনা বাধায়, ফলে এই প্রবাহের

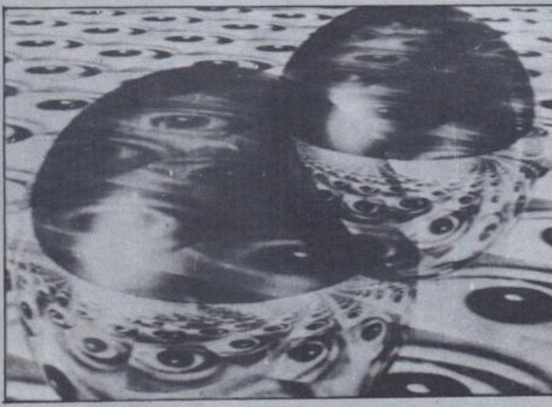

কম্পিউটার গ্রাফিকস

কোনও তাপসৃষ্টি হয় না। কম্পিউটারে সুপারকন্ডাকটরের তৈরি বর্তনী ব্যবহার করতে পারলে তাপসৃষ্টির ভয় থাকবে না, ফলে আরও বহু-বহু গুণে বেশি ট্রানজিস্টার ধরানো যাবে এক-একটি মাইক্রোচিপে। তখন সুপারকম্পিউটার আকারে ফুটবল বা তার চেয়েও ছোট হয়ে যাবে। আর ক্ষমতায় হবে এখনকার তুলনায় কয়েক হাজার গুণ! তথ্য সঞ্চয় ও বিশ্লেষণের বিপুল ক্ষমতার দরুন সুপারকম্পিউটার আজ ব্যবহৃত হচ্ছে জটিল ও দুরূহ বিজ্ঞান গবেষণায়। দূর ও মাঝারি পাল্লার আবহ পূর্বাভাস, বায়ুদূষণের কারণ ও প্রক্রিয়ার সঠিক অনুধাবন, এমনকী মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য জানার কাজেও সুপারকম্পিউটার আজ এক দুর্দান্ত হাতিয়ার। অন্যদিকে প্যারালাল প্রসেসর দিয়ে বুদ্ধিমন্ত কম্পিউটার তৈরিরও চেষ্টা চলেছে। এরই নাম 'আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স', কিছু-কিছু বিজ্ঞানীর মতে চূড়ান্ত পর্বে যা মানুষের মস্তিষ্কের কাছাকাছি চলে যাবে। যার থাকবে অন্তত আংশিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। এখানেই শেষ নয়। এমন কম্পিউটার বেরিয়ে যাবে, যা চলবে বিদ্যুতে নয়, আলোক-প্রবাহের শক্তিতে। ইতিমধ্যেই এর পরীক্ষামূলক একটি মডেলও তৈরি হয়ে গেছে। পাশাপাশি রোবট নিয়েও জোর গবেষণা চলেছে। রোবটও চলে কম্পিউটারের কেরামতিতে। সুদূর ভবিষ্যতে ভন নিউম্যান কল্পিত এমন রোবটও হয়তো তৈরি হবে, যা নিজেই নিজের কপি বানাতে পারে। এক রোবট থেকে অজস্র রোবট। তবে সেটা এখনও কল্পবিজ্ঞানের স্তরেই।

শেখাতে হয়, তা সে যতই প্রাথমিক স্তরেই হোক না কেন, তা হলে স্কুল পাঠক্রমের মধ্যে এটা রাখতে হবে, তৈরি করতে হবে উপযুক্ত পরিকাঠামোও। এজন্য টাকা-পয়সাও লাগবে। গোড়ার দিকে বছর দু'য়েক সরকারি গ্রান্ট মিলেছিল। গত কয়েক বছর তাও ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে আমরা কেউই এ-ব্যাপারে ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছি না। অথচ কম্পিউটার শেখাটা আজ খুবই দরকার।

তুলনায় একটু উজ্জ্বল ছবি পাওয়া গেল ব্যারাকপুর গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে। স্কুলের অন্যতম কম্পিউটার শিক্ষক দীপেন ঘোষ জানালেন, ১৯৮৮ সালে প্রথম দুটি বি বি সি-মাইক্রো স্কুলে দেওয়া হয়। পরে আরও তিনটি মেশিন পাওয়া গেছে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ২৫-৩০ জন ছাত্র নিয়ে মোটামুটি নিয়মিতই ক্লাস করছেন তাঁরা। ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহও প্রচণ্ড। তাদের শেখানো হচ্ছে কম্পিউটার চালানোর কিছু প্রাথমিক পদ্ধতি। এ ছাড়া কম্পিউটারে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি অঙ্ক এবং জ্যামিতি-সংক্রান্ত কিছু-কিছু গ্রাফিক্স। এক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট সিলেবাস অবশ্য নেই।

বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল এবং হেয়ার স্কুলে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ওঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন। মোটামুটি ক্লাসও হচ্ছে। তবে 'প্রোগ্রেস' খুব ভাল নয়। ওঁরাও মনে করেন যে, এটা সিলেবাসে ঢোকানো দরকার। নতুন করে ভাবাও দরকার গোটা ব্যাপারটা নিয়ে।

এক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে আছে হিন্দু স্কুল 'সায়েন্স সেন্টার'। স্কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, অথচ স্বনিয়ন্ত্রিত এই কেন্দ্র কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমান শিক্ষকের উদ্যোগে গড়ে ওঠে ১৯৭৯ সালে। স্কুলের কম্পিউটার কোর্স ওঁরাই চালান। প্রশিক্ষকরা সকলেই বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেন। ছাত্রদের কাছে অতি সামান্য ফি নেওয়া হয়। বছরে ৩৫ টাকা। দুটি স্তরে ছাত্রদের কম্পিউটার শেখানো হয়। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত ছাত্রই শেখে কম্পিউটার চালানোর প্রাথমিক পদ্ধতি। আর ষষ্ঠ থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আগ্রহী ছাত্রদেরই শুধু শেখানো হয় বেসিক (BASIC) কম্পিউটার ল্যাঙ্গোয়েজ এবং কিছু প্রোগ্রামিং। এই পর্যায়ে শিখছে প্রায় ১৫০ জন ছাত্র।

হিন্দু স্কুল সায়েন্স সেন্টারের মধ্যমণি চন্দ্রশেখর রায় স্পষ্ট কথার মানুষ। বললেন,

কম্পিউটার ছাড়া শিক্ষা অচল

তথ্য সঞ্চয় ও বিশ্লেষণের বিপুল ক্ষমতার দরুন সুপারকম্পিউটার আজ ব্যবহৃত হচ্ছে জটিল ও দুরূহ বিজ্ঞান গবেষণায়। দূর ও মাঝারি পাল্লার আবহ পূর্বাভাস, বায়ুদূষণের কারণ ও প্রক্রিয়ার সঠিক অনুধাবন এমনকী মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য জানার কাজেও সুপারকম্পিউটার আর এক দুর্দান্ত হাতিয়ার। অন্যদিকে 'প্যারালাল প্রসেসর' দিয়ে বুদ্ধিমন্ত কম্পিউটার তৈরিরও চেষ্টা চলেছে।

"এ রাজ্যের স্কুলগুলিতে কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেস কর্মসূচি যেভাবে চলছে তার বস্তুত কোনও অর্থই হয় না। সত্যি কথা, আমরাও এর মধ্যে আছি। কিন্তু আমরা একটা উপযোগী সিলেবাস তৈরি করে নিয়েছি। উঁচু ক্লাসের ছেলেদের শেখাচ্ছি কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন। এবং সেটা বেসিক ল্যাঙ্গোয়েজের ভিত্তিতে। জানেন তো কম্পিউটার ০ আর ১ দিয়ে সৃষ্ট দ্বিসাংখ্যিক (Binary) অঙ্কের ভাষা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। কিন্তু এ-ভাষায় প্রোগ্রাম তৈরি করা খুব কষ্টকর এবং সময়সাপেক্ষ। তাই মানুষের ভাষার কাছাকাছি কয়েকটি কম্পিউটার ল্যাঙ্গোয়েজ তৈরি করা হয়েছে, যাদের বলা হয় হাই-লেভেল-ল্যাঙ্গোয়েজ : বেসিক, ফোরট্রান, কোবোল, পাস্কাল ইত্যাদি। এ-জাতীয় ভাষায় কম্পিউটারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে যন্ত্রের মধ্যেই কম্পাইলার অথবা ইন্টারপ্রেটার নামে একটি অংশ তাকে আঙ্কিক ভাষায়

শেখানো কেমন হচ্ছে

প্রশ্ন

১। স্কুলে কম্পিউটার কবে থেকে এল ?
২। কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ কীভাবে দেওয়া হয় ?
৩। আলাদা শিক্ষক আছেন কি না ?
৪। কী-কী 'লেস্‌ন' ছাত্ররা নেয় ?
৫। ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ কেমন ?
৬। কম্পিউটারের প্রযুক্তিগত দিকগুলি তাদের শেখানো হয় কি না।
৭। ছাত্রদের কেরিয়ারের কী-কী সুবিধে এতে হবে ?
৮। রাজ্য শিক্ষা দফতর কম্পিউটারের প্রচলনে স্কুলস্তরে কী-কী ব্যবস্থা নিয়েছেন ?
৯। কোন ধরনের কম্পিউটার স্কুলে আছে ?

উত্তর

হেয়ার স্কুল

১। ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-এর উদ্যোগে ১৯৮৪ সালে এই স্কুলে কম্পিউটার আসে।
২। কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ছুটির পরে, কিংবা কোনও ক্লাসের ফাঁকে বাড়তি সময় পাওয়া গেলে।
৩। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আলাদা কোনও শিক্ষক নেই, তবে তিনজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক আছেন।
৪। কম্পিউটার জিনিসটা কী, কীভাবে তা কাজ করে, কম্পিউটারের ভাষা কী, বিভিন্ন প্রোগ্রাম সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। এককথায় বলা যায়, সফ্‌টওয়্যারের ভিত্তিতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
৫। ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ বিশেষ সন্তোষজনক।
৬। কম্পিউটারের প্রযুক্তিগত দিকগুলি এখানে শেখানো হয় না।
৭। কেরিয়ার তৈরির জন্য ভবিষ্যতে কম্পিউটার কোর্স পড়তে গেলে এই বিষয়ে আগাম শিক্ষা নেওয়া থাকলে যথেষ্ট ভাল।
৮। স্কুলে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সমস্ত ব্যাপারটাই রাজ্য শিক্ষা দফতর পরিচালনা করেন।
৯। আমাদের বি বি সি মাইক্রো কম্পিউটার আছে।

প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন স্কুলের প্রধানশিক্ষক ***নিমাইচাঁদ চক্রবর্তী***

হিন্দু স্কুল সায়েন্স সেন্টার

১। এই স্কুলে প্রায় বছর দশেক আগে কম্পিউটার এসেছে।
২। স্কুল ছুটির পর এক ঘণ্টা স্কুলের ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
৩। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সরকারের তরফ থেকে আলাদা কোনও শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি।
৪। সফ্‌টওয়্যার ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
৫। ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ আছে। কিন্তু সুযোগের রীতিমত অভাব। কারণ, দুটিমাত্র কম্পিউটার।
৬। কম্পিউটারের প্রযুক্তিগত দিকগুলিও শেখানো হয়।
৭। কম্পিউটারের যুগে বাস করে কম্পিউটার অপারেশন না জানলে জীবনের বহু ক্ষেত্রেই অসুবিধে দেখা দিতে পারে। ডাক্তারি কিংবা এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেলে অনেক সুবিধে হবে, যদি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নেওয়া থাকে।
৮। রাজ্য শিক্ষা দফতর নির্বাচনের মাধ্যমে কোনও-কোনও স্কুলে দুটি করে কম্পিউটার দিয়েছেন। পরে আরও কিছু কম্পিউটার দিতে পারেন।
৯। বি বি সি মাইক্রো কম্পিউটার এই স্কুলে আছে।

প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন এই স্কুলের সায়েন্স সেন্টারের ডিরেক্টর ***চন্দ্রশেখর রায়***

মিত্র ইনস্টিটিউশন (মেন)

১। এই স্কুলে কম্পিউটার আসে ১৯৮৮ সালে।
২। এতদিন নিয়মিত কোনও ক্লাস নেওয়া হয়নি। কোনও ক্লাসের ফাঁকে কিংবা ছুটির পরে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এখন চেষ্টা চলছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ক্লাস নিয়মিতভাবে চালু করার।
৩। আলাদা কোনও শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য নেই। তিনজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক আছেন, তাঁরাই প্রশিক্ষণ দেন।
৪। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ক্যাসেট ও ফ্লপির মাধ্যমে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। মূলত সফ্‌টওয়্যারভিত্তিক।
৫। ছাত্রদের মধ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নেওয়ার উৎসাহ খুব বেশি।
৬। কম্পিউটারের প্রযুক্তিগত দিকগুলি এখানে শেখানো হয় না।
৭। ভবিষ্যতে কম্পিউটার কোর্স পড়তে গেলে এই আগাম শিক্ষাটুকু তাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে।
৮। স্কুলে কম্পিউটার রাজ্য শিক্ষা দফতর মারফত পাওয়া যায়। প্রশিক্ষণ চালু করার প্রাথমিক ব্যয়ভারও তাঁরা বহন করেছেন।
৯। এই স্কুলে চালু আছে বি বি সি মাইক্রো কম্পিউটার।

প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন স্কুলের প্রধানশিক্ষক ***বাঁশরীমোহন ভট্টাচার্য***

সমীর ঘোষ

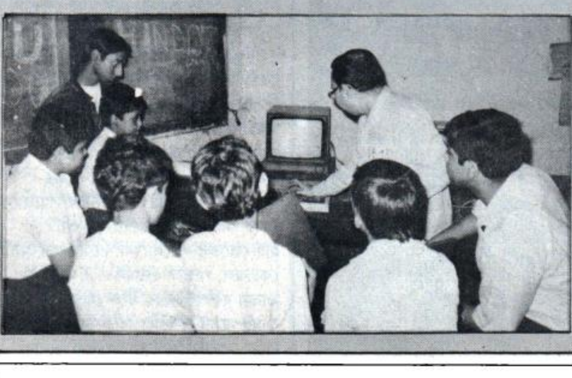

রূপান্তরিত করে এবং কম্পিউটার সেইমতো সাড়া দেয় বা কাজ করে। আধুনিক কম্পিউটারের উদ্ভাবনা এবং উন্নয়ন ইংল্যান্ডে, আমেরিকায় হয়েছে বলেই উচ্চস্তরের সমস্ত ভাষাই ইংরেজি অর্থাৎ রোমান হরফের এবং ধাঁচটাও ইংরেজি ভাষার মতোই। এখন অবশ্য জাপান, ফ্রান্স নিজেদের দেশের ভাষাকে ভিত্তি করে কম্পিউটার ল্যাঙ্গোয়েজ তৈরি করেছে। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে বেসিকই সবচেয়ে উপযোগী, সবচেয়ে সহজে শেখাও যায়। আমরাও তাই 'বিগিনার্স অল পারপাস সিম্বলিক ইন্সট্রাকশান কোড' সংক্ষেপে 'বেসিক' ভাষাই ছাত্রদের শেখাচ্ছি। এবং অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গেই তারা শিখছে।" অদম্য উৎসাহী চন্দ্রশেখরবাবু জানালেন, টিচিং এইড হিসেবেও ওঁরা কম্পিউটার ব্যবহার করছেন। এজন্য এন সি ই আর টি

রোগনির্ণয়ে কম্পিউটার

উদ্যোগ অবশ্যই ব্যতিক্রমই। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অন্য যেসব স্কুলে কম্পিউটার এসেছে, শিক্ষক-ছাত্রদের বাড়তি উৎসাহে দু-এক জায়গা ছাড়া সর্বত্রই ক্লাস প্রোজেক্ট চলেছে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে। পাশাপাশি দিল্লি এবং সেন্ট্রাল বোর্ডের অধীন স্কুলগুলির ছবি একেবারে অন্যরকম। দুটি বোর্ডেই কম্পিউটার পাঠ্যক্রমে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া কম্পিউটার শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামোও আছে। এ-সম্পর্কে দুটি স্কুলে খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। সি বি এস ই-র অধীন গঙ্গাবক্স কানোরিয়া বিদ্যামন্দির বা ভারতীয় বিদ্যাভবন স্কুল এবং আই সি এস ই ও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠক্রম অনুসারী সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল। সল্টলেকের ভারতীয় বিদ্যাভবন স্কুলে

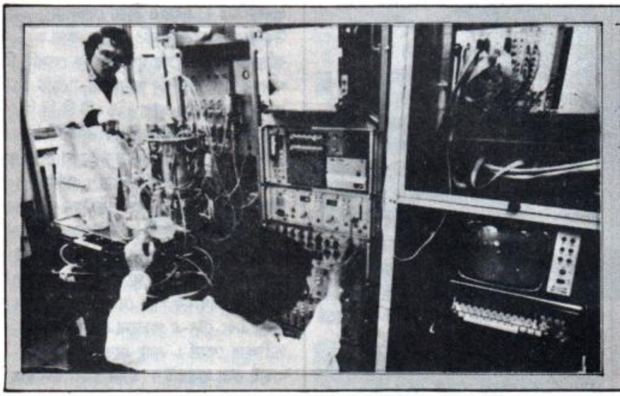

কম্পিউটারকে যে-পথে নির্দেশ দেওয়া হয়, তার নাম 'ইনপুট'। 'পাঞ্চড কার্ড', 'ফ্লপি ডিস্ক', 'কি-বোর্ড' ইত্যাদির মাধ্যমে এই নির্দেশ প্রথমে যায় কম্পিউটারের 'মেমারি' বা স্মৃতিভাণ্ডারে। সেখান থেকে যায় 'সি পি ইউ' বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটে। সি পি ইউ হল একই সঙ্গে কম্পিউটারের মস্তিষ্ক এবং হৃৎপিণ্ড।

ছাড়াও বিদেশ থেকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স, বায়োলজি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর 'এডুকেশনাল প্যাকেজ' অর্থাৎ 'লেস্‌ন-ডিস্ক' আনিয়েছেন। ছাত্রদের দিয়ে এরকম দুটো ডিস্ক এই কেন্দ্রে তৈরিও করা হয়েছে। কিছুদিন আগে একটি কম্পিউটার মেলাও হয়ে গেল এই কেন্দ্রের উদ্যোগে, যেখানে ছাত্ররাই ছিল সবচেয়ে সক্রিয় 'পার্টিসিপ্যান্ট'।

চন্দ্রশেখরবাবু বললেন, "সরকারের ভরসায় না থেকে আমরা নিজেরাই একটি আই বি এম পি সি কিনেছি। ভাবছেন টাকা কোত্থেকে এল ? আমাদের পাবলিকেশন থেকে। 'সায়েন্স করেসপনডেন্স' নামে একটি পত্রিকা বের হয় এই কেন্দ্র থেকে। তার বিজ্ঞাপন থেকে একটা আয় আছে। এ ছাড়া কম্পিউটার বিষয়ক একটি বইয়ের থেকেও বছরে বেশ কয়েক হাজার টাকা আয় হয়। এতে সুবিধা হয়েছে বলতে পারি। এই কেন্দ্রে একটি লাইব্রেরিও করেছি আমরা, যাতে কম্পিউটার বিষয়ক বই আছে প্রায় ২০০।

কম্পিউটার শিক্ষায় হিন্দু স্কুল বিজ্ঞান কেন্দ্র নিঃসন্দেহে এক নজির সৃষ্টি করেছে। এখানে বাইরের লোকের জন্যও স্বল্পমেয়াদি কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আছে। কম্পিউটর হার্ডওয়্যার অর্থাৎ যন্ত্রাংশ বিষয়েও শেখানো হয়। এই কেন্দ্রেরই স্কুলছাত্ররা একাধিকবার পুরস্কৃত হয়েছে বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালা আয়োজিত বাৎসরিক কম্পিউটার মেলায়।

হিন্দু স্কুল বিজ্ঞান কেন্দ্রের কম্পিউটার শিক্ষার কম্পিউটার চালু হয়েছে সবে এক বছর। অধ্যক্ষ জীবনানন্দ গোস্বামী জানালেন, "আপাতত ক্লাস ফোর থেকে এইট পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার শেখাচ্ছি। উঁচুর দিকের ক্লাসগুলিকে বাদ রেখেছি, পড়াশোনার চাপের কারণেই। আপাতত ছেলেমেয়েদের কম্পিউটার সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য, সি বি এস ই-র কম্পিউটার কোর্সের পরীক্ষায় বসানো নয়। তবে ছেলেমেয়েরা যে কম্পিউটার শিখছে তার নিয়মিত 'অ্যাসেসমেন্ট' হয়, ক্লাসে পরীক্ষাও নেওয়া হয়, তাতে নম্বরও আছে।" কয়েকটি কম্পিউটার স্কুলে বসানো হয়েছে এবং কোথা থেকে কীভাবে সেগুলি পাওয়া গেছে জানতে চাওয়া হলে শ্রীগোস্বামী বললেন, "দশটি টেব্‌ল-টপ সেট

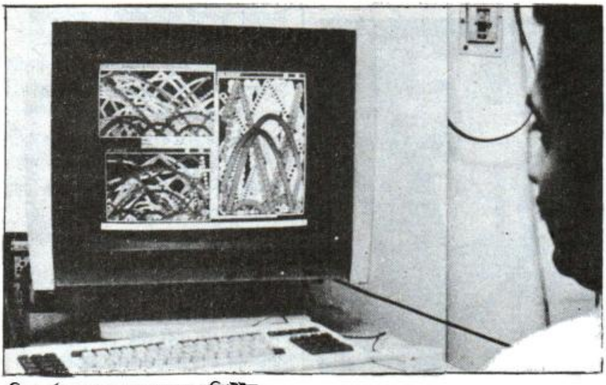

বিজ্ঞানচর্চাকে আরও সহজ করেছে কম্পিউটার

আমরা চার বছরের চুক্তিতে একটি কোম্পানির কাছ থেকে ভাড়া করেছি। ভাড়ার টাকা এবং অন্যান্য খরচ মেটানোর জন্য আমরা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বছরে মাথাপিছু ৬০০ টাকা করে ফি নিচ্ছি। যন্ত্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় দায়িত্ব ওই কোম্পানির। এইসঙ্গে ওঁরা পাঁচজন ট্রেনারও পাঠিয়েছেন। তাঁরাই সকালে, দুপুরে রুটিনমাফিক ক্লাস নিচ্ছেন।"

"সেটগুলি কি সাম্প্রতিক কোনও মডেল, না পুরনো বি বি সি মাইক্রো ?"

"সবই হালের আই বি এম পি সি।"

এবার জবাবটা দিলেন তরুণ কম্পিউটার শিক্ষক সুদীপ্ত শূর। তিনিই নিয়ে গেলেন কম্পিউটার ক্লাস দেখাতে। বেশ বড়সড় পরিচ্ছন্ন একটি ঘর। চারধারে দেওয়াল ঘেঁষে ডেস্ক। তার ওপরে আই বি এম পি সি গুলো সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো। ক্লাস এইটের ছেলেমেয়েদের ক্লাস চলছিল। সেদিন ছিল ওদের কম্পিউটার পরীক্ষা। আরও দু'জন তরুণ শিক্ষক তাই নিয়ে ব্যস্ত। কী ধরনের লেস্‌ন এখানে ছেলেমেয়েদের দেওয়া হচ্ছে জানতে চাইলে সুদীপ্ত শূর বললেন, "নীচের দিকের ক্লাসে মূলত কি-বোর্ড অপারেশন, কম্পিউটার পার্টস চেনানো, অল্পস্বল্প গ্রাফিক্‌স—'টার্টল দিয়ে জিওমেট্রিক ফিগার' আঁকা এইসব। একটু বড়দের অপারেটিং সিস্টেম অর্থাৎ ও এস-এর মাধ্যমে কম্পিউটারকে প্রোগ্রামের জন্য তৈরি করাও শেখানো হচ্ছে। কোনও কোনও কম্পিউটারের মধ্যেই সংযুক্ত থাকে এই ও এস ব্যবস্থা। কোনও মডেলে আবার ফ্লপি ডিস্কে সংরক্ষিত ও এস ব্যবহার করা হয়। এর নাম ডি ও এস। সেক্ষেত্রে বাইরে থেকে ডিস্কটি ঢুকিয়ে দিয়ে কি-বোর্ডে নির্দিষ্ট কয়েকটি চাবি টিপে কম্পিউটারকে কার্যক্ষম করে তোলা হয়। এটা না করলে কম্পিউটার কোনও সাড়াই দেবে না। বেসিক, কোবোল ইত্যাদি উচ্চস্তরের ভাষাকে মেশিন ল্যাঙ্গোয়েজে অর্থাৎ যন্ত্রের নিজস্ব কোড-এ অনুবাদও করে দেয় এই ও এস।"

"ছেলেমেয়েদের মধ্যে শেখবার উৎসাহ কেমন ?"

"অসম্ভব উৎসাহ। এই তো গত বছর ক্লাস এইটেই যারা শুরু করেছে, এ-বছরই তাদের শেখার পালা শেষ। তাই ওদের ভারী দুঃখ।"

স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষায় কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল অবশ্যই অনুসরণযোগ্য। ১৯৮৫ থেকে আই সি এ সি সিলেবাস ধরে ওরা ছাত্রদের কম্পিউটার শেখাচ্ছে। ১৯৯২ সালের গোড়ার দিকে ক্লাস নাইনের ছেলেরা একটি কম্পিউটার প্রদর্শনী করেছিল। চমকে দেওয়ার মতো ! স্কুল-শিক্ষায় কম্পিউটার কতরকমভাবে কাজে আসতে পারে, কম্পিউটারে হার্ডওয়্যার, সফ্‌টওয়্যার ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছিল সেই প্রদর্শনীতে। এবারও গিয়ে দেখলাম উৎসাহে কোনও খামতি নেই। কথা হল কম্পিউটার বিভাগের মুখ্য শিক্ষক লেসলি ডি গামা-র সঙ্গে। তিনি জানালেন, "মোট ২১টি কম্পিউটার আছে স্কুলে। ১০টি বি বি সি মাইক্রো এবং ১১টি আই বি এম পি সি। এর মধ্যে পাঁচটি বি বি সি মাইক্রো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া। বাকিগুলি নিজেদেরই জোগাড় করা। প্রাক্তন ছাত্রদের কাছ থেকেও কয়েকটি সেট উপহার হিসেবে পাওয়া গেছে। ছাত্রদের 'রেস্‌পন্স' বরাবরই খুব ভাল। ক্লাস থ্রি থেকে এইট পর্যন্ত সব ছাত্রকেই প্রাথমিক পাঠ দেওয়া হয়। ক্লাস নাইন এবং টেন-এ পড়ানো হয় ফাইনাল পরীক্ষার কোর্স। এবং এতে সুযোগ পায় বাছাই করা ছাত্ররাই। এখন ১২০ জন ছাত্র এই কোর্স করছে। এতে পাশ করলে যে কেউ কম্পিউটার কেরিয়ারের জন্য উচ্চতর শিক্ষায় যেতে পারে।"

কিছু ছাত্রছাত্রী তো উচ্চতর শিক্ষার জন্যই কম্পিউটার বেছে নেবে। তবে আজ জীবনের সর্বস্তরে যেভাবে কম্পিউটার ঢুকে পড়েছে, কার্যত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাতে প্রায় সবার্থসাধক আশ্চর্য এই যন্ত্রের সঙ্গে পরিচিতি সকলের পক্ষেই প্রয়োজন। না হলে আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা কঠিন হয়ে পড়বে। আর এ পরিচিতি শুরু করতে হবে স্কুল স্তর থেকেই। সুতরাং শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং নিয়ামকদের দেখা উচিত যাতে এক্ষেত্রে কোনও বৈষম্য না থাকে। শুধু শহরের কয়েকটি স্কুলই নয়, গ্রামের স্কুলেও আজ কম্পিউটার পৌঁছনো দরকার।

ভারতীয় বিদ্যাভবনের ক্লাসে কম্পিউটার

প্রাণিবিজ্ঞান

আড়াই হাজার বছর আগেও ঘুরে বেড়াত ম্যামথ

এতদিন ধারণা ছিল, ১০ হাজার বছর আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে ম্যামথ। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে, মাত্র আড়াই হাজার বছর আগেও ওরা টিকে ছিল। লিখেছেন অভিষেক বসু

খ্রিস্ট জন্মের হাজার দেড়েক বছর আগে মিশরে যখন ফারাওদের প্রবল প্রতিপত্তি, প্রাচীন মিশরীয় বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ, তখনও সাইবেরিয়ায় উত্তর মেরু সাগরের এক নির্জন দ্বীপে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াত আদিম রোমশ হাতিরা। যাদের নাম 'ম্যাস্টোডেন' বা 'ম্যামথ'। দ্বীপটির নাম র‍্যাংগেল। এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল যে, মোটামুটি ১০ হাজার বছর আগেই, বিগত হিমযুগের শেষাশেষি, ম্যামথরা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে, আড়াই হাজার বছর আগেও তারা টিকে ছিল, খুব অল্প সংখ্যায়, র‍্যাংগেল নামে বিচ্ছিন্ন ওই দ্বীপে। চমকে দেওয়ার মতো খবর, এই ম্যামথরা ছিল বামন। হিমযুগের সাইবেরীয় ম্যামথরা উচ্চতায় ছিল প্রায় সাড়ে ১০ ফুট, ওজনে কমবেশি ছ' টন। বামন ম্যামথ সে-তুলনায় ৩০ শতাংশ ছোট, যদিও আমাদের চোখে তেমন একটা কিছু খুদে মনে হবে না। উচ্চতায় ফুট ছয়েক, আর ওজনে দু' টন। বামন ম্যামথ সম্পর্কে এই চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের বিবরণ প্রকাশিত হয় ইংল্যান্ডের বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায়। বিবরণ পেশ করেন আন্দ্রেই শের এবং ভাদিম গ্যারুট নামে দুই রুশ পুরাতত্ত্ববিদ। দু'জনেই মস্কোয় রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর বিজ্ঞানী। র‍্যাংগেল দ্বীপ থেকে পাওয়া ম্যামথের গজদন্তের আকার বিশ্লেষণ করে দুই বিজ্ঞানী ওই সিদ্ধান্তে আসেন। দেখা যায়, ২৯টি গজদন্তের মধ্যে ২৪টিই আকারে বেশ ছোট, হিমযুগের ১০ ফুট ওয়ালা ম্যামথদের দাঁতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। কার্বন ডেটিন পদ্ধতিতে দাঁতগুলির বয়স নির্ধারণ করে দেখা যায়, কয়েকটি ছোট দাঁত মাত্র ৩,৯০০ বছরে পুরনো। অর্থাৎ ওই দাঁতের অধিকারী ছিল যে বামন ম্যামথ, ওই সময়েই সে মারা যায়।

পৃথিবী থেকে ম্যামথদের অবলুপ্তির ছ' হাজার বছর পরেও র‍্যাংগেল দ্বীপে ওদেরই এক ক্ষুদ্রতর সংস্করণ টিকে গিয়েছিল কেন? কেনই-বা অতিকায় ম্যামথরা বামন হয়ে গেল? শের এবং গ্যারুটের মতে, ১০ হাজার বছর আগে মূল সাইবেরিয়া ভূখণ্ড থেকে বিস্তীর্ণ তৃণাঞ্চল হারিয়ে যেতে থাকে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বেড়ে উঠতে থাকে ঘন জঙ্গল। তৃণভোজী ম্যামথরা খাদ্যাভাবে দলে-দলে মারা পড়ে। সে-সময়েই কিছু ম্যামথ র‍্যাংগেল দ্বীপে এসে আশ্রয় নেয়। সম্ভবত তখন মূল সাইবেরিয়ার সঙ্গে দ্বীপটির কোনও একটা জায়গায় সংযোগ ছিল, পরে সংযোগকারী ভূখণ্ডটি লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় দ্বীপটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর সেই দ্বীপে ছিল তুন্দ্রা অঞ্চলের অপর্যাপ্ত ঘাস। তাই আরও ছ' হাজার বছরের জন্য বেঁচে গেল আশ্রিত ম্যামথরা। আর পালিয়ে আসার পর কয়েক হাজার বছরের বিবর্তনে আকারেও ছোট ছিল তারা। এর কারণ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের স্বল্প পরিসর এবং খাদ্য পরিবেশের প্রভাবেই বামন হয়ে যায় ওই ম্যামথরা। এভাবেই তারা টিকে যায় অস্তিত্বের লড়াইয়ে।

ফসিল পরীক্ষা করে পাওয়া গেছে ম্যামথের সন্ধান

হাতির পূর্বপুরুষ অতিকায় ম্যামথরা ১০ হাজার বছর আগেই লুপ্ত হয়ে যায় বলে এতদিন ধারণা ছিল বিজ্ঞানীদের। কিন্তু সাম্প্রতিক তথ্যপ্রমাণ বলছে, ওদেরই এক ক্ষুদ্রতর সংস্করণ টিকেছিল আরও অন্তত সাত হাজার বছর, র‍্যাংগেল নামে একটি দ্বীপে। তুন্দ্রা অঞ্চলের অপর্যাপ্ত ঘাসে ছাওয়া সেই দ্বীপের সীমায়িত পরিবেশে বিবর্তিত হয়ে তারা একসময় বামন হয়ে যায়।

গোপালচন্দ্র ছিলেন স্বভাববিজ্ঞানী

জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় কীটপতঙ্গ এবং গাছপালা নিয়ে গবেষণার জন্য খরচ করেছিলেন প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। লিখেছেন **মালা ভট্টাচার্য**

প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র

ছেলেটির বয়স মাত্র পাঁচ বছর পাঁচ মাস। হঠাৎই বাবার মৃত্যু হল। মা শশিমুখী দেবী শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরলেও দুঃখ-দারিদ্র্য তাঁদের ছেড়ে গেল না। এরই মধ্যে পাঠশালার পাঠ শেষ করে ছেলেটি ভর্তি হল স্কুলে। মা এবং ছোট আরও তিন ভাই-এর সংসারের ভার সামলানোর জন্য শুরু হল জীবনসংগ্রাম। বাবা অম্বিকাচরণ ছিলেন গ্রামের জমিদারবাড়ির কুলপুরোহিত, ব্যস্ত থাকতেন যজন-যাজন ও সংস্কৃতচর্চা নিয়ে। সংসারের চাপে বাবার এই যজন-যাজন রক্ষার জন্য ন' বছর বয়সেই উপনয়ন হয় ছেলেটির। দুর্গম পথ পেরিয়ে যজমানের বাড়িতে পুরোহিতের কাজ সেরে বাড়ি ফিরে কোনওমতে খাওয়াদাওয়া সেরে আবার তাকে ছুটতে হত স্কুলে ; এভাবেই পড়া ও যজমানি—দুটো কাজ একই সঙ্গে চলতে থাকে। কষ্ট করে পড়াশুনো চালানোর পর, ছেলেটি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফরিদপুর জেলায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।

সেদিনের এই ছেলেটিই প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। জন্ম ১৮৯৫ সালের ১ অগস্ট, অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় তিনি ব্যয় করেছিলেন কীটপতঙ্গ এবং গাছপালার গবেষণায়, আর আজীবন চেষ্টা করেছিলেন সহজভাবে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর গোপালচন্দ্র ভর্তি হলেন ময়মনসিং-এর আনন্দমোহন কলেজে। কিন্তু এখানেও বিঘ্ন ঘটল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে তাঁর কলেজে পড়া শেষ হল। স্কুলে মেধাবী ছিলেন বলে শিক্ষকতার চাকরি পেলেন। পড়ানোর ফাঁকে-ফাঁকে ঘুরে বেড়াতেন বনে-জঙ্গলে। নিবিষ্ট মনে লক্ষ করতেন কীটপতঙ্গের গতিবিধি। গাছপালা নিয়ে করতেন নানান পরীক্ষা। অজানাকে জানার এই আগ্রহই তাঁকে বিজ্ঞানসাধনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই তাঁকে বলা যায় স্বভাববিজ্ঞানী।

যে বিষয় না জানালে গোপালচন্দ্রের গবেষক জীবনের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তা হল আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ভারী অদ্ভুতভাবে এর সূচনা।

কৌতূহলবশত গোপালচন্দ্র এক বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যায় গ্রামের পাঁচির মার ভিটের ভৌতিক আলোর রহস্য ভেদ করতে চললেন। ঝোপঝাড়ের মধ্যে পাঁচির মা-র ভিটেতে প্রায়ই আগুন জ্বলতে দেখে গ্রামবাসীরা রীতিমত ভয় পেত। টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে গোপালচন্দ্র একদিন সেখানে গেলেন। চারপাশে বড়-বড় গাছের মাথায় জমাট বাঁধা অন্ধকার, মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট ঝোপ, আলোটা বের হচ্ছে সেখান থেকেই, মনে হয় মাঝে মাঝে দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে যাচ্ছে। কাছে যেতেই দেখা গেল যেন গনগনে আগুনের একটা কুণ্ড, কিন্তু আলোটা স্নিগ্ধ নীলাভ, তাতে চতুর্দিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। একটা কাটা গাছের ভেজা গুঁড়ি থেকেই আলোটা বের হচ্ছিল। গুঁড়িটা জ্বলে-জ্বলে একটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছিল। আর তার ঠিক পাশে একটা কচুগাছের পাতা হাওয়ায় তার ওপর এমনভাবে হেলে পড়ছিল যে, দূর থেকে মনে হচ্ছিল আলোটা জ্বলছে, নিভছে। এ-দৃশ্য কিন্তু দিনে দেখা যেত না। কিছুদিন পর এক রাত্রে বড় একটা পুকুরের পাশের রাস্তার ধারে গোপালচন্দ্র একই দৃশ্য দেখলেন ; সেই আলোর কিছুটা তুলে এনে দেখেন কিছু ভিজে লতাগুল্ম থেকে আলোটা বের হচ্ছে। ভিজে পচা গাছপালার এই আলো বিকিরণ সম্বন্ধে গোপালচন্দ্র সেই সময়ের বিখ্যাত বাংলা মাসিক 'প্রবাসী'তে লেখা পাঠান (১৩২৬ বঙ্গাব্দ) যা অচিরেই জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের সহায়তায় গোপালচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিজ্ঞানাচার্যের ডাকে বিজ্ঞানমন্দিরে শুরু হল গোপালচন্দ্রের গবেষণা।

গোপালচন্দ্র প্রথমদিকে উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা শুরু করলেও বিশেষ কারণবশত তা বেশি এগোয়নি। কিন্তু সেজন্য তাঁর গাছপালা পর্যবেক্ষণের উৎসাহ ও তথ্যগুলি নিয়ে আলাদাভাবে লেখার আগ্রহ কমে যায়নি। 'উদ্ভিদের রাহাজানি', 'গাছের আলো' 'শিকারি গাছের কথা' ইত্যাদি তাঁর উদ্ভিদ সম্বন্ধে লেখা উল্লেখযোগ্য রচনা।

যাই হোক গোপালচন্দ্রের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত ব্যাঙাচি, মাকড়সা, পিঁপড়ে,

শুঁয়োপোকা ইত্যাদি কীটপতঙ্গের আচার-আচরণ, খাদ্যসংগ্রহ, বংশবিস্তার প্রণালী। তাঁর লেখা থেকেই প্রথম জানা যায়, মাকড়সা, টিকটিকি, চামচিকে, আরশোলা, মাছ এমনকী ছোট সাপও খায়। মাছ-শিকারি মাকড়সা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, এরা দিনের বেলা অনেকটা সময় থাকে জলের ওপর, কখনও-বা ভাসমান উদ্ভিদের পাতার ঠিক নীচে। কাছাকাছি ছোট-ছোট মাছ একসঙ্গে জড়ো হলে, এরা চুপ করে তাদের দেখে, তারপর হঠাৎই কোনও একটা মাছের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিষদাঁত ফুটিয়ে মেরে ফেলে তাকে।

পিঁপড়ে অনুকরণকারী মাকড়সা সম্বন্ধে এই বিজ্ঞানীর অভিমত, কীটপতঙ্গরাও অনুকরণপ্রিয় হয়। এই মাকড়সার শুধু হাঁটাচলা নয়, গায়ের রং, শারীরিক গঠন সবই পিঁপড়ের মতো হয়। আত্মরক্ষার জন্যই এই অনুকরণ। পিঁপড়ে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে তাদের বুদ্ধির যে পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন তা অভূতপূর্ব। গোপালচন্দ্র একবার একটা মরা আরশোলা সমেত এক শিশি আঠা এক জায়গায় ঢেলে ফেলেছেন। কয়েকদিন পর দেখেন লাল রঙের ছোট-ছোট বিষপিঁপড়ে ওই আঠার ভেতর দিয়ে আরশোলার কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছে, আর আটকে পড়ছে আঠায়। আধ ঘণ্টা ধরে এইরকম চলার পর সেখানে অসংখ্য পিঁপড়েকে হাজির হতে দেখা গেল, যারা প্রত্যেকেই মুখে ছোট-ছোট কাঁকর নিয়ে আঠার ওপর পরপর ফেলছে আরশোলার কাছে পৌঁছনোর সেতু বানানোর জন্য। প্রায় দু' ঘণ্টা গঠনকার্য চলার পর, সেতুর ওপর দিয়ে আরশোলার কাছে পৌঁছে, দল বেঁধে নেমে পড়ল তার দেহখণ্ড জোগাড়ের কাজে। এই ঘটনা থেকে আমরা শুধু যে পোকামাকড়ের জীবনযাত্রার কথা জানতে পারি, তাই নয়। গোপালচন্দ্রের অদ্ভুত ধৈর্য, অনুসন্ধিৎসা এবং তথ্য উপস্থাপনার ক্ষমতাটি বারবার আমাদের মুগ্ধ করে।

কীটপতঙ্গের জীবনের যেসব অদ্ভুত দিক তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হল শুঁয়োপোকার মৃত্যু অভিযান।

পেনিসিলিন প্রয়োগে ব্যাঙাচির শারীরিক বিকাশ রোধ গোপালচন্দ্রের এক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা, যা যে-কোনও আন্তর্জাতিক গবেষণার সঙ্গে তুলনীয়। ব্যাঙাচি ব্যাঙে পরিণত হয় থাইরক্সিন হর্মোনের প্রভাবে, গোপালচন্দ্র লক্ষ করেন যে, তাদের এই রূপান্তর বন্ধ করা যায় পেনিসিলিন প্রয়োগের ফলে, এতে ব্যাঙাচি বড় ব্যাঙাচি থেকে যায়,

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে গোপালচন্দ্রের নিষ্ঠার তুলনা ছিল না

ব্যাঙ আর হয় না। এ ছাড়া পিঁপড়ে সমাজে রাজা, রানি, পুরুষ ও শ্রমিক বা সৈনিক পিঁপড়ের সংখ্যা নির্ধারিত হতে পারে খাদ্যনিয়ন্ত্রণ করে, এই খাদ্যনির্ভর থিয়োরিও গোপালচন্দ্রের গবেষণাধীন ছিল।

গোপালচন্দ্র ছিলেন প্রচারবিমুখ, তাই কুমোরে পোকা সম্বন্ধে তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্য প্রকাশের সময়টিও তিনি লিখে রাখেননি। মানুষের মতো পতঙ্গরাও বাচ্চা চুরি করে, এ এক অভিনব ঘটনা, যা জানা যায় গোপালচন্দ্রের গবেষণা থেকে। তাঁর 'ভীমরুলের রাহাজানি' পড়লে জানা যায়, কীভাবে দৈহিক শক্তি ও দুষ্টুবুদ্ধি নিয়ে কয়েকটা ভীমরুল শত-শত বোলতার সামনে থেকে বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। দিনের পর দিন সম্ভাব্য বিপদ তুচ্ছ করে পোকামাকড়দের আচরণ লক্ষ করতেন এই বিজ্ঞানী।

পিঁপড়ের 'ব্লিৎসক্রিগ' সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রকাশ করে বিজ্ঞানী গোয়েট্‌স খ্যাতিলাভ করেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রচারের অভাবে ওই একই বিষয় নিয়ে গবেষণা করলেও বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্রের কথা জানেন খুব কম মানুষ। ব্লিৎসক্রিগ অর্থাৎ 'যুদ্ধক্ষেত্রে ঝটিকাবাহিনীর দুর্ধর্ষ আক্রমণ' শুধু মানুষই নয়, প্রাণী-পতঙ্গেরাও করে থাকে, এ-বিষয়টিও প্রকৃতিবিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে বাদ যায়নি। তাঁর সুদীর্ঘ অধ্যবসায় এই সত্য উদ্‌ঘাটন করেছিল যে, ডানাবিহীন লালরঙের নালসো বা শ্রমিক পিঁপড়েরা যুদ্ধের সময় যেমন সৈনিকের কাজও করে, তেমনই রানি ও পুরুষের সংসারের যাবতীয় কাজও তাদের করতে হয়।

এরকম অজস্র তথ্য জানা গেছে গোপালচন্দ্রের গবেষণা থেকে।

কীটপতঙ্গের জীবনযাত্রা সম্পর্কে লেখা তাঁর বই 'বাংলার কীটপতঙ্গ' ১৯৭৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে। এ ছাড়াও 'বাংলার গাছপালা', 'বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার', 'বিজ্ঞান অমনিবাস', 'পশুপাখি কীটপতঙ্গ', 'বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সংবাদ' ইত্যাদি বইগুলি তাঁর অত্যাশ্চর্য গবেষণার সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর ভাবনার জগতে শিশুরা অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল, যাদের জন্য তিনি লিখেছেন এক আশ্চর্য বই, 'করে দেখ'।

বাংলায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখায় দক্ষ হলেও ইংরেজিতেও তিনি লিখেছেন বহু প্রবন্ধ। অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর সম্পাদনা করেছিলেন তিনি দীর্ঘদিন। আজ যাঁরা বাংলার স্বনামধন্য বিজ্ঞান-লেখক, একসময় তাঁদের লেখাও প্রকাশিত হত এই পত্রিকায়।

এই অসাধারণ প্রকৃতিবিজ্ঞানী সম্মানিত হয়েছেন বহুবার। ১৯৫১ সালে প্যারিসে সামাজিক পতঙ্গবিষয়ক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে ভারতীয় শাখা পরিচালনার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন, কিন্তু যোগদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯৬৮ সালে তিনি পান 'আনন্দ পুরস্কার'। ১৯৭৪ সালে বসু বিজ্ঞান মন্দির থেকে তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা জানানো হয় এবং বিজ্ঞান পরিষদ থেকে 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু ফলক' দেওয়া হয়। ১৯৭৯ সালে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পক্ষ থেকে পান 'জুবিলি মেডেল'। ১৯৮০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি. এসসি. ডিগ্রি প্রদান করে।

গোপালচন্দ্র পরাধীন দেশের মুক্তিকামী বিপ্লববাদের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি গুপ্ত সমিতির জন্য নানা বিস্ফোরক পদার্থের ফরমুলা সরবরাহ করতেন ও পরোক্ষে নানাভাবে তাদের সাহায্য করতেন। এ ছাড়া তিনি গ্রামের অবহেলিত শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য স্থাপন করেছিলেন 'কমল কুটির', বিনা বেতনে সেখানে লেখাপড়ার সঙ্গে মেয়েদের শেখানো হত হাতের কাজ। সামাজিক কুসংস্কার ও জাতপাতের বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন।

১৯৮১ সালের ৮ এপ্রিল কলকাতায় তাঁর বাসভবনে এই স্বভাববিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য লোকান্তরিত হন।

কেরিয়ার গাইড

ভর্তি ও চাকরির পরীক্ষার খবর

ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপির মতো পেশাদারি কোর্সে ভর্তি হতেও জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষায় বসতে হবে। তা ছাড়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে সরাসরি নিয়োগের হদিসও দেওয়া হল এই সংখ্যায়।

রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া তাদের বিভিন্ন পেশাদারি কোর্সে ভর্তির জন্য জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষা নেবে ২৯ মে তারিখে। এই পরীক্ষায় সফল হলে যেসব কোর্সে ভর্তি হওয়া যাবে, সেগুলি হল : (১) ব্যাচেলর ইন ফিজিওথেরাপি ; (২) ডিপ্লোমা ইন প্রোস্থেটিক অ্যান্ড অর্থোটিক এঞ্জিনিয়ারিং ; (৩) ব্যাচেলর ইন অকুপেশনাল থেরাপি ; (৪) ব্যাচেলর্স ডিগ্রি কোর্স ইন মেন্টাল রিটার্ডেশন।

কোথায় পড়ানো হয়

এবার জানা দরকার, এইসব পেশাদারি কোর্স কোথায় পড়ানো হয়। রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার অধীন চারটি শিক্ষায়তনে এইসব কোর্স পড়ানো হয়। যেমন (১) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব রিহ্যাবিলিটেশন ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ (ওলাতপুর, পোঃ বৈরই, জেলা : কটক, পিন ৭৫৪ ০১০)-এ পড়ানো হয় ব্যাচেলর ইন ফিজিওথেরাপি, ব্যাচেলর ইন অকুপেশনাল থেরাপি ও ডিপ্লোমা ইন প্রোস্থেটিক অ্যান্ড অর্থোটিক এঞ্জিনিয়ারিং কোর্স। প্রথম দুটি কোর্স তিন বছরের। পাশ করার পর আরও ছ' মাস ইন্টার্নশিপ। ডিপ্লোমা কোর্সটি দু' বছরের ; এক্ষেত্রেও পাশ করার পর ছ' মাসের ইন্টার্নশিপ। (২) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য অর্থোপেডিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড (বনহুগলি, বি. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৯০)। এখানে পড়ানো হয় তিনটি কোর্স। ব্যাচেলর ইন ফিজিওথেরাপি, ব্যাচেলর ইন অকুপেশনাল থেরাপি ও ডিপ্লোমা ইন প্রোস্থেটিক অ্যান্ড অর্থোটিক এঞ্জিনিয়ারিং কোর্স। প্রথম দুটি কোর্স ইন্টার্নশিপ সহ সাড়ে তিন বছরের, আর ডিপ্লোমা কোর্সটি ইন্টার্নশিপ সহ আড়াই বছর মেয়াদের। (৩) ইনস্টিটিউট ফর দ্য ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড (৪ বিষ্ণু দিগম্বর মার্গ, নয়া দিল্লি-১১০০০২)। এখানে পড়ানো হয় ডিপ্লোমা ইন প্রোস্থেটিক অ্যান্ড অর্থোটিক এঞ্জিনিয়ারিং কোর্স। কোর্সের মেয়াদ ইন্টার্নশিপ সমেত আড়াই বছর। (৪) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড (মনোবিকাশ নগর, সেকেন্দ্রাবাদ- ৫০০০১১)। এখানে পড়ানো হয় ব্যাচেলর্স ডিগ্রি কোর্স ইন মেন্টাল রিটার্ডেশন। কোর্সটি হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কোর্স। কোর্সের মেয়াদ তিন বছর।

পরীক্ষা কেন্দ্র

বিভিন্ন কোর্স এবং কোথায় পড়ানো হয় এ-বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া গেল। এবার জানতে হবে জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষার কেন্দ্র থাকছে কোথায় কোথায় ? দেশের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ শহরেই পরীক্ষাকেন্দ্র করা হয়েছে। তবুও প্রার্থীদের সুবিধের জন্য সেইসব শহরের নাম উল্লেখ করছি : আহমেদাবাদ, ইলাহাবাদ, মহীশূর, ভোপাল, ভুবনেশ্বর, বোম্বাই, কলকাতা, দেরাদুন, দিল্লি, গুয়াহাটি, হায়দরাবাদ, জয়পুর, মাদ্রাজ, রাঁচি, ত্রিবান্দ্রম ইত্যাদি। পরীক্ষা হবে ২৯মে, '৯৪ তারিখে।

যোগ্যতা

বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির জন্য জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে গেলে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা দরকার, তা জানা না থাকলে আবেদন করা মুশকিল। যেসব প্রার্থী ব্যাচেলর ইন ফিজিওথেরাপি ও ব্যাচেলর ইন অকুপেশনাল থেরাপি কোর্সে ভর্তির জন্য পরীক্ষায় বসবেন, তাঁদের অবশ্যই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় (১০+২ পর্যায়ে) ফিজিক্‌স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি,

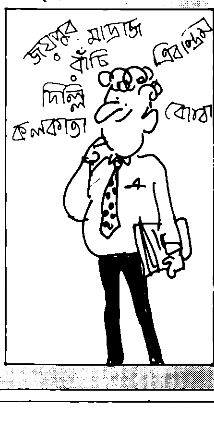

ইংরেজি বিষয় নিয়ে পাশ করতে হবে এবং ফিজিক্‌স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি বিষয়ে অন্তত শতকরা ৫০ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। আর যাঁরা প্রোস্থেটিক অ্যান্ড অর্থোটিক এঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের জন্য আবেদন করবেন, তাঁদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় (১০+২ পর্যায়ে) অবশ্যই ফিজিক্‌স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিকস্‌ ও ইংরেজি সহ পাশ করতে হবে এবং ফিজিক্‌স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিকস্‌ বিষয়ে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। তবে তফসিলি জাতি, উপজাতি ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ফিজিক্‌স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি কিংবা ম্যাথমেটিক্‌সে ৪০ শতাংশ নম্বর পেলেই আবেদন করা যাবে। ব্যাচেলর্স ডিগ্রি কোর্স ইন মেন্টাল রিটার্ডেশন নিয়ে যাঁরা পড়তে চান, তাঁরা ১০+২ পর্যায়ের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে-কোনও কম্বিনেশন সহ এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করলেই আবেদন করতে পারবেন। তফসিলি জাতি, উপজাতির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করলেই চলবে। এ-প্রসঙ্গে জানাই, এ-বছর যাঁরা মার্চ-এপ্রিলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেন, তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল যদি ৩০ জুন তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা হলে তাঁরাও জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এইসব কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদনকারীর বয়স ১

অমর দাশ

অক্টোবর, '৯৪ তারিখের হিসেবে কমপক্ষে ১৭ বছর হতেই হবে। সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ২৫ বছর এবং তফসিলি জাতি, উপজাতি, দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন বয়ঃসীমা ৩০ বছর।

কীভাবে আবেদন করবেন

প্রসপেক্টাস ও অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম যে-কোনও ইনস্টিটিউটের অফিস থেকে কিংবা রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার (৪ বিষ্ণু দিগম্বর মার্গ, নয়া দিল্লি-১১০০০২) অফিস থেকে সংগ্রহ করা যাবে। এজন্য অবশ্য ২০ টাকার পোস্টাল অর্ডার কিংবা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট নিয়ে যেতে হবে। ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট যে-কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের দিল্লি অথবা নয়া দিল্লি শাখার ওপর কাটলেই চলবে। তবে রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার অনুকূলে কাটতে হবে। পোস্টাল অর্ডারটি দিল্লি অথবা নয়া দিল্লি পোস্ট অফিসে প্রদেয় হতে হবে। ডাকযোগে সংগ্রহ করতে হলে ২০ টাকার জায়গায় ৩০ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট কিংবা পোস্টাল অর্ডার কাটতে হবে এবং সঙ্গে পাঠাতে হবে ১২×২৮ সেন্টিমিটার মাপের নাম-ঠিকানা লেখা একটি বড় মাপের খাম। সবক'টি কোর্সের জন্য একই জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, সেজন্য প্রার্থীকে ব্যাচেলর ইন ফিজিক্যাল থেরাপি বা অকুপেশনাল থেরাপি, কিংবা ডিপ্লোমা ইন প্রোস্থেটিক অ্যান্ড অর্থোটিক এঞ্জিনিয়ারিং অথবা ব্যাচেলর্স ডিগ্রি ইন মেন্টাল রিটার্ডেশন, যে-কোনও একটি কোর্সের ভর্তির জন্য আবেদন করতে হবে। বিভিন্ন কোর্সের প্রার্থীকে ফর্ম জমা দেওয়ার সময় পরীক্ষার ফি বাবদ সাধারণ ক্যাটিগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা ও তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১০ টাকা দামের পোস্টাল অর্ডার কিংবা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট জমা দিতে হবে। ফর্ম জমা দেওয়ার ঠিকানা : সেক্রেটারি, রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া, ৪ বিষ্ণু দিগম্বর মার্গ, নয়া দিল্লি-১১০০০২। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন ১ এপ্রিল, '৯৪।

অন্যান্য সুযোগ

বিভিন্ন শিক্ষায়তনে বাইরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য হস্টেলের ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া বিভিন্ন কোর্সে মনোনীত প্রার্থীদের মাসিক ১০০ টাকা হারে স্টাইপেন্ড দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে।

ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষা

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উদ্যোগে ২৪ জুলাই তারিখে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসে সরকারি অফিসার পদে নিয়োগের জন্য এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। যেসব শহরে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে সেগুলি হল, আগরতলা, আহমেদাবাদ, আইজল, ইলাহাবাদ, বাঙ্গালোর, ভোপাল, বোম্বাই, কলকাতা, কটক, দিল্লি, দিশপুর (গুয়াহাটি), গ্যাংটক, ইম্ফল, ইটানগর, যোরহাট, কোহিমা, লখনউ, মাদ্রাজ, পটনা, পোর্টব্লেয়ার, রায়পুর, সম্বলপুর, শিলং ইত্যাদি।

যোগ্যতা

এই সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে হলে প্রার্থীকে বটানি, কেমিস্ট্রি, জিওলজি, ম্যাথমেটিক্‌স, ফিজিক্‌স, স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স, জুলজি— যে-কোনও একটি বিষয় সহ স্নাতক হতে হবে। এ ছাড়া এগ্রিকালচার, ফরেস্ট্রি কিংবা এঞ্জিনিয়ারিং স্নাতকরাও আবেদন করতে পারবেন। ১ জুলাই '৯৪ তারিখের হিসেবে প্রার্থীর বয়স হতে হবে ২১ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ প্রার্থীর জন্ম তারিখ যেন ২ জুলাই, ১৯৬৬ তারিখের আগে কিংবা ১ জুলাই, ১৯৭৩ তারিখের পরে না হয়।

অন্যান্য নিয়ম

কোনও প্রার্থী চারবারের বেশি এই পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। পরীক্ষার ফি ৬০ টাকা। জমা দিতে হবে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট কিংবা পোস্টাল অর্ডারে। ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টের ক্ষেত্রে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ওপর ড্রাফ্‌ট কাটতে হবে (ড্রাফটটি সেক্রেটারি,

সফল হলেই সুযোগ

ইউ. পি. এস. সি-র ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষায় সফল হতে পারলে কেন্দ্রীয় সরকারের ফরেস্ট সার্ভিসে ভাল বেতনে চাকরির সুযোগ। রীতিমত 'চ্যালেঞ্জিং জব'। তবে চাকরি পাওয়াটাও একটা 'চ্যালেঞ্জ'! প্রস্তুতিতে ত্রুটি থাকলে সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। জোর দিতে হবে কম্পালসারি ও অপশনাল এই দুটি ক্ষেত্রেই।

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অনুকূলে নয়া দিল্লি শাখার ওপর হতে হবে)। সেন্ট্রাল রিক্রুটমেন্ট ফি স্ট্যাম্পেও ফি দেওয়া যাবে।

পরীক্ষা

লিখিত পরীক্ষা অংশে একজন প্রার্থীকে দুটি কম্পালসারি বিষয়ে পরীক্ষায় বসতে হবে— জেনারেল ইংলিশ ও জেনারেল নলেজ। প্রত্যেকটি ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় তিন ঘণ্টা করে। এ ছাড়া দুটি 'অপশনাল' বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। ২০০ নম্বর হিসেবে মোট দুটি বিষয়ে ৪০০ নম্বরের পরীক্ষা। অপশনাল বিষয়ের তালিকার মধ্যে আছে এগ্রিকালচার, বটানি, কেমিস্ট্রি, সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং, জিওলজি, এগ্রিকালচারাল এঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথমেটিক্স, মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং, ফিজিক্স, জুলজি, স্ট্যাটিস্‌টিক্স, ফরেস্ট্রি। তবে মনে রাখবেন একই সঙ্গে এগ্রিকালচার ও এগ্রিকালচারাল এঞ্জিনিয়ারিং, কেমিস্ট্রি ও কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথমেটিক্স,স্ট্যাটিস্‌টিক্স বিষয় নেওয়া যাবে না।
লিখিত পরীক্ষায় সফল হওয়ার পর প্রার্থীদের পার্সোন্যালিটি টেস্ট দিতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্ণ মান ১৫০।

সিলেবাস

কোন বিষয়ে কী-কী থাকছে তা জানতে হলে অবশ্যই 'এমপ্লয়মেন্ট নিউজ' (১২ ১৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা) দেখা দরকার। এই সংখ্যায় বিভিন্ন বিষয়ে সিলেবাসের খুঁটিনাটি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় একজন স্নাতকের পক্ষে ইংরেজি, সাধারণ জ্ঞান কিংবা অন্যান্য বিষয়ে যেটুকু জ্ঞান থাকা দরকার,প্রশ্নের ধরন সেই মান বজায় রেখেই করা হয়। যেমন, ইংরেজিতে শব্দের ব্যবহার, প্রেসি বা সামারি লিখতে দেওয়া হয়, আবার সাধারণ জ্ঞান

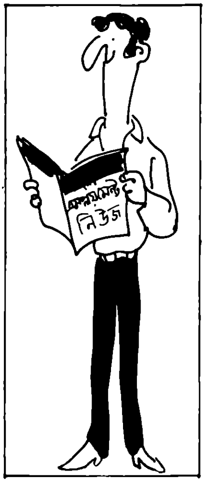

প্রশ্নে সাম্প্রতিককালের পারিপার্শ্বিক ও বিশ্ব-ঘটনা, বিজ্ঞান সংবাদ, ভারতের শাসনব্যবস্থা, ভারতের সংবিধান, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিভিন্ন বিষয়েই প্রশ্ন করা হয়। অপশনাল বিষয়ে সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ কোর্সের সিলেবাস অনুসরণ করা হয়।

আবেদনের নিয়ম

নির্দিষ্ট প্রো-ফর্মায় দরখাস্ত করতে হবে। প্রো-ফর্মার জন্য 'এমপ্লয়মেন্ট নিউজ' (১২-১৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা) দেখে নেওয়া দরকার। সঙ্গে দিতে হবে, পরীক্ষার ফি বাবদ ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট, অ্যাটেন্ডেন্স শিট, দু' কপি ফোটো, নাম-ঠিকানা লেখা ৪৫ পয়সার অতিরিক্ত ডাকটিকিট লাগানো পোস্টকার্ড, দুটি বড় মাপের (১১.৫ × ২৭.৫ সেন্টিমিটার) নাম-ঠিকানা লেখা স্ট্যাম্পবিহীন খাম ইত্যাদি।
ফর্ম ডাকযোগে বা সরাসরি পাঠানোর ঠিকানা : সেক্রেটারি, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ঢোলপুর হাউস, নয়াদিল্লি- ১১০০১১। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৮ মার্চ, '৯৪।

চাকরির পরীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দফতরের জুনিয়ার অফিসার পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেওয়া হবে ৫ জুন। এই মিসসেলানিয়াস সার্ভিসেস রিক্রুটমেন্ট পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ইন্সপেক্টর অব কমার্শিয়াল ট্যাক্স, অ্যাসিস্ট্যান্ট চাইল্ড ডিভেলাপমেন্ট প্রোজেক্ট অফিসার, ইনস্পেক্টর অব রিলিফ, ইনস্পেক্টর অব এন্ট্রি ট্যাক্স, ইনস্পেক্টর অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট অফিসার ইত্যাদি পদে সরাসরি নিয়োগ করা হবে। মেয়েরাও সব পদের জন্যই পরীক্ষায় বসতে পারবেন, কেবলমাত্র সাব ইনস্পেক্টর অব এক্সাইজ পদের জন্য তাঁরা বিবেচিত হবেন না।

যোগ্যতা

এই পরীক্ষা দিতে হলে প্রার্থীকে স্নাতক হতে হবে। বয়স হওয়া চাই ১ জানুয়ারি, '৯৪ তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলি প্রার্থীদের বয়সের ক্ষেত্রে বৈধ ছাড় আছে। দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা ৪৫ বছর। সাব-ইনস্পেক্টর অব এক্সাইজ পদের ক্ষেত্রে দৈহিক পরিমাপের একটা বিষয় আছে। উচ্চতা থাকা চাই ১৬০ সেন্টিমিটার, বুকের ছাতি হওয়া চাই ৭৬ সেন্টিমিটার, ৫ সেন্টিমিটার সম্প্রসারণ করতে পারা চাই। গোর্খা, গাড়োয়াল, অসমিয়া, আদিবাসী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় ছাড় আছে।

পরীক্ষা

তিনটি পেপারে পরীক্ষায় বসতে হবে। প্রথম পেপারে ইংরেজি, দ্বিতীয় পেপারে বাংলা এবং তৃতীয় পেপারে জেনারেল স্টাডিজ ও অ্যারিথমেটিক। প্রথম দুটি পেপারের পরীক্ষা সাবজেক্টিভ এবং তৃতীয় পেপারের পরীক্ষা অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্নে করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় সফল হওয়ার পর নেওয়া হয় পার্সোন্যালিটি টেস্ট। ইংরেজি ও বাংলা প্রত্যেক পেপারে পূর্ণ মান ১৫০, তৃতীয় পেপারে দুটি গ্রুপে অর্থাৎ জেনারেল স্টাডিজ ও অ্যারিথমেটিকে দুশো নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হয়। ইংরেজি পরীক্ষায় ড্রাফটিং, প্রেসিস, ট্রানস্লেশন কারেকশন, সিনোনিমস, অ্যান্টোনিমস প্রভৃতি থেকে প্রশ্ন করা হয়। বাংলা পেপারে থাকে ব্যাকরণ ও অন্যান্য অনুবাদ। জেনারেল স্টাডিজ পেপারে সাম্প্রতিক ঘটনা, ভারতের সমস্যা, ভারতের ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন করা হয়। অ্যারিথমেটিক প্রশ্নের মান মাধ্যমিকের মানের মত।

কীভাবে আবেদন করবেন

নির্দিষ্ট প্রো-ফর্মা অনুযায়ী দরখাস্ত করতে হবে। প্রো-ফর্মার জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা (১৯ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা) দেখে নিন। তা ছাড়া কমিশনের অফিসে নোটিস বোর্ডেও প্রো-ফর্মা টাঙানো আছে। পূরণ-করা ফর্ম কমিশনের অফিসে হাতে-হাতে অথবা ডাকযোগে পাঠানো যেতে পারে। ঠিকানা : ডেপুটি সেক্রেটারি (এগজামিনেশন), পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৬১এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০২৬। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ দিন ২২ মার্চ, '৯৪।

ছবি : দেবাশিস দেব

টিনটিন * হার্জে

তখন...
প্রোফেসর, বৃষ্টি হচ্ছে। ছাতা নিতে ভুলবেন না...আর চশমা।
চিন্তা নেই, আর্নেস্টিন। চশমা জ্যাকেটের পকেটে... আর ছাতাও নেব।
টিটি টিটি
?
টিটি টিটি
জীবটা দেখতে কেমন অদ্ভুত!
কাছ থেকে দেখতেই হবে...অ্যাঁ, চশমা কোথায়? পকেটে রেখেছিলুম...
ওহ্, একটা পাখি।
সুপ্রভাত। কেমন আছ?
ইয়ে...মাফ করবেন, সার। আপনাকে পাখি ভেবেছিলুম!
আপনার বিজ্ঞাপন হবে: "সুন্দর একটি তোতা হারিয়েছে। খোঁজ পেলে লোভনীয় পুরস্কার।"
তোতাটার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার।
এখানে: "হারিয়েছে : সুন্দর তোতা..." দ্যাখো, দুটো বিজ্ঞাপন। আগে প্রথম ঠিকানায় চেষ্টা করব, অন্যটার চেয়ে এটা কাছে।
যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল!
পেটুক কোথাকার!
ক্রিংংং
তোতাটার ব্যাপারে এসেছিলুম। আপনিই কি সেই বিজ্ঞাপন...
হ্যাঁ! ভেতরে আসুন!
দেখে নিই...
হ্যাঁ, এটাই! কী করে ধন্যবাদ দেব জানি না। ও আমার কী, তা জানেন না। দয়া করে পুরস্কারটা নিন।
আচ্ছা, চলি। ধন্যবাদ।
আমিই কৃতজ্ঞ!

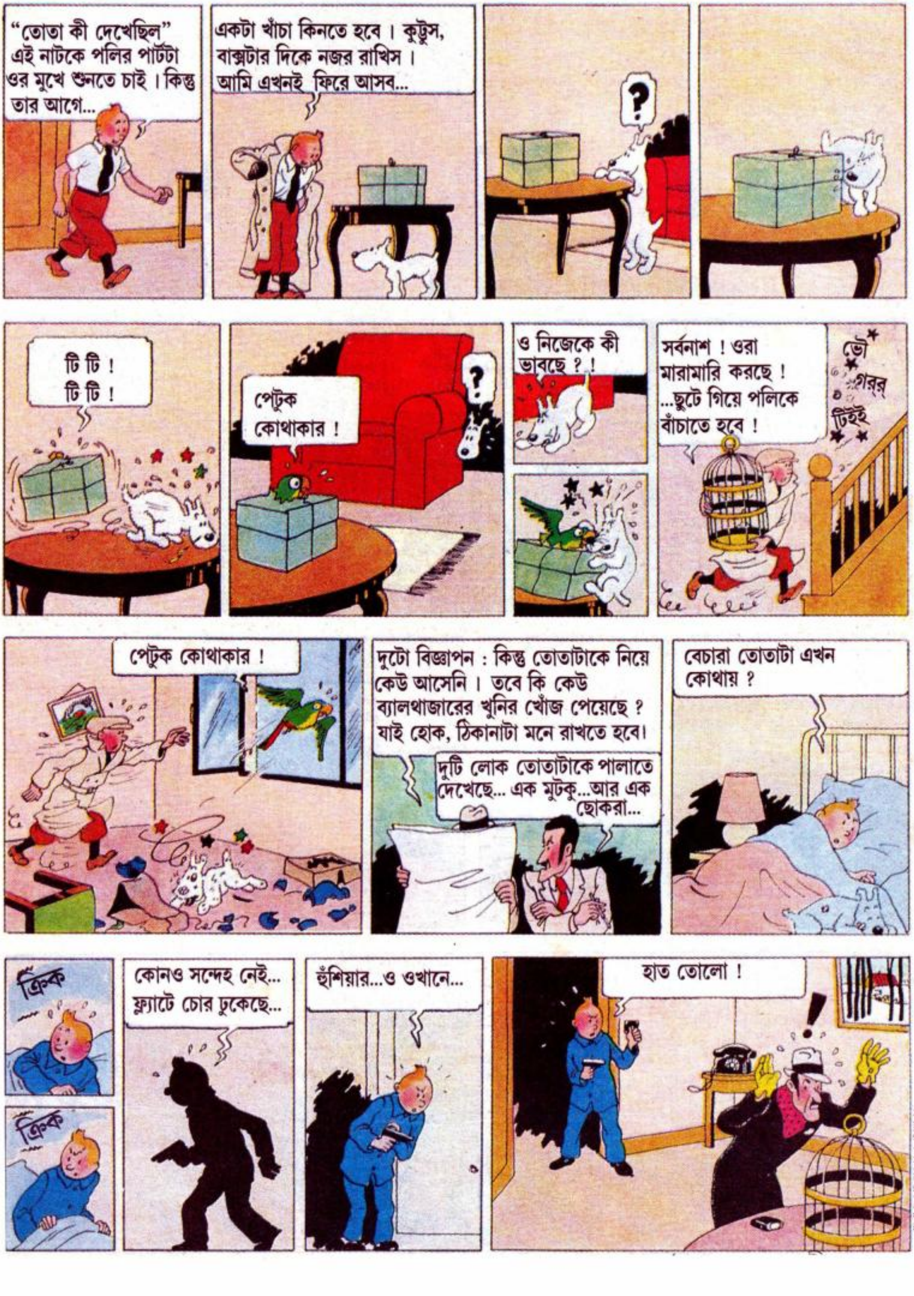
"তোতা কী দেখেছিল" এই নাটকে পলির পার্টটা ওর মুখে শুনতে চাই । কিন্তু তার আগে...
একটা খাঁচা কিনতে হবে । কুট্টুস, বাক্সটার দিকে নজর রাখিস । আমি এখনই ফিরে আসব...
?
টি টি ! টি টি !
পেটুক কোথাকার !
?
ও নিজেকে কী ভাবছে ? !
সর্বনাশ ! ওরা মারামারি করছে ! ...ছুটে গিয়ে পলিকে বাঁচাতে হবে !
ভৌ
গরর্
টিইই
পেটুক কোথাকার !
দুটো বিজ্ঞাপন : কিন্তু তোতাটাকে নিয়ে কেউ আসেনি । তবে কি কেউ ব্যালথাজারের খুনির খোঁজ পেয়েছে ? যাই হোক, ঠিকানাটা মনে রাখতে হবে।
দুটি লোক তোতাটাকে পালাতে দেখেছে... এক মুটকু...আর এক ছোকরা...
বেচারা তোতাটা এখন কোথায় ?
ক্রিক
ক্রিক
কোনও সন্দেহ নেই... ফ্ল্যাটে চোর ঢুকেছে...
হুঁশিয়ার...ও ওখানে...
হাত তোলো !
!

হিমালয়কে দেবতার আসনে বসিয়েছেন শেরপারা

হিমালয় শেরপাদের কাছে নিছক পর্বতশিখর বা বাণিজ্যকেন্দ্র নয়, হিমালয় তাঁদের কাছে 'চোমোলাংমা' বা 'দেবী জগদ্ধাত্রী'। লিখেছেন **সুমন ভট্টাচার্য**

হাতে তালি মেরে গুপি-বাঘার মতো যখন-তখন যদি পাহাড়ে চলে যাওয়া যেত, তা হলে আমরা অনেকেই বোধ হয় সেটাই করতাম। কিন্তু পাহাড়ে যাওয়া এক কথা, আর পাহাড়ে চড়া আর-এক কথা। যারা 'ক্লিক হ্যাঙ্গার' সিনেমাটা দেখেছে, তারা নিশ্চয়ই কিছুটা আন্দাজ করতে পারবে। পাহাড়ে চড়া বা পর্বতারোহণ কতটা বিপজ্জনক কাজ। তার ওপর যদি সেই পাহাড় হয় বরফের গালিচায় আবৃত, আর প্রতিটি বাঁকের আড়ালে থাকে মৃত্যুর বিপজ্জনক ফাঁদ! কিন্তু ঠিক এই কঠিন দায়িত্বটাই ৭০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পালন করে আসছেন যাঁরা, তাঁদেরই নাম শেরপা।

শেরপা বলতেই আমাদের চোখের সামনে বেঁটেখাটো পাহাড়ি মানুষগুলোর যে ছবি ভেসে ওঠে, আমরা সাধারণত তাঁদের সঙ্গে মালবাহক হিসেবেই পরিচিত। সত্যিটা অন্যরকম। শেরপারা একটা অন্য গোষ্ঠীর। শেরপাদের আসল কাজ হল পর্বতারোহণে সাহায্য এবং 'গাইড' হিসেবে কাজ করা। শেরপাদের আসল বাসস্থান ছিল পূর্ব তিব্বতের 'খাম'-এ। তিব্বতি ভাষায় শেরপা শব্দের আদি অর্থ 'পূর্বের মানুষ'। তিব্বত ছেড়ে উত্তর দিকে হিমালয়ের কোলে 'দুধকাশী' নদীর উপত্যকায় চলে আসেন তাঁরা এবং সেই থেকে এই উপত্যকাই হয়ে ওঠে তাঁদের বাসভূমি। ওপরের 'খুম্বু' এলাকায় পশুপালন ও অন্যান্য ব্যবসাবাণিজ্য করতে থাকেন আর নীচের দিকে 'সোলু' অঞ্চলে শুরু করেন গম, ভুট্টা ইত্যাদির চাষবাস। স্বভাবত স্বাধীনতাপ্রিয় শেরপাদের 'রাজ্য' তাই নেপালের অধীনে হলেও, তাঁরা কিন্তু কোনওদিনই মাথা নোয়াননি কোনও রাজশক্তির কাছে। ভাষা থেকে আচার-আচরণ—সবকিছুতেই বেশি ঘনিষ্ঠতা তিব্বতিদের সঙ্গে। এমনকী নেপালে হিন্দু ধর্মের প্রভাব বেশি হলেও ৩৫ হাজার শেরপার অধিকাংশই বৌদ্ধ।

আজ হিমালয় বলতেই শেরপাদের ছবি আমাদের মনে ভেসে উঠলেও গত

এঁরা হিমালয়েরই সন্তান (ওপরে) ; বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ হাতে শেরপা-বালক (পাশে)

শতাব্দীতে ঘটনাটা ছিল অন্যরকম। বরং বলা যেতে পারে, দেবতাদের বাসস্থান হিসেবে কিছুটা শ্রদ্ধার আসনেই হিমালয়কে বসিয়ে রেখেছেন শেরপারা। ফলে সেখানে যাওয়ার চেয়ে প্রণাম জানাতেই তাঁরা ব্যস্ত থাকতেন। ভৌগোলিক দিক থেকে দেখতে গেলে শেরপারা বাস করেন হিমালয় আর লোকালয়ের মাঝামাঝি এমন একটা জায়গায় যে, পাহাড়ে চড়তে গেলে এই অঞ্চলকে অতিক্রম না করে উপায় নেই। ভারতে

ব্রিটিশদের আধিপত্য স্থাপনের পরে ১৮ শতকের গোড়ার দিকে একদল শেরপা নেপালের পুব দিক দিয়ে চলে আসেন আমাদের ঘরের কাছে দার্জিলিং-এ। সেনাবাহিনী ছাড়াও অন্যান্য কাজের প্রয়োজনে তাঁরা দার্জিলিংকে বাসস্থান হিসেবে বেছে নেন। কিন্তু শেরপাদের জীবনে মূল পরিবর্তন আসে আজ থেকে মাত্র ৭৩ বছর আগে। সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞতা থেকে ইংরেজরা ততদিনে জেনে গেছেন, বিশ্বাস এবং পরিশ্রমের পরীক্ষায় এঁদের জুড়ি মেলা ভার। তাই ১৯২০ সালে প্রথম হিমালয় অভিযানের সময় এই পার্বত্য গোষ্ঠীরই সাহায্য নেওয়া হয়। গোড়াপত্তন সেদিনই হয়ে গেছে সেই পথের, শেরপাদের ঘর থেকে শুরু হয়ে যা সরাসরি হিমালয়ে শেষ হয়েছে। আর তেনজিং নোরগে, নওয়াং গোম্বু কিংবা আং রিটার নামও অপরিচিত থাকেনি দেশে-বিদেশে, অনায়াস দক্ষতায় পর্বতচূড়ায় নিজেদের পদচিহ্ন রেখে আসার কৃতিত্বে।

হিমালয় অভিযানের সূচনা হয়েছিল তিব্বতের দিক থেকে, এখন সরাসরি খুম্বু থেকেই এভারেস্ট অভিযানের বিপজ্জনক ঝুঁকি নেওয়া হয়। এভারেস্টের ওপরে 'কিছু কাণ্ডকারখানা' করে আসার জন্য প্রতি বছর কমপক্ষে দু' ডজন অভিযাত্রী এবং কয়েক হাজার ভ্রমণার্থী হিমশীতল বরফের সমুদ্রে তল্পিতল্পা নিয়ে হাজির হন। মরুভূমিতে উট যেমন, বরফের রাজ্যেও শেরপারাই তেমনই একমাত্র অবলম্বন। আকাশপথে পৌঁছতে হলে খুম্বুর সবচেয়ে কাছাকাছি হল লুকলা। এখন সেখানে চোখ মেললেই অসংখ্য টুরিস্ট অফিস আর তিব্বতি জিনিসপত্রের দোকান। ১০০টার মধ্যে ২১টারই মালিক শেরপারা। নেপালের অন্যান্য লোকজনের সারা বছরে রোজগার যদি হয় বছরে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা, তবে একজন শেরপাকে তুলনায় ধনকুবের বলা যেতে পারে। কারণ বছরের শেষে তাঁদের পকেটে থাকে ৪০ হাজার টাকার কাছাকাছি। এটা তো জোপকিও (গোরুর এবং ইয়াকের সংমিশ্রণে উদ্ভূত বিশেষ মালবাহক জীব) ভাড়া দিয়ে, তাঁবুর দেখাশোনা বা রান্নার কাজ করেই সাধারণ শেরপারা রোজগার করেন। সোনম দেন্দু, নিমা তাশি, গিয়াল জেন বা আং রিটার মতো নামী শেরপারা যাঁরা শিখরে একাধিকবার আরোহণ করেছেন, তাঁরা মাত্র তিন মাসের পরিশ্রমেই বাড়িতে আনেন ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা। তাই আজকাল আর ইয়াকের

পাহাড়ে চড়ার আগে এ এক ট্রেনিং

চামড়ার জুতো নয়, শেরপাদের পায়ে হালফিলের অ্যাডিডাসের স্নিকার। রাই তামাং উপজাতিদের মধ্যে থেকে তাঁরাই মালবাহক ভাড়া করেন দৈনিক ১০০ টাকার বিনিময়ে। এই মালবাহকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ভারী অদ্ভুত, তাঁদের লক্ষ্য শেরপা শ্রেণীভুক্ত হওয়া।

হিমালয় যেমন শেরপাদের দিয়েছে অনেক, তেমনই নিয়েছেও বিস্তর। হিমালয়ের গহ্বরে চিরকালের জন্য বিলীন হয়ে গেছে যে ১১৫টি মানুষের আকাঙ্ক্ষা, তার মধ্যে ৪৩ জনই এই ছোট্ট পাহাড়ি গোষ্ঠীর। তাঁদের স্মৃতিতে খুম্বু হিমবাহের তলায় 'ছুড়ং'-এতে একটা করে পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ আছে। যেখানে খোদিত আছে তাদের নাম। আর খুম্বুতে আছে অসংখ্য পঙ্গু শেরপা, হিমালয়ের স্মৃতি বুকে নিয়ে। আধুনিকতার পথ ধরে শেরপাদের মধ্যে এসেছে শিক্ষা এবং নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষায় সচেতনতা। বিদেশি পর্যটকদের বন-জঙ্গল কেটে 'ক্যাম্প ফায়ার'-এর বিরুদ্ধে তাঁরা যেমন সরব, তেমনই সচেষ্ট পাহাড়ের নির্জনতা রক্ষায়। এমনকী নিজেদের বাড়ি তৈরি আর জঙ্গলের গাছের ব্যবহার শেরপারা করছেন না। আবার তাঁরা নতুন উদ্যমে ফিরিয়ে আনছেন ৪৫০ বছরের পুরনো উৎসব 'ডুমজে'। রংবেরঙের মুখোশ আর ময়ূরের পালকে নিজেদের সাজিয়ে পাঁচদিন ধরে চলে নাচগান। সাধারণত প্রতি বছরই নির্দিষ্ট একজন উৎসবের ব্যয়ভার বহন করেন। তবে রডোডেনড্রন-এ ঢাকা 'তেঙ্গবোচে' মঠের গৌরব অনেকটাই ম্লান হয়ে এসেছে সময়ের স্রোতে। এখনও অবশ্য হিমালয়ে পা রাখবার আগে শেরপা এবং বিদেশি অভিযাত্রীরা একবার এই বৌদ্ধ মঠের প্রধান ভিক্ষুর আশীর্বাদের জন্য তাঁর কাছে হাজির হন। কিন্তু ভিক্ষু হওয়ার চেয়ে খুম্বুতে কিংবা তার কাছের বাজার নামচে অঞ্চলে টুরিস্ট লজ খোলা শেরপাদের কাছে অনেক পছন্দের। নিজেরা ডালভাত কিংবা 'চাং' নামের একটি পানীয়ে সন্তুষ্ট থাকলেও বিদেশিদের জন্য কিন্তু ইতালির 'পিৎজা' বা ফরাসি খাবার অনায়াসে মেলে। আর মেলে মাখন, নুন দিয়ে তৈরি তিব্বতি চা। এডমণ্ড হিলারির উৎসাহে 'খুমজুঙ্গ' গ্রামে শেরপাদের জন্য স্কুল খোলা হয়েছিল সেই ১৯৬১ সালে। তারপরেও হিলারির সাহায্যে গড়ে উঠেছে আরও ২৫টা স্কুল এবং হিমালয়ান ট্রাস্ট। এই হিমালয়ান ট্রাস্টই শেরপাদের ছেলেমেয়েদের কাঠমন্ডুর কলেজে কিংবা ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায় পড়াশোনার জন্য। স্টেথোস্কোপ হাতে চিকিৎসা, রয়েল নেপাল এয়ারলাইন্স-এ ককপিট সামলানো বা বিচারকের সামনে সওয়াল করা তো অনেক সহজ কথা। আজকাল শেরপারা নেপালের সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করছেন।

লেখাপড়ায় আগ্রহ শেরপাদের মূলত এসেছে বিদেশি পর্যটকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে। অনেক শেরপা 'তারাপদ' তাই স্কুল পালিয়েও পর্বত অভিযানের দলে ভিড়ে যান। কারণ ইংরেজি জানলে সহজেই রান্নাঘরের ঘেরাটোপ পেরিয়ে শেরপাদের সর্দার হওয়া যায়। সর্দারের দায়িত্বেই থাকে বিদেশিদের সঙ্গে চুক্তি থেকে শুরু করে পুরো অভিযানের খরচ ঠিক করা। এমনকী কোন পথে যাওয়া হবে, সেটাও নির্বাচন করা। ১৯৯১ সালে শুধুমাত্র শেরপারাই একটি অভিযান চালিয়েছিলেন এভারেস্ট জয়ের। 'লোপসাং' নামে একজন শেরপার উৎসাহে প্রথমে এই অভিযানের সূচনা হলেও, পরে নিমা তাশি, সোনম দেন্দু-র মতো নামী পর্বতারোহীরা যোগ দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র তাঁদের কৃতিত্বে এভারেস্ট জয়ের এক আলাদা স্বাদ ছিল শেরপাদের কাছে, কারণ এভারেস্ট শুধু তো তাঁদের কাছে একটা পর্বত শিখর কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র নয়। তাঁদের কাছে তাঁদের ভাষায় 'চোমোলাংমা', যার অর্থ দেবী জগদ্ধাত্রী এবং সেই দেবীকেই তাঁরা আজও রক্ষা করে চলেছেন পরম যত্নে, আবিষ্কার করে চলেছেন পরম আদরে।

ক্যাম্পাস

পূর্বভারত বিজ্ঞানমেলায় চমক দেখিয়েছে কিশোর বিজ্ঞানীরা

কাউন্টারের পাশ থেকে বেরিয়ে লেজার অ্যাসিস্ট্যান্টের টেবিল ঘুরে বড়বাবুর দিকে এঁকেবেঁকে সাপের মতো চলেছে কী ওটা ? ভালভাবে দেখলে বোঝা যায়, ওটা একটা 'কনভেয়ার বেল্ট' । এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে, এক ঘর থেকে অন্য ঘরে, এটি বয়ে নিয়ে চলেছে নানা লেজার, ফাইল বা অন্যান্য খাতাপত্র । ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের লাইনে দাঁড়িয়ে পা ব্যথার অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে । তাঁদের অসুবিধে দূর করতে বাঁকুড়ার সেন্ট্রাল গার্লস হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী অরুণিমা দত্ত এই 'কুইক সার্ভিস ব্যাঙ্ক'-এর মডেলটি তৈরি করেছে । এবারের পূর্ব ভারত বিজ্ঞানমেলায় অনেকেরই নজর কেড়েছিল অরুণিমার ওই মডেল ।

প্রতিবারের মতো এবারেও ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালায় (বি.আই.টি.এম.) অনুষ্ঠিত হল উনিশতম পূর্ব ভারত বিজ্ঞানমেলা । ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বি.আই.টি.এম. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগ ও ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়াম ।

কিশোর বিজ্ঞানীরা নতুন প্রযুক্তির মডেলের সঙ্গে তৈরি করেছে কৃষি, বিকল্প শক্তি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবেশদূষণ প্রতিরোধ ইত্যাদির ওপর বিভিন্ন মডেল । তবে এবারের বিজ্ঞানমেলায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল গ্রামের উন্নতিতে বিজ্ঞানের ব্যবহার ও বিকল্প শক্তির ওপর । বি.আই.টি.এমের পক্ষে প্রশান্ত পালিত জানালেন, ছ'দিনের এই মেলায় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ১৫৫টি স্কুল থেকে প্রায় ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী ১৭০টি মডেল নিয়ে হাজির হয়েছিল । খুদে বিজ্ঞানীরা নিজেদের মডেল দেখানো ছাড়াও অন্য রাজ্যের বন্ধুদের সঙ্গে অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান করে । পূর্ব ভারত বিজ্ঞানমেলার এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য ।

এবারের বিজ্ঞানমেলার অন্যতম স্লোগান ছিল অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার । এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সিকিমের থাংশেন সেকেন্ডারি হাই স্কুলের ছাত্ররা তৈরি করেছে উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে বিদ্যুৎ তৈরির যন্ত্র । এত কম খরচে জিও থার্মাল এনার্জির ব্যবহারের কথা এদেশের নামী বিজ্ঞানীরা হয়তো এবারে ভেবে দেখবেন ।

গোবর গ্যাস, বায়ো গ্যাস শব্দগুলি আজ আর বোধ হয় কারও কাছেই অপরিচিত নয় । কিন্তু মণিপুরের ছাত্রছাত্রীরা গোবর থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ তৈরি করে বাল্ব জ্বালিয়েছে । দেখিয়েছে, তাও অসম্ভব নয় । এই পদ্ধতিতে গোবরের সঙ্গে ব্যবহার করা যাবে সবজির খোসা এবং অন্য আবর্জনাও। দেখা গেছে এই আবর্জনার পচন প্রক্রিয়ায় কিছুটা সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি হয় ।

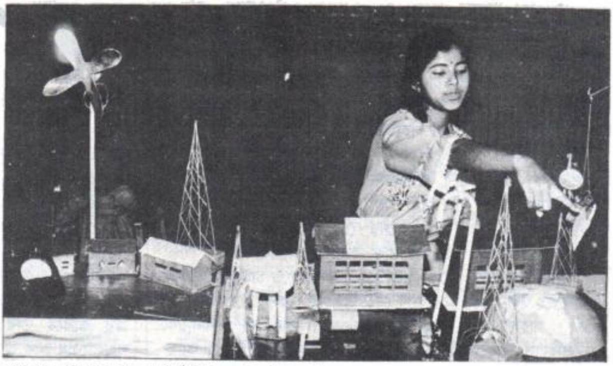

পূর্ব ভারত বিজ্ঞানমেলা জমে উঠেছিল নতুন-নতুন মডেলে

এর মধ্যে অল্প জল দিয়ে দস্তার রড ও তামার পাত তড়িৎদ্বার হিসেবে ব্যবহার করে তৈরি হয় অভিনব ব্যাটারি । গোবর বা আনাজের খোসার পরিমাণের ওপর নির্ভর করে জ্বালানো যাবে রান্নাঘর, বাথরুম ও আরও দু-একটি আলো ।

আবার একই সঙ্গে গ্রামের বিকাশে বিকল্প শক্তির কথা ভাবা হয়েছে নাগাল্যান্ডের বায়াভু হিল হাই স্কুলের ছাত্র হেমরাজ শর্মার গ্রামীণ'রাইস মিল'মডেলে । হস্তচালিত এই রাইস মিলে পেট্রল, ডিজেল কিছুই লাগে না । কাঠ, রবার, বল বেয়ারিং দিয়ে তৈরি ১০০ টাকা দামের এই রাইস মিলে দৈনিক ১৫০ কেজি পর্যন্ত ধান ভাঙানো যাবে ।

আমরা প্রায়ই দেখতে পাই, অনেক বেলা পর্যন্ত রাস্তার আলো জ্বলছে । বিদ্যুতের এই অপচয় অনেকের মনেই দাগ কাটে । শিলং-এর লাবন বেঙ্গলি বয়েজ হাই স্কুলের ছাত্ররা এই অপচয় রুখতে তৈরি করেছে রাস্তার আলো নেভানোর এক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা । এতে সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তার আলো নিভে যাবে ।

ঝরনার জল, সূর্যের আলো, গোবর ইত্যাদি অনেক কিছু থেকেই বিদ্যুৎ তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে, কিন্তু ধোঁয়া থেকে বিদ্যুৎ তৈরির পরিকল্পনা করেছে লিলুয়া ডন বসকো হাই স্কুলের ছাত্ররা ।

এরকমই আরও অভিনব এবং মজার মডেল হল চন্দননগরের অরবিন্দ দাসের সোলার প্যানেল মুভার, ক্রিয়েটিভ এবিলিটি সেন্টারের এয়ার পলিউশন কন্ট্রোল, ওড়িশার সরফরাজ আহমেদের ওয়াটার কার, কিশোর বিজ্ঞানচক্রের মাটি ছাড়া চাষবাস ইত্যাদির মডেল ।

পূর্ব ভারত বিজ্ঞানমেলার সঙ্গে একই মাঠে অনুষ্ঠিত হল রাজ্য বিজ্ঞানমেলা । এতে ৫২টি স্কুল ও ১৭টি বিজ্ঞান ক্লাবের ৭২ জন ছাত্রছাত্রী ৮৩টি মডেল নিয়ে অংশ নিয়েছিল ।

মেলার শেষদিনে অংশগ্রহণকারী খুদে বিজ্ঞানীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র দেওয়া হয় ।

সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোটো : বি. আই. টি. এমের সৌজন্যে

ইতিহাসে প্রথম

চুনীলাল রায়

"ঘটনাটা ঘটবার আগেই জানাজানি হয়ে গেল। সভায় বসেছিলেন ডেনটাটুস। সভাসদরা তাঁকে ঘিরে বসে ছিল। সাধারণ সভা। যেমন বসে প্রতিদিন। তাঁর এলাকার মানুষের ভালমন্দর খোঁজখবর নেওয়া, আইনের শাসন কেমন চলেছে সে বিষয়ে মতামত জানা, এসবই অবশ্য জরুরি। কেননা এ যে মহামান্য সিজারের আদেশ। তাঁকে সুনিশ্চিত করতে হবে এক মহান আদর্শ। যা দেখে যুগযুগান্তের লোক বলবে রোমান সাম্রাজ্য হচ্ছে সেই বিশিষ্ট চরিত্র যার পা দুটি লোহার তৈরি অথচ যার পদযুগল তৈরি হয়েছে লোহা আর কাদা মিশিয়ে। যেখানে লোহা বোঝাবে আইনের প্রতি রোমানদের শ্রদ্ধা, তার সংগঠনী শক্তি, লেগে থাকার ক্ষমতা আর সর্বোপরি জানাবে রোমের প্রতি অচলাভক্তি। জানাবে রোমানরা সর্বস্ব, এমনকী জীবনও রোমের জন্য বিসর্জন দিতে পারে। কাদা জানিয়ে দেবে রোমের প্রাচুর্য আর ভোগসুখের উপকরণের কথা।

"সবই ঠিকঠাক চলেছিল। কিন্তু আজ এখন ডেনটাটুস একটু চিন্তিত। এই মুহূর্তে তাঁর গোপন দূত ক্লডিয়াস এসে তাঁকে যে-খবর দিলেন তাতে চিন্তিত হওয়ার সঙ্গত কারণ রয়েছে! কেননা ক্লডিয়াস কেবল যে তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা তাই-ই নন, তিনি জনসাধারণেরও খুব কাছের মানুষ। তিনি সহজেই তাদের সঙ্গে মিশে যান, আর নানারকম খবরও জোগাড় করে আনেন। তাই ক্লডিয়াস যখন তাঁকে মন্ত্রণাকক্ষে নিয়ে গিয়ে জানালেন এক ষড়যন্ত্রের খবর, তখন ডেনটাটুসের প্রশান্ত মুখে হাসি মিলিয়ে গেল। তাঁর চোখে-মুখে কে যেন কালি ছিটিয়ে দিল। মুখের চেহারা কঠিন হয়ে উঠল। ক্লডিয়াসকে আরও খবর জোগাড় করতে বললেন তিনি।

"ডেনটাটুস ফিরে এলেন সভাগৃহে। সহজ হতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর দেহে তখন যেন আর প্রাণ নেই, এতটাই অবসন্ন হয়ে পড়েছেন তিনি। সাহস করে কাছে এগিয়ে এলেন তাঁর দুই প্রিয়নায়ক ভেলেরিয়াস আর ক্যাটিলিনা। অভিবাদন করে ডেনটাটুসের কাছে গিয়ে নিচু স্বরে বললেন, 'এভাবে শাসনকর্তার ভেঙে পড়া সাজে না। রোমের সাধারণ লোক কী মনে করবে? স্থানীয় অধিবাসীরাই বা কী বলবে? আপনি উঠুন, জাগুন। কিছু বলুন তাদের।'

"ডেনটাটুস তাকালেন ওঁদের দিকে। মৃদু হাসলেন। যেন ভরসা পেলেন ওদের কথায়। তাঁর চোখে-মুখে জীবনের চিহ্ন আবার যেন ফিরে এল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন সভাগৃহের বাইরে। ওখানে সাধারণ নাগরিকরা তখন একটু একটু করে ভিড় করছে। কেননা তাদের কাছেও তখন খবর পৌঁছে গেছে যে, ক্লডিয়াস এমন এক খবর মহান শাসক ডেনটাটুসের কাছে দিয়েছেন যা নাকি তাঁকেও বিহ্বল ও বেদনাহত করেছে। রোমের ইতিহাসে এ-ঘটনা প্রথম। মহান সিজারের কাছে এ-খবর পৌঁছলে তিনি ডেনটাটুসের কৈফিয়তই শুধু তলব করবেন না, তাঁকে শাসনকর্তার পদ থেকে সরিয়েও দিতে পারেন।

"ডেনটাটুসের মাথায় এসব চিন্তা আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। খুব তাড়াতাড়ি সহজ ও স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। তারপর ধীরস্থির পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে। এমনভাবে দাঁড়ালেন যাতে জনগণ তাঁকে ভালভাবে দেখতে পায়। জনগণ জয়ধ্বনি দিল, 'মহান রোমের জয় হোক। মহান সিজার দীর্ঘজীবী হোন। ডেনটাটুস বেঁচে থাকুন।'

"এই অভিনন্দন গ্রহণ করলেন ডেনটাটুস। এবার হাত তুলে তাদের শান্ত হতে বললেন। সমুদ্রের জলকল্লোল যেন চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই নীরব নিথর হয়ে গেল। ডেনটাটুস এবার তাঁর বক্তব্য রাখা শুরু করলেন, 'আমার প্রিয় দেশবাসী, আপনারা জানেন আজ আমাদের প্রিয় রোম মহান সিজারের অধীনে সারা পৃথিবী যে জয় করেছে তার একমাত্র কারণ হল আপনারা। আপনাদের শৃঙ্খলাবোধ আর আত্মোৎসর্গ আজ রোমান পদ্ধতিকে সব সেরা করে তুলেছে। আজ একজন রোমানেরও তার ব্যক্তিগত ভাবনা বলে কিছু নেই। রোমান সাম্রাজ্য—এই কথার মধ্যেই ওসব মিশে গিয়েছে।'

"কথা শেষ করেননি ডেনটাটুস। জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল, 'মহান রোম সাম্রাজ্য দীর্ঘজীবী হোক।'

"এবার ডেনটাটুস চেষ্টা করলেন জনতার আবেগ ও উল্লাসের গভীরতা পরিমাপ করতে। তাদের দু-চারটে টুকরো-টুকরো কথা তাঁর কানেও ভেসে আসছে। জনগণের এই আবেগ তাঁকে কাজে লাগাতে হবে। ভাবলেন তিনি। কিন্তু মহান সিজারের আগাম অনুমতি ছাড়া তিনি এ-কাজ কী করে করবেন?

"ডেনটাটুসের চোখে-মুখে আবারও চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। তিনি পিছন ফিরে দেখবার চেষ্টা করলেন। দেখলেন, কেবল ভেলেরিয়াস বা ক্যাটিলিনা নয়, ক্যামিল্যুস আর মিসিপসা-র মতো দুজন ক্ষমতাবান সভাসদও তাঁর কথা শুনে হাততালি দিয়ে তাঁকে সমর্থন করছেন, উৎসাহিত করছেন। এবার আর অন্য কিছু ভাবলেন না ডেনটাটুস। তিনি গভীর আবেগে বলে চললেন, 'আপনারা জানেন, সঙ্ঘশক্তিই হল রোমের মূলশক্তি। স্মরণ করুন লাতিন যুদ্ধের সেই ঘটনা। মহান কনসাল ম্যানলিয়াস টরকুয়াটাস আদেশ করলেন এই

লড়াইয়ে কেউ একা-একা যুদ্ধ করবেন না। তাতে বিপদ আছে। কিন্তু তাঁরই ছেলে নিজে বাহবা নেবার জন্য আর আগের যুদ্ধে বাবার অর্জিত গৌরবের সমান হওয়ার চেষ্টায় একা-একাই লড়াই শুরু করল। সেই লড়াইতে সে জিতে গেল ঠিকই কিন্তু আদেশ অমান্য করার জন্য তার হল প্রাণদণ্ড! এই হল রোমের জীবন, রোমান আদর্শ!'

"ডেনটাটুসের কথা শুনে জনসাধারণ আবার হর্ষধ্বনি করে উঠল। ডেনটাটুস কিন্তু থামলেন না। তিনি বলে চললেন, 'লাতিন শহর পেডাম টাসকুলাম বা অন্যদেরও আমরা সমানভাবে রোমান অধিকার দেবার চেষ্টা করেছি। অবশ্য এখনও তাদের ভোটাধিকার বা সরকারি কাজ দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু নাগরিক অধিকার তো তাঁরা পাচ্ছেন। আমরা আথেন্সের মতো খারাপ কাজ করি না। আমরা যাদের যুদ্ধে হারাই সেই সব লোকের কাছ থেকে আমরা কোনও কর বা রাজস্ব আদায় করি না। আপনারা জানেন যে মহান রোমের আদর্শ এসব দিক থেকে কত উঁচু, কত ন্যায়নিষ্ঠ!'

"বলতে বলতে থেমে যান ডেনটাটুস। জনতা চঞ্চল হয়ে ওঠে। তারা কোলাহল করে ওঠে। ডেনটাটুস থামলেন কেন? ডেনটাটুস বুঝলেন এই হচ্ছে সঠিক সময়। এখনই জনগণকে জানাতে হবে সব কথা। তাই তিনি আবার শুরু করলেন তাঁর কথা, 'প্রিয় জনগণ, আপনারা শুনে দুঃখ পাবেন। কিন্তু কী করব আমি? আপনাদের জানাতেই হবে। কেননা আজই খবর পেয়েছি যে মহান রোমের এইসব কাজে কেউ কেউ বাধা সৃষ্টি করতে চাইছে। পরশু আমাদের এক উৎসবের দিন। আপনারা জানেন। সেদিন সকালেই আমি আপনাদের কাছে কিছু ঘোষণা করতে পারব আশা করছি। এর মধ্যে মহান সিজারের অনুমোদন পেয়ে যাব। আপনারা ধৈর্য ধরুন।'

"ডেনটাটুস কথা শেষ করলেন। সভাসদদের দিকে তাকালেন। দেখলেন তাঁরা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাচ্ছেন। ওদিকে জনসাধারণ নিচু স্বরে কথা বলতে-বলতে নিজের নিজের কাজে ফিরে যাচ্ছে। তাদের মন হালকা হয়ে গিয়েছে তখন। তারা যেন বুঝেছে চিন্তার কিছু নেই। ক্লডিয়াস বাজে খবর এনে শান্তি নষ্ট করেছেন।

"জনসাধারণ ধীরে-ধীরে বিদায় নিয়েছে তখন। তাদের চলার পথের দিকে তাকিয়েছিলেন ডেনটাটুস। কী সরল এরা, ভাবলেন তিনি। কিন্তু ডেনটাটুস জানতেন তাঁর সভাসদরা তাকে এত সহজে ছাড়বেন না। ক্লডিয়াসের খবর জানিয়ে তাদের মতামত তো নিতেই হবে।

"তাই মন্ত্রণাকক্ষেই এবার এসে বসলেন ডেনটাটুস। সঙ্গে পারিষদরা। বাইরে কড়া পাহারায় আছে সান্ত্রিরা।

"অথচ ডেনটাটুস যে কীভাবে সহকর্মীদের বিষয়টা বোঝালেন তা তিনি প্রথমে বুঝে উঠতেই পারছিলেন না। কেননা জিনিসটা তাঁর কাছে নতুন।

"ডেনটাটুসের কথা শুনে ভেলেরিয়াস, ক্যামিল্যুস, মিসিপসা আর ক্যাটিলিনা তো থ'। তাঁরাও যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

"আসলে ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। ডায়না-র মন্দিরে কাজ করে যেসব ক্রীতদাস তাদের মধ্যে শুধু যে হাবসি বা মিশরীয় আছে তাই নয়, রয়েছে শ্বেতাঙ্গরাও। দু' দলের মারপিট, ঝগড়া, চোরাগোপ্তা আক্রমণ মাঝে-মধ্যেই লেগে রয়েছে। মরেও কেউ-কেউ। মজা এই, এরা নাকি এবার হাত মিলিয়েছে— তাদেরও মানুষের মতো বাঁচতে দিতে হবে। ভোটের অধিকার দিতে হবে। মহান রোমান শাসনে এসেছে যে সমস্ত জনপদ, যাদের জনগণের ভোটাধিকার নেই, আর মহান রোমান সাম্রাজ্যের যারা কর্মী হতে পারবে না, সেইসব লোকদেরও কেউ-কেউ হাত মিলিয়েছে ওদের সঙ্গে। ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে এখান থেকেই। শুরু করেছে এরাই। তাদের উদ্দেশ্য ডায়নার আগামী পূজা-উৎসবের দিন দেশের সমস্ত ক্রীতদাস কাজ বন্ধ করে দেবে। রাস্তাঘাট সারানো, বাঁধ-তৈরি, মন্দির নির্মাণ, পাহারা দেওয়া ইত্যাদি কাজে তারা সেদিন হাজির থাকবে না ইচ্ছে করেই। দেখুক রোমানরা তারা যাদের ঘেন্না করে এসেছে, হীন ভেবেছে, মানুষ বলে গণ্য করতে চায়নি, আজ তাদের সাহায্য ছাড়া মহান রোমান সাম্রাজ্যের এক পা চলবার ক্ষমতা নেই।

"কিন্তু ডেনটাটুসের কথা শেষ হবার আগেই লাফ দিয়ে উঠল মিসিপসা। কোষবদ্ধ তরোয়ালে হাত রেখে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'কই তারা? কার এত সাহস, এত বড় স্পর্ধা যে মহান রোমান সাম্রাজ্যের এতটুকু ক্ষতি করে?'

"ক্যামিল্যুস আর ক্যাটিলিনা একটু ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। তাঁরা মিসিপসা-কে শান্ত করবার চেষ্টা করেন। দু' জনেই বলেন, 'এভাবে সমস্যার সমাধান হয় না। হতে পারে না। আমাদের অন্য কোনও সহজ উপায় ভাবতে হবে। যাতে জনগণ এসব কথা জানতে না পারে অথচ কাজও হাসিল হয় অর্থাৎ সাপও মরবে কিন্তু লাঠিও ভাঙবে না।'

"এতক্ষণ ভেলেরিয়াস কোনও কথা বলেননি। তিনি এবার বলেন, 'আচ্ছা, ওদের সবাইকে আচমকা বন্দি করে হত্যা করলে কেমন হয়? বলা যাবে ওরা নিজেরাই মারামারি করে মরেছে। এরকম তো হয়েই থাকে। ফলে কেউ কোনওরকম সন্দেহই করতে পারবে না।'

"ভেলেরিয়াসের এই প্রস্তাব কিন্তু কারও সমর্থন পেল না। ডেনটাটুস হাত নাড়েন, 'না না, এতে হবে না। আপনারা অন্য কোনও পথের সন্ধান দিন। যেমন ধরুন আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। আমি ভাবছি যে, দু' দিনের পরের সেই উৎসবের দিন

আমরা মহান সিজার ও সেনেটের অনুমোদন নিয়ে এখানকার অধিবাসীদের জানিয়ে দেব উৎসবের দিন কাউকে কোনও কাজ্ করতে হবে না। রোমান সাম্রাজ্যের নামে যে কাজ করা হয় তা সব বন্ধ থাকবে। তবে কেমন হয়? আমরা উৎসবের দিন সবাই কাজে বের হওয়ার আগেই এ-কথা ঘোষণা করে দেব। ক্রীতদাসরা কাজ বন্ধ করতে চেয়েছে তা আমরাও আগে থেকেই কাজ বন্ধ করার ছুটি ঘোষণা করে দিলাম। উৎসব। সবাই উৎসবে মনপ্রাণ ঢেলে যোগ দাও। আজ কোনও কাজ নয়। কেউ সন্দেহ করবে না।'

"ডেনটাটুসের এই বক্তব্য মনে ধরল সবার। তারা এ-নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনাও করলেন। পরে জানালেন, এতে তাদের সম্মতি রয়েছে। প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিয়ে আসবে মিসিপসা।

"ব্যস, ডেনটাটুসের এই এক চালেই কিস্তিমাত। ক্রীতদাসরা সব কাজ বন্ধ করে দেবার জন্যে বহুদিন থেকে যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল তা এক মুহূর্তেই ব্যর্থ হয়ে গেল।

"বুঝলে তোমরা, এভাবে একটা ঘটনা ঘটতে ঘটতেও ঘটল না। ঘটলে তা হত ইতিহাসের প্রথম ধর্মঘট।"

বদ্যিবাটির বিজয় ব্যানার্জি গল্প বলছিলেন। শীতের দিন। তাঁরই বাড়িতে হল পিকনিক। অফিসের ক'জন বন্ধুবান্ধব, তাঁদের পরিবার ও ছেলেমেয়েরা। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ছাদের ওপর মাদুর বিছিয়ে গল্প শুনতে কার না ভাল লাগে? তাই প্রায় সবাই হাজির ছাদে। শ্যামনগরের ইন্দ্রনাথ চাটার্জির ছেলে টুবলু আর শাক্য, শ্রীরামপুরের রঞ্জিতদের ছেলে সুজিব, বদ্যিবাটির প্রভাস বোসের মেয়ে সোনামণি, বারাসতের অনিন্দ্য মৈত্রর ছেলে বাবুসোনা, মানকুণ্ডুর দেবদাস ব্যানার্জির মেয়ে রাখী বা চন্দননগরের কিশোর মিত্তিরের মেয়ে পৌলমী গল্প শুনতে শুনতে একবারও উঠে যায়নি।

তাই বিজয়কাকু গল্প শেষ করতে চাইলেও আর শেষ করতে পারছিলেন না। ওরা আপত্তি করল, "কাকু আর একটা, আর একটা।"

বিজয়কাকু হতাশ হয়ে বসে পড়লেন এবার। ভেবেছিলেন অনেক তো বকবক করলাম, এবার বোধহয় রেহাই পাব। কিন্তু যত সহজে রোমের এক বিরাট সমস্যার সমাধান করেছিলেন তত সহজে সমস্যার সমাধান আর করে উঠতে পারলেন না। শেষে মেয়েকে ডেকে বললেন, "যাও তো মুনিয়া, মা-কে বলো, ওপরে একটু চা জলখাবার পাঠিয়ে দিতে। গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে।"

কিন্তু মুনিয়াকে আর বলতে যেতে হল না। দেখা গেল, বোসকাকিমা আর ব্যানার্জিআন্টি ধরাধরি করে সবার জন্যে চা জলখাবার নিয়ে আসছেন।

এদিকে খাওয়াদাওয়া শেষ হবার আগেই বিজয়কাকু তাঁর নতুন কাহিনী শুরু করলেন।

"সবাই আবার প্রায় ছুটে এসে নিজের নিজের জায়গা দখল করে নিল। গুছিয়ে বসার চেষ্টা করল। বাবুসোনা অনুযোগ করল, 'কাকু তুমি তো আমাদের একটু দম ফেলারও অবসর দিলে না।' কথা শুনে কাকু হাসলেন। বললেন, 'দম ফেলে জিরোবার অবসর দিলে ওদিকে আমার দাম কমে দম যে ফুরিয়ে যাবে। গল্প বলার উৎসাহই আর থাকবে না। ও-কথা থাক। এখন শোনো অন্য কাহিনী। এর সব কি আর বইয়ে লেখা আছে নাকি? সারদের কাছ থেকে অনেক সাধ্যসাধনা করে জানতে হয়েছে এসব। তাঁরা জেনেছেন তাঁদের সারদের কাছ থেকে। এইরকমই চলেছে আর কি! কত দিনের

RADEUS/SB/837/2-93-BEN

মশা ?

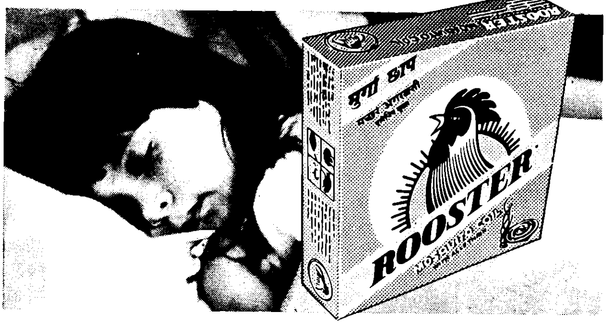

আপনার রাতের সুনিদ্রা নিশ্চিত করতে আনুন

রুস্টার

অ্যালেথ্রিন যুক্ত মশার ধূপ

উৎপাদক :
সান-আপ বোটানিক্স প্রা : লি :
৭৮৮/১, জি.আই.ডি.সি., ভাপি, গুজরাট

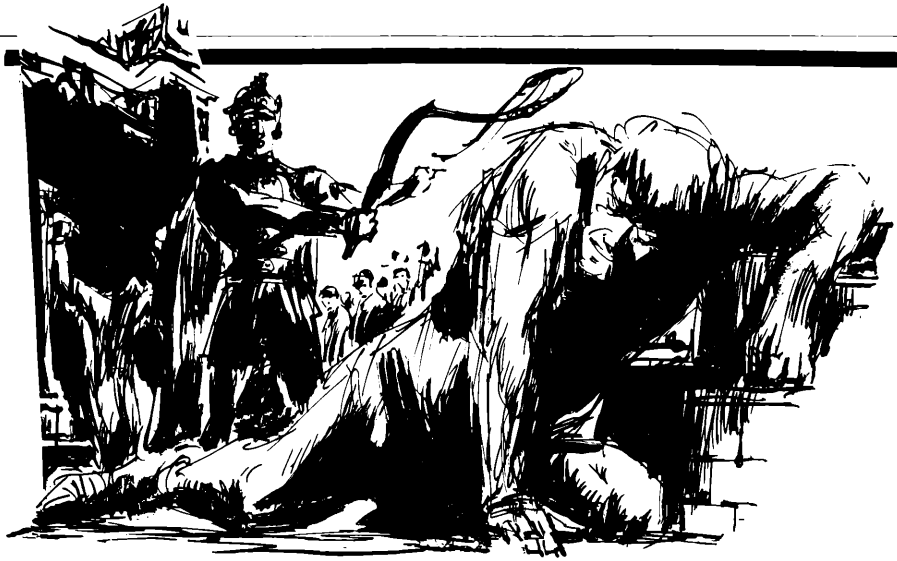

কথা। আর যে কালের কথা বলছি তার সময়টা একটু-আধটু উনিশ-বিশ হতেও পারে। তাই না?'"

কিন্তু বিজয়কাকুর এসব কথা ওরা কি শুনতে চায় না বুঝতে চায়? একটা কিছু নতুন গল্প হলেই হল। তাই টুবলু-ই ওদের হয়ে বলে, "কাকু, ওসব কথা থাক। আপনি নতুন গল্প বলুন। তবে হ্যাঁ সুন্দর করে বলতে হবে কিন্তু।"

বিজয়কাকু বলেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার তা হলে গল্প শুরু করি, কেমন? আচ্ছা এর আগে তোমাদের প্রাচীন রোমের কথা বললাম তো,এবার চলো না প্রাচীন গ্রিস থেকেই এবার একটু ঘুরে আসা যাক। ঠিক কিনা?

"তবে তার আগে তোমাদের একটা কথা বলে রাখি। ল্যাটিন লিগে কিন্তু গ্রিক অধিবাসীরাও ছিল। কিন্তু তারা রোমের শাসনে সুখী নয়। ল্যাকেডেমোনিয়ার রাজা আরকিডেমাস টারেনটাইন লিগকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। আর জড়িয়ে পড়লেন স্যামনাইটদের সঙ্গে লড়াইয়ে। কিন্তু এদের মধ্যে সবচেয়ে সফল হলেন এপিরাসের আলেকজান্দার। ইনি আমাদের আলেকজান্দার দি গ্রেটের কাকা। এপিরাসের রাজা নদীনালা পার হয়ে চলে এলেন তাঁর গ্রিকভাই টারেনটাইনকে সাহায্য করতে। অনেক লড়াই জিতলেন তিনি। ব্যাপারটা এমন হতে চলেছিল যে মনে হল তিনি বুঝি-বা দক্ষিণ ইতালিতে এক গ্রিক সামরিক শাসন ব্যবস্থাই চালু করে বসবেন। কিন্তু কপাল! আততায়ীর হাতে মারা পড়লেন এপিরাসের আলেকজান্দার। তিনি চেয়েছিলেন রোমের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করতে। আর বলতে নেই তাঁর মাধ্যমেই রোম প্রথম মাতৃভূমির গ্রিসের লোকদের সংস্পর্শে এল। মনে রেখো,গ্রিকরা যদিও নিজেদের হেলেনিজ বলত। কিন্তু রোমানরা তাদের গ্রিক বলেই চিহ্নিত করেছে।"

সোনামণি উসখুস করছিল। সে বলেই বসে, "কাকু, গল্প কখন শুরু করবে?"

কথা শুনে কাকু হাসলেন। এক চুমুক জল খেলেন। বললেন, "এবারের গল্প কিন্তু বিরাট। মন দিয়ে শোনো। জিউস মন্দিরে দেবতার বেদি পরিষ্কার করছিল গালবা। সকাল থেকেই এ-কাজ করছে সে। এখন বেলা গড়িয়েছে। কিন্তু তবুও তার কাজের বিরাম নেই। খুব যত্ন করে কাজ করে গালবা। তার বন্ধুরাও। তার বন্ধুরাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এখানে-ওখানে। তারাও অন্য কাজে ব্যস্ত। দেবতার মন্দির বিশাল ও বিরাট। একে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা? সেও কি এক সহজ ব্যাপার নাকি? তাই সকালেই দু' মুঠো মুখে দিয়ে বের হয়ে পড়তে হয় কাজে। তারপর সারাদিন কাজ আর কেবল কাজ। প্রতিদিন একই নিয়মে বাঁধা। আগে তবুও একটু সময় পেত তারা জিরিয়ে নেবার। কিন্তু এখন সেসব আইনও বদলেছে। কড়া পাহারায় কাজ করতে হয় তাদের। কাজে কোনও গাফিলতি দেখলেই শাস্তি।"

শাক্য আর থাকতে পারে না। বলে ওঠে, "কাকু, এ তো ভীষণ অন্যায়।"

বিজয়কাকু বলেন, "তা কী আর করা বল? তখনকার ব্যাপারই ছিল ওরকম। যাক, কী যেন বলছিলাম? ও হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে। ওলিম্পিয়া প্রান্তরে জিউসের মন্দির। পেছনে তাকালে দেখা যাবে মধ্য পেলোপোনিসাসের বুক কাঁপানো পর্বতমালা। মন্দির রয়েছে উত্তর-পশ্চিমমুখো। লোকে বলে ওদিক থেকেই নাকি উত্তর দিকে থাকা গ্রিকদের পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন। গালবা যেখানে কাজ করে বা ডোসন ভিলিয়াস ফ্ল্যামিনিয়াস যেখানে কাজ করে সেই জিউস দেবতা কিন্তু গ্রিকদের আদি দেবতা। এখানে রয়েছে আর্টেমিস আর ডায়নিসাসের মন্দির। পুবের লোকরা এদের পুজো করত। গ্রিকরা তাদের থেকে ধার করে এনেছে এদের উপাসনার চিন্তা। আবার এখানে রয়েছে এথেনার মন্দির। যাকে গ্রিকরা এনেছে পরাজিত লোকদের কাছ থেকে। অবশ্য এ-চত্বরে সবচেয়ে পুরনো হচ্ছে জিউসের স্ত্রী হেরা-র মন্দির।"

সুজিব আর বাবুসোনা হাঁ হয়ে যায়, "এত দেবদেবী একজায়গায়! ওঁদের বিরোধ ঘটেনি কখনও?"

প্রশ্ন শুনে বিজয়কাকু হেসে ফেলেন, "সে আর বলতে? কিন্তু সে তো অন্য গপ্পো। এখন যা বলছি সেটুকু তো শোনো। এত

দেবদেবী ! কিন্তু গ্রিকদের আসল দেবতা পৃথিবীর এক আশ্চর্য সৃষ্টি ফিডিয়াসের তৈরি জিউস রয়েছেন ওলিম্পিয়া প্রান্তর আলো করে। সোনা আর হাতির দাঁতের তৈরি সেই মূর্তি বিরাট বিশাল। দ্রাক্ষাকুঞ্জ ঘিরে রয়েছে জিউসের মন্দির। অবিরত চলেছে প্রার্থনা আর পুজো। সুগন্ধে চারদিক ভরপুর। ভক্তরা প্রায় সারাদিনই আসছে মন্দিরে।"

বিজয়কাকুর ভাব এসে গিয়েছিল বলতে বলতে। কিন্তু বাধা পড়ে রাখী, পৌলমী আর মুনিয়ার কথায়। ওরা বলে, "এসব তো হল। মন্দিরের কথা, মূর্তির কথা আর আশপাশের কথা না বললে আমরা কী করে বুঝব কেমন ছিল জিউসের বিরাট মন্দির ?"

বিজয়কাকু একটু চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, "সে কথাই তো এবার বলতে চলেছি তোমাদের। কিন্তু এরকম বারবার কথা বলে আমার গল্পের খেই হারিয়ে দিয়ো না। কেমন ? শোনো, ওলিম্পিয়া প্রান্তর চিরকালের মতো রয়েছে বন ও কৃষিখেতে ভরা। মহান জিউসের পিতা মাউন্ট ক্রোনস চিরদিন ঢাকা পড়ে রয়েছেন পাইন আর জলপাই গাছে। আলফিয়াস আর তার শাখা নদী ক্লডিয়াস বারবার আছড়ে পড়ছে ক্ষয়ে যাওয়া বড় বড় শ্বেতপাথরের ওপর। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। নিজেদের খেয়ালখুশিতে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। আর এই নীল আকাশকে ছোঁবার জন্যেই যেন মন্দিরের শ্বেতপাথরের স্তম্ভগুলি উঠে এসেছে। ওইসব স্তম্ভে আর দরজা-জানালার ওপর দিকে গ্রিকপুরাণের নানা কাহিনী আঁকা ও খোদাই করা হয়েছে। দেবতার বেদি সুদৃঢ়। দু'পাশে রয়েছে তেরোটি করে আর দু'প্রান্তে রয়েছে ছ'টি করে সুবিশাল স্তম্ভ। গ্রিসের ডোরিক প্রদেশের স্থাপত্য রথ এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এদের মাথায় রয়েছে সুসজ্জিত ছাদ। পজানিয়াস বলেছেন ইলিয়ানরা প্রতিদ্বন্দ্বী শহর পিসা দখল করে যে সম্পদ এনেছিল তা দিয়েই তৈরি হয়েছে এই মন্দির। এই মন্দিরে রয়েছে রং-বেরঙের খেলা। শিল্পির সূক্ষ্ম হাতে তা হয়েছে সুষমামণ্ডিত ও নয়নমনোহর। ডোরিক ভাস্কর্যের চৌকোনো অংশের ওপর রয়েছে নীল রং আর ঝুলেপড়া আয়তক্ষেত্রর রং হয়েছে লাল।"

একনাগাড়ে অনেকটা কথা বলে একটু থামলেন বিজয়কাকু। এক চুমুক জল খেলেন। শ্রোতাদের মুখের দিকে একটু তাকালেন। না, কারও মুখেই বিরক্তির ছাপ নেই। বরং এবার ওরাই তাগাদা দেয়, "কী হল ? থামলেন কেন ? বলুন।"

"ব্যস, ব্যস, এই তো শুরু করছি," বলে বিজয়কাকু প্রবল উৎসাহে বলে চললেন, "মন্দিরের ছাদ তৈরি হয়েছে শ্বেতপাথর দিয়ে যার ওপর সূর্যের আলো পড়ে ঠিকরে পড়ছে। এর ওপর রয়েছে জিউস দেবতার পবিত্র মূর্তি। সবই দেখার মতো চোখ চেয়ে। তিন ফুট উঁচু আর বাইশ ফুট চওড়া এক পাথরের ওপর মূর্তিটি স্থাপিত। দেবতার মূর্তি প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু যেন ছাদ ছুঁয়ে ফেলবে। এই মূর্তি তৈরি হয়েছে হাতির দাঁত আর সোনার পাত দিয়ে। তা ছাড়া কাঠের ফ্রেমগুলিও মুড়ে দেওয়া হয়েছে হাতির দাঁত ও সোনার পাতে। অবশ্য জায়গাটা একটু স্যাঁতসেঁতে। কাঠের ফ্রেম যাতে কুঁচকে ছোট না হয়ে যায় সেজন্য সারা বছর ধরেই তাদের তেল দিয়ে ভিজিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডোসন বা ভিলিয়াসের মতো লোক তো এসব কাজই করত। ওদিকে জিউস বসে রয়েছেন স্বর্ণ-সিংহাসনে। মূল্যবান পাথর, আবলুস কাঠ আর হাতির দাঁত লাগানো রয়েছে তাতে। জিউসের পদযুগল স্থাপিত রয়েছে এক পাদানির ওপর। ভক্তদের চোখ সরাসরি যাতে সেই পদযুগল দেখতে পায় তেমনই ব্যবস্থা করা। তার ডান হাতে রয়েছে সোনা ও গজদন্তে তৈরি ভিক্টরির মূর্তি। হাতটা উঁচু করে রাখা। তাঁর বাঁ হাতে রয়েছে রাজদণ্ড যাতে খোদাই করা রয়েছে মূল্যবান পাথর আর এক ঈগলপাখি বসে রয়েছে সেই দণ্ডের ওপর। জিউসের গজদন্তে তৈরি কাঁধে রয়েছে সোনার তৈরি এক দীপশিখার আবরণ, যা আবার শোভিত হয়েছে ফুল ও পশুর চিত্র দিয়ে। জিউসের শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল শান্ত ও পবিত্র।

"আর এই দেবতার বংশানুক্রমিক পূজারী ছিলেন ফিডিয়াসের বংশধররা। এই পূজারীদের অধীনে কাজ করত ভিলিয়াস, গালবা, থেমিসটোক্লেস, আরিসটিডেস, পিথোডোরাস বা আর কেউ-কেউ। এই বিশাল মন্দির সাফসুতরো রাখা, তার দেখভাল বা পরিচর্যা করা, এমনকী দিনের বিভিন্ন সময়ে বাঁশি বাজানো আর বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে গান করার কাজ করতে হত তাদের মতো হতভাগ্য ক্রীতদাসদেরই। তারাও গ্রিক। কিন্তু অন্য জায়গার। তাই এই পরাধীন জীবনে তাদের কপালে জুটেছে এসব কাজ। সকালে দু' মুঠো খেয়ে বের হত তারা। কিন্তু তারপর কাজ করতে করতে কোথা দিয়ে যে দিন শেষ হয়ে যেত বুঝতেই পারত না। যুদ্ধ করা দূরে থাক ভোটের অধিকার বা সরকারি কাজ কিছুই জুটবে না তাদের। শুধু করে যেতে হবে এই কাজ। কেবল এই কাজ।

"এমনই চলেছিল। কিন্তু বোধহয় ফিলোমিলাস এসেই আদেশ জারি করলেন, বংশীবাদকরা বিরামের সময়ও খেয়ে নিতে পারবে না।

"খবরটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল ক্রীতদাসমহলে। সঙ্গে সঙ্গে অসন্তোষ শুরু হয়ে গেল তাদের মধ্যে। প্রতিকার চাই। কিন্তু কী করে ? গালবা, ডোসন অন্যদের ডেকে বলল, 'ভাইসব, ভুলো না রোমের ঘটনা। সেখানে আমাদের বন্ধুরা প্রতিবাদ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। স্থানীয় শাসনকর্তা ডেনটাটুস বুদ্ধির খেলায় তাদের হারিয়ে দিয়েছিল সেবার। এখানেও যেন সেরকম কিছু না হয়। সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে আমাদের। আমাদের দাবি তো সামান্যই। তাই তা হাসিল করতে গেলে আমাদেরও বুদ্ধির খেলায় জিততে হবে। তাই ভাইসব, জোট বাঁধো, তৈরি হও সবাই। আমাদের অধিকার ফিরে পেতেই হবে।'

"ভেতরে ভেতরে যে এত কাণ্ড চলেছে সে খবর পেলেন না ফিলোমিলাস। এবার তাই ঘটনাটা ঘটে গেল। সেদিন মন্দিরে পুজো। গ্রিস দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তবৃন্দের সমাবেশ ঘটেছে সেদিন। চারদিকে সুগন্ধি আতর ছড়ানো হয়েছে। গন্ধে ভরপুর আকাশবাতাস। সমস্ত সময় ধরে চলেছে বাজনা। ভেসে আসছে বংশীবাদকদের সুলহরী। অপূর্ব তার মূর্ছনা।

"কিন্তু হঠাৎই ছেদ পড়ল তাতে। থেমে গেল বাজনার আওয়াজ। চারদিক চুপচাপ। সময়টা ছিল আগেকার হিসাবে খাবার বিরতির সময়। অথচ এত খবর কে রাখে ? চারদিকে এবার তাই হইহই রইরই রব উঠে গেল। কী ব্যাপার, কী ব্যাপার ? কী হল ? উত্তরটা জানা গেল অল্প সময়ের মধ্যেই, বংশীবাদকরা এই সময়টুকু বাজাতে অস্বীকার করেছে। বিরামের সময় তাদের খেয়ে নেবার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। সেই দাবি আদায়ের জন্যেই আজ তারা ধর্মঘট করেছে। অভিনব এক পদ্ধতি তাদের। সবাই হতচকিত। ঘটনাটা ঘটে গেল এত তাড়াতাড়ি যে সামাল দেবার ছিল না কেউই। ঘটে গেল খ্রিস্টপূর্ব তিনশো নয় শতকের একদিন।"

বিজয়কাকু চুপ করলেন এবার। শ্রোতারা কিন্তু কলকল করে উঠল, "কাকু সত্যিমিথ্যে বানিয়ে কত কথাই না বললেন।" কাকু হাসলেন এবারও। জবাব দিলেন, "তা ইতিহাসের গল্প করতে গেলে ওরকম একটু-আধটু ভুলচুক হয়েই থাকে। তবে ঘটনাটা সত্যি এটুকু জেনো। জেনো, ইতিহাসে ওটাই প্রথম ধর্মঘট।"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

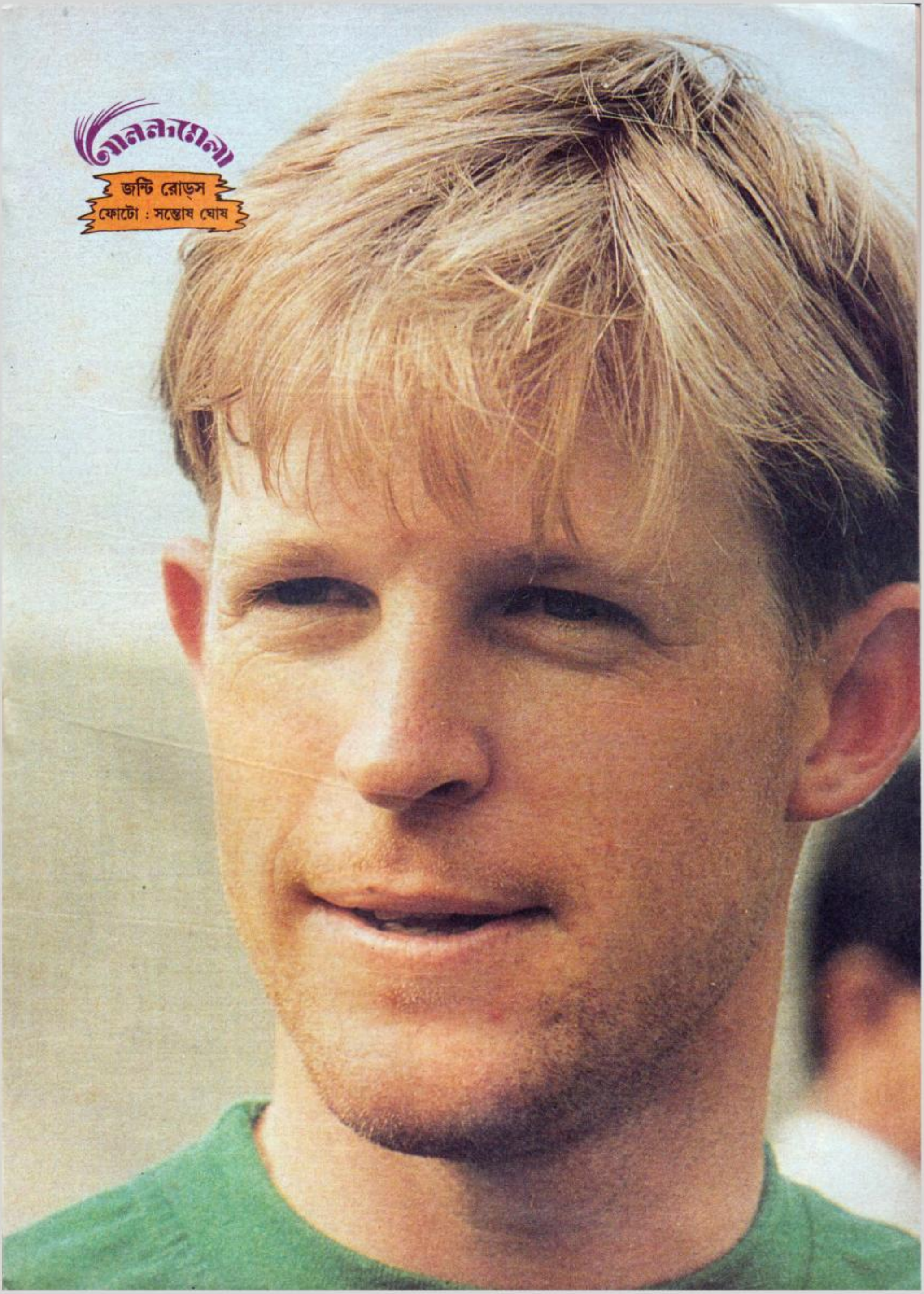
জন্টি রোড্‌স
ফোটো : সন্তোষ ঘোষ

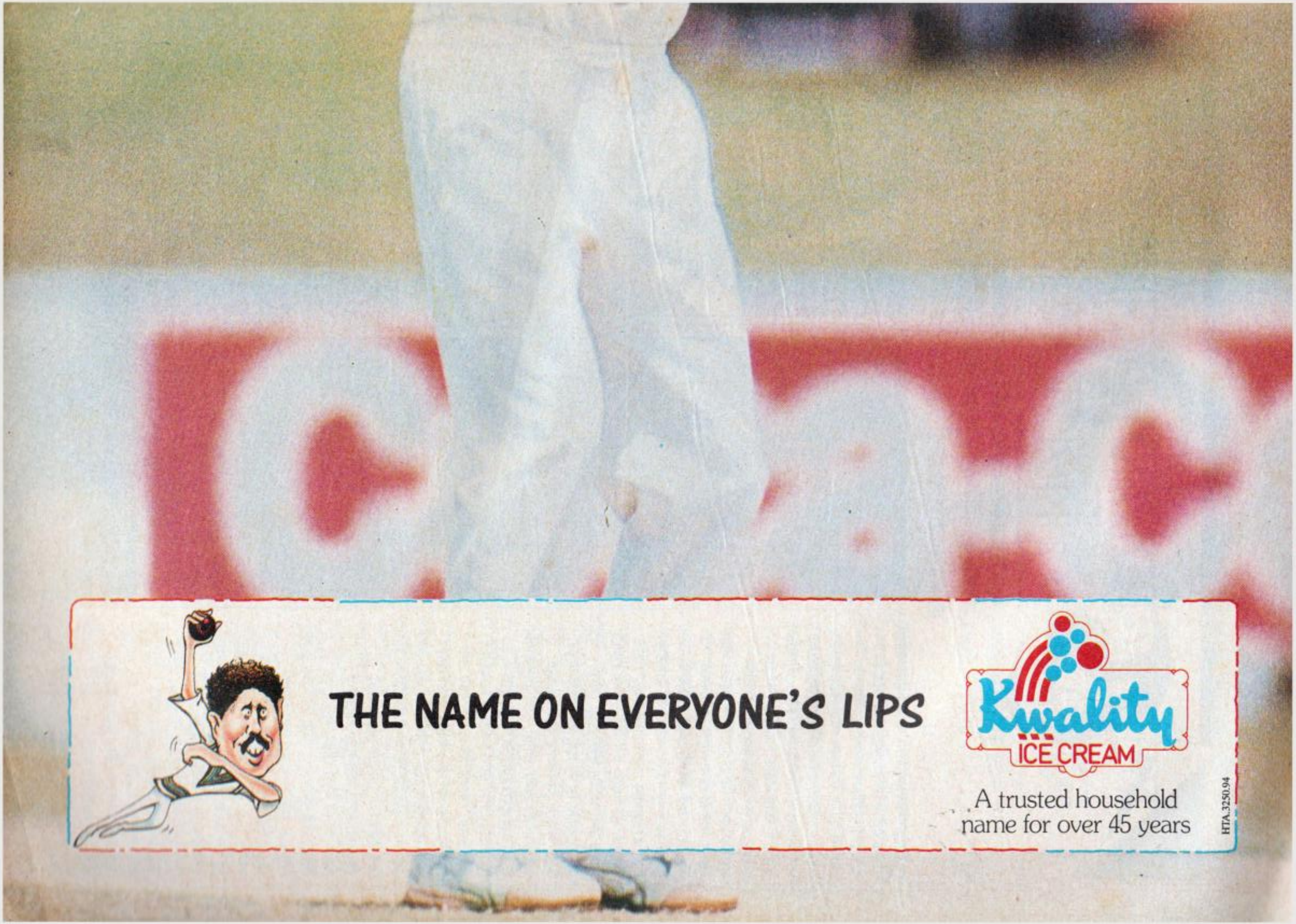
THE NAME ON EVERYONE'S LIPS
Kwality
ICE CREAM
A trusted household name for over 45 years
HTA.3250.94

ডেভিস কাপে আমেরিকার জয় নিয়ে সন্দেহ নেই

আর কয়েকদিনের মধ্যে ডেভিস কাপের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে ভারত মুখোমুখি হচ্ছে আমেরিকার। কী হবে ফল ?

লিখেছেন **সমীরণ সেন**

বদলে গেল দৃশ্যটা। কয়েক মাস আগেই ভারতীয় টেনিস নিয়ে গর্ব করেছি আমরা। ডেভিস কাপে ভারতীয় খেলোয়াড়দের চমকপ্রদ পারফরম্যান্স তটস্থ করে দিয়েছিল বিশ্বের সেরা দেশগুলিকেও। গত মরসুমে সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছিল ভারত। আর এবার ? ডেভিস কাপের ওয়ার্ল্ড গ্রুপের প্রথম ম্যাচেই ভারতকে সম্ভবত বিদায় নিতে হবে। ভারতের সামনে আশার আলো দেখা যাচ্ছে না প্রধানত দুটি কারণে। এক, ভারত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকার মুখোমুখি, আর দুই, ভারতীয় দলে প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতি। দিল্লিতে ২৫ থেকে ২৭ মার্চ ঘাসের কোর্টে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খেলা। ঘরের মাঠে খেলার যে সুবিধে, তা ভারত কতটা নিতে পারবে সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এর প্রধান কারণ, দলে প্রতিভাবান ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতি। লিয়েন্ডার পেজ তেমন অভিজ্ঞ না হলেও প্রতিভাবান খেলোয়াড়। গত বছর তাঁর পারফরম্যান্স গর্ব করে বলার মতো ছিল। এবার ভারতীয় দলে পেজ ছাড়া আর কেউ নেই যিনি কুরিয়ার কিংবা টড মার্টিনের মতো বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং-এ গোড়ার দিকে থাকা খেলোয়াড়দের সামলাতে পারেন। ভারতীয়দের মধ্যে যেটুকু লড়াই তা লিয়েন্ডারই করবেন। আর পারতেন রমেশ কৃষ্ণন। অভিজ্ঞ রমেশ সদ্য খেলা ছেড়েছেন। তাঁর জায়গা পূরণ করবার দক্ষতা নেই এখনকার দলে অন্য কারও। জিশান আলি, রোহিত রাজপাল, আসিফ ইসমাইল বা গৌরব নাটেকর, যিনিই শেষপর্যন্ত নির্বাচিত হোন না কেন, কেউই আমেরিকার খেলোয়াড়দের হারাতে পারবেন না। দুঃখের হলেও এটাই সত্য যে, এঁদের দক্ষতা সীমাবদ্ধ জাতীয় টুর্নামেন্টগুলির মধ্যেই। ভারতীয় দলের নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন নরেশকুমারের সরে যাওয়াও দলের পক্ষে একটা বড় আঘাত। দলগত সংহতি আনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল বিরাট।

লিয়েন্ডার পেজ ফোটো : সন্তোষ ঘোষ

জিম কুরিয়ার

ভারতীয় দল তাই নানা কারণে যেমন ভাঙা, তেমনই এবারের আমেরিকার দলটি খুবই শক্তিশালী। যদিও পিট সাম্প্রাস, আন্দ্রে আগাসি ও মাইকেল চ্যাং আসছেন না, তবু যাঁরা আসছেন তাঁরা ভারতের তুলনায় অনেক এগিয়ে। জিম কুরিয়ার এখন বিশ্বের তিন নম্বর খেলোয়াড়, তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত।

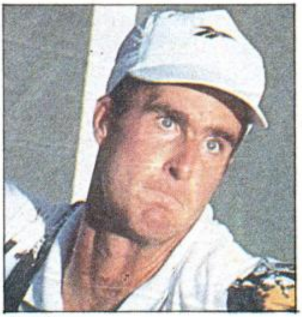

টড মার্টিন

টড মার্টিন, ঘাসের কোর্টে অত্যন্ত দক্ষ, সদ্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে রানার্স হয়েছেন। এঁরা খেলবেন সিঙ্গল্‌স ম্যাচ। ডাবল্‌সের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন প্যাট্রিক ম্যাকেনরো এবং রিচি রেনেবার্গ। প্যাট্রিক প্রখ্যাত জন ম্যাকেনরোর ভাই। টেনিস সার্কিটে ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত প্যাট্রিক। প্যাট্রিক এবং রেনেবার্গের জুড়িকে হারানোর ক্ষমতা লিয়েন্ডারদের নেই। আমেরিকা দলের নতুন নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন টম গালিকসন জানিয়েছেন, তাঁরা এই টাই-কে হালকাভাবে নেবেন না। তাঁদের অবশ্য চিন্তার কারণ আছে। গত বছর নামী খেলোয়াড়দের অনুপস্থিতিতে ৩০ বারের ডেভিস কাপ চ্যাম্পিয়ান আমেরিকা প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছিল। সেই দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি চান না বলেই আমেরিকা প্রথম থেকেই এবার তৈরি। এমনকী দলের সঙ্গে আসতে পারেন জন ম্যাকেনরো এবং আন্দ্রে আগাসিও। দলের মনোবল বাড়াতেই নাকি তাঁদের আগমন। অবশ্য ভারতকে হারানোর জন্য এতজন আসার কোনও দরকার নেই। আমেরিকাকে আটকানোর কোনও ক্ষমতা কি ভারতীয় টেনিস দলের আছে ?

বিদেশি খেলোয়াড়দের কদর বাড়ছে স্পেনে

স্পেনে নানা ধরনের খেলায় বিদেশ থেকে খেলোয়াড় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাঁদের দেওয়া হচ্ছে প্রভূত অর্থমূল্য।

লিখেছেন **দিব্যজ্যোতি মুখোপাধ্যায়**

স্পেনের কদর বাড়ছে। বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়রা ছুটে যাচ্ছেন স্পেনের মাটিতে। রোজগারও যেমন বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে খেলার মানও। তিন ধরনের খেলায় আকৃষ্ট হচ্ছেন খেলোয়াড়রা। ফুটবল, বাস্কেটবল আর হ্যান্ডবল। এই তিনটি খেলায় এখন ভিড় করছেন বহু বিদেশি খেলোয়াড়ই। স্পেনের ক্লাবগুলি, যাদের আর্থিক অবস্থা একটু ভাল, তারাই নজর দিচ্ছে বিদেশি খেলোয়াড়দের দিকে। সবচেয়ে বেশি বিদেশি খেলোয়াড় আছে ফুটবলে। এঁদের সংখ্যা ৬৪। আর্জেন্টিনা থেকে এসেছেন সবচেয়ে বেশি ফুটবলার। ১০ জন এখন খেলছেন স্পেনের বিভিন্ন ক্লাবে। তারপরই রয়েছে ব্রাজিলের নাম। সেখান থেকে এসেছেন ন'জন। এ ছাড়া স্পেনের মাটিতে খেলছেন ক্রোয়েশিয়া, সেরবিয়া, বোসনিয়া, পোর্তুগাল, পেরু, চিলি, মেক্সিকো, হল্যান্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খেলোয়াড়রা। ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় হলেন রবার্ট প্রোসিনেকি রিয়েল মাদ্রিদ ক্লাবে খেলছেন তিনি। এসেছেন ক্রোয়েশিয়া থেকে। ২৪ বছরের এই তরুণের আয় বছরে ৩০ কোটি পেসেতা (তিন টাকায় এক পেসেতা)। এর পর আছেন আর্জেন্টিনার ফেরনান্দো রেফোন্দো। খেলছেন তেনেরিফে ক্লাবে। বয়স ২৪ বছর। প্রতি বছর পাচ্ছেন সাড়ে ১২ কোটি পেসেতা। এ ছাড়াও দামি খেলোয়াড়দের মধ্যে আছেন ব্রাজিল থেকে আসা রোমারিয়ো ডা সোউজা ও বেবেতো, মেক্সিকোর হুগো সাঞ্চেজ। রোমারিয়ো খেলছেন বার্সেলোনা ক্লাবে। পাচ্ছেন ১০ কোটি পেসেতা। তাঁকে পাওয়ার জন্য বার্সেলোনা ক্লাবকে ৪০ কোটি পেসেতা দিতে হয়েছে হল্যান্ডের পি এস ভি ক্লাবকে। বেবেতো পাচ্ছেন আট কোটি পেসেতা। আর হুগো সাঞ্চেজের আয় ছ' কোটি পেসেতা।

বাস্কেটবল-খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খেলোয়াড় এসেছেন আমেরিকা থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৪৩জন এসেছেন স্পেনে।

সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় আরভিদাস সাবোনিস এসেছেন লিথুয়ানিয়া থেকে। এখন খেলছেন রিয়েল মাদ্রিদ ক্লাবে। আয় প্রতি বছরে ১৮ কোটি পেসেতা। সাবোনিস স্পেনের প্রথম বাস্কেটবল খেলোয়াড় যিনি ১০ কোটি পেসেতার অঙ্ক অতিক্রম করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রেড রবার্টস পাচ্ছেন ১০ কোটি ২০ লক্ষ পেসেতা। খেলছেন বার্সেলোনা ক্লাবে।

হ্যান্ডবলের জনপ্রিয়তাও বাড়ছে স্পেনে। ৪৪জন বিদেশির মধ্যে রাশিয়া থেকে এসেছেন ১৫ জন। সার্বিয়া থেকে পাড়ি জমিয়েছেন ১০ জন। বেলারুশ থেকে এসেছেন চারজন। হাঙ্গারি, ইউক্রেন প্রভৃতি দেশের খেলোয়াড়দেরও দেখা যাচ্ছে। পোল্যান্ডের বোগান ওয়েনতা এখন সে-দেশের সবচেয়ে দামি বিদেশি হ্যান্ডবল খেলোয়াড়। ৩১ বছরের বোগান পাচ্ছেন দু' কোটি পেসেতারও বেশি। এখানে তাঁকে বলা হয় 'হ্যান্ডবলের মারাদোনা'।

স্পেনের মাটিতে আরও নতুন বিদেশি মুখ দেখা যাবে বলে সবারই অনুমান। আর সেই সঙ্গে জমে উঠবে নানা ধরনের খেলা। সেই সঙ্গে আর্থিক লাভও হবে বলে মনে করছেন ওখানকার কর্মকর্তারা। ●

হুগো সাঞ্চেজ

ব্যাডমিন্টনে ইন্দোনেশিয়াই সেরা

বিশ্ব-ব্যাডমিন্টনে এখন প্রবল আধিপত্য ইন্দোনেশিয়ার। আসন্ন অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ানশিপেও যে সেই আধিপত্য অটুট থাকবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। লিখেছেন **প্রতাপ জানা**

"ইন্দোনেশিয়ার পুরুষ ব্যাডমিন্টন-দলে এখন এত প্রতিশ্রুতিমান খেলোয়াড় আছেন যে, দল গঠন করাই হয়ে দাঁড়িয়েছে এক বিরাট সমস্যার ব্যাপার। আরডি উইরানাতা কেবল আমাদেরই নয়, বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড়, কিন্তু তাঁকে যখন-তখন হারাবার ক্ষমতা আমাদের অন্য আটজনের আছে। ইন্দোনেশিয়ার ছেলেরা বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে অবশ্যই আধিপত্য কায়েম করবে। এই ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারব আর-এক বছরের মধ্যে।" ১৯৯১ সালের শেষের দিকে এই মন্তব্য করেছিলেন ইন্দোনেশিয়া ব্যাডমিন্টন দলের অন্যতম কোচ ইন্দ্র গুনবান। গুনবান ঠিকই চিনেছিলেন তাঁর দলের শক্তিকে। নয়ের দশকের গোড়া থেকে বিশ্ব-ব্যাডমিন্টনে ইন্দোনেশিয়ার যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা এখনও অব্যাহত। ইন্দোনেশিয়ার শাট্‌লারদের খ্যাতির কথা লোকের মুখে-মুখে ফেরে।

রুডি হরতনো

গত বছর অর্থাৎ ১৯৯৩ সালের সালতামামি করলে দেখা যায়, বিশ্ব-ব্যাডমিন্টনের সবকটি বড় টুর্নামেন্টের সিঙ্গল্‌সের চ্যাম্পিয়ান ও রানার্সের খেতাব চলে গেছে ইন্দোনেশিয়ানদের দখলে। অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিন্টনে বিজয়ী হয়েছিলেন হারিয়ান্তো আরবি, রানার্স জোকো সুপ্রিয়ান্তো। বার্মিংহাম বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানশিপে খেতাব জয় করেছিলেন জোকো সুপ্রিয়ান্তো এবং রানার্স হন হারমাওয়ান সুশান্তো। দিল্লির বিশ্বকাপ আসরের ফাইনালে জোকো সুপ্রিয়ান্তো-কে হারিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন বার্সেলোনা ওলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ান অ্যালান বুদি কুসুমা। গ্রাঁ প্রি-র ফাইনালে হারিয়ান্তো আরবি-কে হারিয়ে খেতাব জিতেছেন জোকো সুপ্রিয়ান্তো। ১৯৯৩ সালের বর্ষসেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ২৭ বছর বয়সী জোকো সুপ্রিয়ান্তো। শুধু তাই নয়, মহিলা বিভাগে সুসি সুশান্তির কৃতিত্বের জন্যই ইন্দোনেশিয়া গত বছর জয় করেছিল এই চারটি বড় টুর্নামেন্টের সিঙ্গল্‌স খেতাবও। স্বাভাবিকভাবেই সুসি সুশান্তি পেয়ে যান বর্ষসেরার স্বীকৃতি। অর্থাৎ পুরুষ ও মহিলা দুটি বিভাগেই বিশ্ব-ব্যাডমিন্টনে ইন্দোনেশিয়ার দাপট এখন স্পষ্ট ও পরিষ্কার। চিন নয়, বিশ্ব-ব্যাডমিন্টনে এই মুহূর্তে এক নম্বর শক্তি ইন্দোনেশিয়াই। বিশ্ব-ব্যাডমিন্টনে যখন ইন্দোনেশিয়ার এমন আধিপত্য, তখন এবারের অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ানশিপে ইন্দোনেশিয়ানদেরই স্বভাবত ফেভারিট হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ানশিপ খুব পুরনো ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট। শুরু হয়েছিল ১৮৯৯ সালে, ওয়েমব্লি-র এম্পায়ার পুল-এ। সেই থেকে প্রতি বছর (দুটি বিশ্বযুদ্ধের সময় ছাড়া) মার্চ মাসের মাঝামাঝি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এই ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা। এবারের খেলা হবে ১৬ থেকে ১৯ মার্চ। ঐতিহ্য, প্রাচীনত্ব ও আকর্ষণের দিক থেকে

অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টনে বিজয়ী হয়েছিলেন হারিয়ান্তো আরবি, রানার্স জোকো সুপ্রিয়ান্তো। বার্মিংহাম বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানশিপে খেতাব জয় করেছিলেন জোকো সুপ্রিয়ান্তো এবং রানার্স হন হারমাওয়ান সুশান্তো। দিল্লির বিশ্বকাপ আসরের ফাইনালে জোকো সুপ্রিয়ান্তো-কে হারিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন বার্সেলোনা ওলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ান অ্যালান বুদি কুসুমা।

জোকো সুপ্রিয়ান্তো

এখনও অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ানশিপের গুরুত্বই আলাদা। অনেকটা টেনিসে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানশিপের মতোই। যে-সময় ব্যাডমিন্টনে বিশ্বকাপ কিংবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলার ব্যবস্থা ছিল না, তখন অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিন্টনের চ্যাম্পিয়ানকে বেসরকারিভাবে বিশ্বসেরার স্বীকৃতি দেওয়া হত। এখন ব্যাডমিন্টনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপ এবং বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টের ব্যবস্থা থাকলেও অল ইংল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ানের সেই গুরুত্ব আগের মতোই থেকে গেছে। অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিন্টনের চ্যাম্পিয়ানদের তালিকায় আছেন বহু বিখ্যাত শাট্‌লার—জেম্‌স টমাস, ফ্রাঙ্ক ডেভলিন, রিচার্ড নিকোলাস, ওং পেং সুং, এডি চুং, অরল্যাণ্ড কপস, রুডি হরতনো, লিয়েম সুই কিং, মর্টেন ফ্রস্ট ও ঝাও জিয়ান হুয়া। খেতাব সংগ্রহের দিক থেকে সবাইকে পেছনে ফেলে দিয়েছেন কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার প্রবাদতুল্য খেলোয়াড় রুডি হরতনো। রুডি হরতনো এই টুর্নামেন্টে খেতাব জিতেছিলেন মোট আটবার ও টানা সাতবার (১৯৬৮-'৭৪, ১৯৭৬)। দুটি রেকর্ডই এখনও অম্লান। আর মেয়েদের বিভাগে এই প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি সিঙ্গল্‌স জয় করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জুডি হাসম্যান (বিয়ের আগে জুডি ডেভলিন)। ফ্রাঙ্ক ডেভলিনের কন্যা জুডি ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে সিঙ্গল্‌স খেতাব জিতেছিলেন ১০টি। এই টুর্নামেন্টে ভারতীয়দেরও আছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। ১৯৪৭ সালের

সুসি সুশান্তি

ফাইনালে প্রকাশনাথ হেরেছিলেন ডেনমার্কের কনি জেপসনের কাছে। আর-এক প্রকাশ, প্রকাশ পাড়ুকোন এখানে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন ১৯৮০ সালে, ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার লিয়েম সুই কিং-কে চূর্ণ করে।

আসন্ন এই চ্যাম্পিয়ানশিপে এবার কে জিতবেন? আটের দশকের মাঝামাঝি চারবারের অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিন্টনের চ্যাম্পিয়ান, ডেনমার্কের মর্টেন ফ্রস্ট বলেছিলেন, "আগে ছিল ইন্দোনেশিয়া বনাম অবশিষ্ট বিশ্বের লড়াই, এখন হচ্ছে চিন বনাম অবশিষ্ট বিশ্বের।" হিসেবটা এখন পালটে গেছে। এখন হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে অবশিষ্ট বিশ্বের লড়াই। জোকো সুপ্রিয়ান্তো নিশ্চয়ই এক নম্বর ফেভারিট। জোকো সুপ্রিয়ান্তো মূলত রক্ষণাত্মক খেলোয়াড়। তাঁর খেলায় আছে 'পার্সেন্টেজ' ব্যাডমিন্টন। আছে চমৎকার ফর্মের ধারাবাহিকতাও। খেলেন রীতিমত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। খেলার ধারা অনুযায়ী স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তন করতে দক্ষ তিনি। খেলার সময় তিনি থাকেন বেশ হাসিখুশি। তাঁর নিজের কথায়, "টেনশন কমাতে আমি ওইরকমই করি।" ১৯৯২ সালে বিশ্বকাপ জিতে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন জোকো সুপ্রিয়ান্তো।

সুপ্রিয়ান্তোর পাশাপাশি উঠে এসেছেন হারিয়ান্তো আরবি-ও। অল ইংল্যাণ্ড খেতাব সহ আরবি গত বছর জয় করেছিলেন জাপান ও তাইওয়ান ওপেন এবং এশিয়ান ব্যাডমিন্টন কনফেডারেশন চ্যাম্পিয়ানশিপ। ২২ বছর বয়সী হারিয়ান্তো আরবি মধ্য জাভার এমন এক পরিবারের ছেলে, যে-পরিবারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে ব্যাডমিন্টন।

হারমাওয়ান সুশান্তো

গত পাঁচ বছরের চ্যাম্পিয়ান

সাল	পুরুষ	মহিলা
১৯৮৯	ইয়াং ইয়াং (চিন)	লি লিংউই (চিন)
১৯৯০	ঝাও জিয়ান হুয়া (চিন)	সুসি সুশান্তি (ইন্দোনেশিয়া)
১৯৯১	আরডি উইরানাতা (ইন্দোনেশিয়া)	সুসি সুশান্তি (ইন্দোনেশিয়া)
১৯৯২	লিউ জুন (চিন)	তাং জিউ হং (চিন)
১৯৯৩	হারিয়ান্তো আরবি (ইন্দোনেশিয়া)	সুসি সুশান্তি (ইন্দোনেশিয়া)

হারিয়ান্তোর দুই দাদা হাসতমো ও এডি ছিলেন আটের দশকে ইন্দোনেশিয়ার টমাস কাপ দলের সদস্য। কোর্টের মধ্যে অসম্ভব দ্রুতগতি হচ্ছে হারিয়ান্তোর বড় সম্পদ। হাতে আছে দুরন্ত ও চতুর স্ম্যাশ।

হারিয়ান্তো প্রধানত আক্রমণাত্মক খেলোয়াড় হলেও 'ডিফেন্স' করার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট দক্ষ। অনেকের মতে, চিনের প্রতিভাবান খেলোয়াড় ঝাও জিয়ানের ডান-হাতি সংস্করণ হারিয়ান্তো আরবি। ২৫ বছর বয়সী অ্যালান বুদি কুসুমা স্ট্রোক প্লেয়ার বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই। এ ছাড়া কুসুমা-র কোর্ট কভার করার ক্ষমতাও বেশ ভাল। অভিজ্ঞ অ্যাথলিটের মতো কুসুমা কোর্টে বিচরণ করেন। বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর খেলোয়াড় আরডি উইরানাতা-কেও হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে। উইরানাতার খেলায় আছে জমাট ডিফেন্স। প্রয়োজনে আক্রমণে যেতেও তিনি তৈরি থাকেন। এই চারজন ছাড়া ইন্দোনেশিয়ার দলে আছেন ফাং পারমাদি ও ব্যামবাং সুপ্রিয়াস্তো। হিসেব ওলটপালট করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে এই দু'জনের। বিশেষজ্ঞদের মতে, এবারের অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট হয়ে যেতে পারে ইন্দোনেশিয়ার ঘরোয়া প্রতিযোগিতা। ইন্দোনেশিয়ানদের চ্যালেঞ্জ জানাবেন ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ান, ডেনমার্কের দীর্ঘদেহী (ছ' ফুট তিন ইঞ্চি) খেলোয়াড় টমাস স্টুরে লাউরিডসেন, মালয়েশিয়ার রসিদ সিদেক এবং চিনের লিউজুন ও বাঁ-হাতি খেলোয়াড় যু ওয়েন কাই।

অ্যালান বুদি কুসুমা

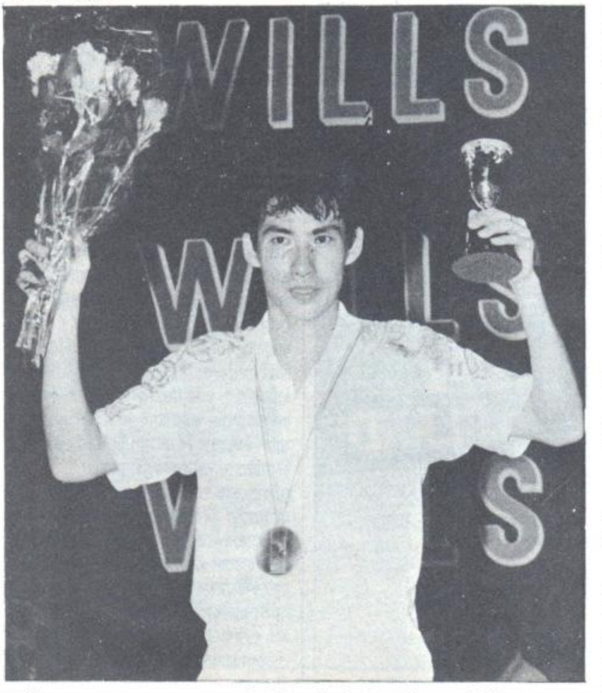

মহিলাদের বিভাগে ফেভারিট ২৩ বছর বয়সী সুসি সুশান্তি। ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় ভাষায় 'সুশান্তি' কথার অর্থ 'বাঘিনী'। নামের মর্যাদা রেখেছেন সুশান্তি। তিনি এখন সত্যিই বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে ত্রাসের মতো। বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের সব বড় খেতাবই জয় করেছেন তিনি। বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানশিপ জিতেছেন গত বছর। বিশ্বকাপের খেতাব জিতেছেন দু'বার, ১৯৮৯ ও ১৯৯৩ সালে। গ্রাঁ প্রি-র খেতাব জয় করেছেন চারবার (১৯৯০-'৯৩) এবং অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিন্টনের খেতাব তিনবার (১৯৯০, '৯১ ও '৯৩)। এবার জিতলে অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টনে সাতের দশকের জাপানের হিরো উকি-র পর প্রথম মহিলা হিসেবে চারবার খেতাব জয় করবেন সুশান্তি। ওলিম্পিকে সোনাও পেয়েছিলেন তিনি। হাতে আছে প্রায় সবরকম মারের ক্ষমতা। উচ্চতায় পাঁচ ফুট দু' ইঞ্চি হলেও কোর্ট কভার করেন তিনি অসাধারণ ক্ষিপ্রতায়। প্র্যাকটিস আর প্র্যাকটিস—এই তাঁর সাফল্যের মূল কথা। সপ্তাহে ছ'দিনই তিনি দৈনিক ছ'-সাত ঘণ্টা অনুশীলন করেন কোচ লিউ চুসিয়ার তত্ত্বাবধানে।

এবার সুশান্তির খেতাব জয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেন দক্ষিণ কোরিয়ার বাং সু হিউন। ওলিম্পিক, বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানশিপ ও অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে হিউন হেরে গিয়েছিলেন সুশান্তির কাছে। এ ছাড়া লড়াইয়ের মধ্যে আছেন চিনের তিন কন্যা—তাং জিউ হং, হুয়াং হুয়া ও ইয়ে ঝাওয়িং। সুইডেনের চিনা বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় লিম ঝাওকুইং দেখাতে পারেন এবার চমক। ইন্দোনেশিয়ার উঠতি তারকা ইউনি কারতিকা-র দিকেও নজর রাখতে হবে। সব মিলিয়ে বলা যায়, অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিন্টনে এবারও এশিয়ার প্রাধান্য অটুট থাকবে।

গত বছর কোন খেলোয়াড় সবচেয়ে বেশি আয় করেছেন ? সারা বিশ্ব খুঁজেও কোনও বিখ্যাত ফুটবল বা ক্রিকেট খেলোয়াড়কে পায়নি প্রখ্যাত 'ফরবেস' পত্রিকা। তালিকায় শীর্ষে আছেন বাস্কেটবল খেলোয়াড় মাইকেল জর্ডন। জর্ডনের আয় আনুমানিক ৩৬ মিলিয়ন ডলার। বক্সার রিডিক বো আছেন দ্বিতীয় স্থানে। তাঁর আয় হয়েছে ২৫ মিলিয়ন ডলার। ফরবেস পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী ধনীদের তালিকায় তৃতীয় হলেন ফর্মুলা-ওয়ান কার ড্রাইভার আয়ারটন সেনা। তাঁর আয় ছিল গত বছর ১৮.৫ মিলিয়ন ডলার।

জেনিফার ক্যাপ্রিয়তি আপাতত টেনিসকে বিদায় জানিয়েছেন। ১৭ বছরের তরুণী আঘাত পাওয়ার জন্য টেনিস থেকে সরে যাচ্ছেন না, তাঁর এখন একমাত্র লক্ষ্য, স্কুলের গণ্ডি টপকানো। ১৩ বছরেই টেনিস-বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিলেন এই কিশোরী, ১৪ বছর বয়সে রেকর্ড গড়েন সবচেয়ে কমবয়সী হিসেবে গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উঠে, ওলিম্পিকে স্বর্ণপদক জেতেন মাত্র ১৬ বছর বয়সে। টেনিস থেকে কোটি-কোটি টাকা ইতিমধ্যেই উপার্জন করেছেন ক্যাপ্রিয়তি, কিন্তু তাঁর এখন মনে হয়েছে আগে পড়াশোনা, তারপর খেলা। ক্যাপ্রি জানিয়েছেন, হাই স্কুলের পড়া শেষ না করে তিনি কিছুতেই টেনিসে ফিরবেন না। তাঁর মতে, টেনিস খেলার সময় আছে, কিন্তু এখন পড়াশোনা না করলে তিনি আর এ সময়টা ফেরত পাবেন না। তাই গত সেপ্টেম্বরে ইউ. এস. ওপেনে অংশ নেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত তিনি একটি টুর্নামেন্টেও খেলেননি। কবে আবার ম্যাচে ফিরবেন ক্যাপ্রি, তা জানাতে পারেননি তাঁর বাবাও। তবে মেয়ের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন স্টেফানো ক্যাপ্রিয়তিও।

প্রখ্যাত কোচ ও. এম. নাম্বিয়ার জানিয়েছেন, কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ভারতকে বিশ্বসেরা অ্যাথলিট উপহার দেবেন। এশিয়ার সেরা দৌড়বীর পি. টি. উষাকে তৈরি করেছিলেন নাম্বিয়ারই। নাম্বিয়ার জানান, তিন বছরের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকজন ভাল অ্যাথলিট তৈরি করতে পারবেন বলে আশা করছেন। ১৩-১৪ বছরের সাত- আটজন কিশোরীকে তিনি ট্রেনিং দিচ্ছেন। এদের মধ্যে কয়েকজনের সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল। কয়েক মাসের মধ্যেই এই কিশোরীরা কেরলের রাজ্য চ্যাম্পিয়ানশিপে তাঁদের গ্রুপে যেমন জিতেছে, তেমনই লখনউতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় স্কুল গেমসেও পদক পেয়েছে। ৫৯ বছরের দ্রোণাচার্য পুরস্কারে সম্মানিত কোচ নাম্বিয়ারের কথা, "আমি আর একজন উষা তৈরি করতে চাই না। আমার লক্ষ্য বিশ্বসেরা অ্যাথলিট তৈরি।" নাম্বিয়ার দুঃখ করেছেন, ভারতে প্রতিভার অভাব নেই, কিন্তু অধিকাংশ অ্যাথলিটই কঠোর পরিশ্রম করতে চায় না। উষা ছিলেন ব্যতিক্রম, তিনি পরিশ্রমের সঙ্গে-সঙ্গে শৃঙ্খলাও রক্ষা করে চলতেন। নবীনদের মধ্যে, নাম্বিয়ারের মতে, এস. বি. শৈল এবং বীণা অগাস্টিন নাম করতে পারেন। এঁরা প্রতিভাবান।

টেনিস-তারকা জিম কুরিয়ার আছেন নবম স্থানে। তাঁর রোজগার অবশ্য টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বাধিক। ১৯৯২ সালে এই স্থানটি ছিল আন্দ্রে আগাসির। কুরিয়ারের আয় গত বছর ছিল ১২.৬ মিলিয়ন ডলার। স্টেফি গ্রাফ আছেন পঞ্চদশ স্থানে। তবে মহিলা টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনিই প্রথম, স্টেফির আয় ৯.৫ মিলিয়ন ডলার। নামকরা কোনও ফুটবল খেলোয়াড় গত বছর তেমন কোনও রোজগার করতে পারেননি বোঝা যাচ্ছে।

❑

ডেনিস লিলির প্রতিবাদে শেষপর্যন্ত হয়তো কাজ হতে চলেছে। জুলাই মাসে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের বৈঠক বসছে লন্ডনে। সেখানেই লিলির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হতে পারে। লিলি বলেছিলেন, এখন ফাস্ট বোলাররা

ওভারপিছু একটা বাউন্সার দিতে পারে। এটা অন্যায়। এতে ফাস্ট বোলারদের যথার্থ শক্তি প্রতিফলিত হয় না। ওভারপিছু অন্তত দু'টি বাউন্সার দিতে দেওয়া উচিত। তাতে ব্যাটস্ম্যান-বোলারের লড়াই জমে যাবে। লিলির প্রস্তাবটি ক্রিকেটের স্বার্থেই বেশ আকর্ষক।

বিশ্বকাপে মাঝমাঠের সেরা হবেন কে

মাঝমাঠের শ্রেষ্ঠত্বের ওপরে বেশিরভাগ সময়ে নির্ভর করে দলের জয়। বিশ্বকাপে এই শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবেন কে ? আলোচনা করেছেন **তানাজি সেনগুপ্ত**

'ইতালিয়া নাইনটি' বিশ্বকাপে জিতেছিল পশ্চিম জার্মানি। প্রথম থেকে শেষ ম্যাচ পর্যন্ত জার্মানি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে গেছে একটি বিভাগে। সেটি তাদের মাঝমাঠ। অনেকেরই মনে আছে, জার্মানির অধিনায়ক লোথার ম্যাথাউসের নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মানি কী দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছিল ! দলটির খেলা কেমন হবে, ভাল না মন্দ, তা অনেকটাই নির্ভর করে মাঝমাঠের ওপর। মিডফিল্ডের খেলোয়াড়রা যদি খেলা ধরে নেন, তবে বিপক্ষের আক্রমণ অনেকটা নিস্তেজ হয়ে যায়। অন্যদিকে আক্রমণও তৈরি হয়ে যায় মাঝমাঠকে কেন্দ্র করে। ফরওয়ার্ডদের সামনে গোলের রাস্তা খুলে দিতে পারেন মিডফিল্ডাররা। এবারের বিশ্বকাপে এইরকম নজরকাড়া ফুটবল খেলতে পারেন কে-কে ? তালিকায় আছেন অনেকেই, জার্মানির ম্যাথাউস ছাড়াও টমাস হেসলার, আন্দ্রেয়াস মোয়েলার, বেলজিয়ামের অভিজ্ঞ এনজো শিফো, রুমানিয়ার জিওর্জি হাজি, ব্রাজিলের অধিনায়ক রাই, ইতালির রবার্তো দোনাদোনি, নরওয়ের লারস বোহিনেন এবং কলম্বিয়ার কার্লোস ভালদেররামা। আহত থাকার জন্য প্রায় পুরো একটা মরসুম মাঠের বাইরে কাটানোর পর আবার দুর্দান্তভাবে ফিরে এসেছেন জার্মানির লোথার ম্যাথাউস। জার্মানির হয়ে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবার রেকর্ড গড়েছেন তিনি। এতদিন এই রেকর্ড ছিল বেকেনবাওয়ারের। তিনি ১০৩টি ম্যাচ খেলেছিলেন। ৩৩ বছরের ম্যাথাউস শুধু জার্মানির নয়, বিশ্বের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার। পশ্চিম জার্মানির নিয়মিত ফুটবলার তিনি। দীর্ঘদিন ধরে নিজের জায়গাটি সুরক্ষিত রেখেছেন তিনি। বেকেনবাওয়ারের মতো 'শিল্পী ফুটবলার' নন ম্যাথাউস, তাঁকে এককথায় বলা যায় 'অসাধারণ পরিশ্রমী ফুটবলার'। অর্থাৎ তাঁর খেলা যত না দর্শনীয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর। মাঠে যে প্রান্তেই বল ঘোরাফেরা করুক না কেন, তার কাছাকাছিই

রবার্তো দোনাদোনি

দেখা যাবে ম্যাথাউসকে। বিপক্ষের আক্রমণকে তছনছ করে দেওয়ার জন্য তিনি সর্বদাই সক্রিয়। আক্রমণ ও রক্ষণ— দুটিতেই সমান দক্ষ ম্যাথাউস। গত বিশ্বকাপে তাঁর ব্যক্তিগত দক্ষতা ও নেতৃত্ব পশ্চিম জার্মানিকে ফিফা কাপ জয়ে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। প্রায় ছ' ফুট লম্বা এই ফুটবলারটির বয়স বাড়ার সঙ্গে অভিজ্ঞতাও বেড়েছে, দক্ষতায় কোনও ঘাটতি নেই। এবারের বিশ্বকাপেও তা প্রমাণ করবেন লোথার হারবার্ট ম্যাথাউস। জার্মানির আর-এক সেরা মিডফিল্ডার টমাস হেসলার। বিদ্যুদ্বেগে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে পারেন। অত্যন্ত স্টাইলিশ এই খেলোয়াড়। খেলা তৈরিতে তাঁর জুড়ি নেই। স্কিমারের ভূমিকায় তিনি সবচেয়ে বেশি সফল। হেসলারের দু' পায়ে আছে গোলার মতো শট। জার্মানির সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান পেয়েছেন হেসলার। বেকেনবাওয়ারের মতে, "হেসলার জার্মান দলের সেরা প্রতিভাবান খেলোয়াড়।" ২৬ বছরের এই ফুটবলার এখন ভাল ফর্মেও আছেন। গত বিশ্বকাপের মতো এবারের বিশ্বকাপেও হেসলার ম্যাথাউসের যোগ্য সঙ্গী হিসেবে জার্মানির মাঝমাঠকে নির্ভরতা দেবেন— তা এখনই বলা যায়। আর-এক মিডফিল্ডার আন্দ্রেয়াস মোয়েলারও চমৎকার ফর্মে আছেন। এক মরসুম জুভেন্টাসের সঙ্গে কাটানোর পর মোয়েলারের খেলায় অভাবনীয় উন্নতি দেখা গেছে। গোল করার দিকেও মোয়েলারের লক্ষ্য প্রচণ্ড। এবারের বিশ্বকাপে জার্মানির অন্যতম সেরা অস্ত্র হতে পারেন মোয়েলার।

বেলজিয়ামের অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার এনজো শিফোও ভাল খেলছেন। বিশ্বকাপের প্রাথমিক পর্বে মাঝমাঠকে যেমন তিনি নেতৃত্ব

এনজো শিফো

দিয়েছেন, তেমনই প্রয়োজনের মুহূর্তে গোল করে জয়ও এনে দিয়েছেন। শিফো এবার নিয়ে পরপর তিনবার বিশ্বকাপের ফাইনাল রাউন্ডে খেলবেন। এবারের বিশ্বকাপে এই কৃতিত্ব খুব কম খেলোয়াড়েরই আছে।
রুমানিয়ার জিওর্জি হাজি দুর্দান্ত ফর্মে আছেন। গত বিশ্বকাপেও তিনি ছিলেন রুমানিয়ার নায়ক। এবারও রুমানিয়ার মাঝমাঠের সাফল্য নির্ভর করছে তাঁর ওপরেই। ইউরোপের ফুটবল-বোদ্ধারা তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'কার্পেথিয়ান পর্বতের মারাদোনা'। হাজির খেলার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, ফরওয়ার্ডদের চমৎকার বল বাড়ানোয় তাঁর দক্ষতা। তাঁর এই দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারলে রুমানিয়ার ফরওয়ার্ডরা এবারের বিশ্বকাপে অঘটন ঘটাতে পারেন।
এবারের বিশ্বকাপের প্রাথমিক পর্বে দারুণ খেলেছে নরওয়ে। তারা একবার অন্তত হারিয়েছে হল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের মতো দলকে। গ্রুপে এত ভাল খেলার মূলে যে ক'জন খেলোয়াড় আছেন তাঁদের অন্যতম মিডফিল্ডার লার্স বোহিনেন। এবারের বিশ্বকাপে তিনি তাঁর 'স্কিল' দেখিয়ে সকলের নজর কাড়বেন বলেই নরওয়ের সমর্থকদের বিশ্বাস।
ব্রাজিলের অধিনায়ক রাই বেশ কিছুদিন ধরেই ভাল ফর্মে আছেন। ২৯ বছরের রাই প্রখ্যাত ফুটবলার সক্রেটিসের ভাই। দাদার মতোই তিনি খেলেন মাঝমাঠে। খেলার স্টাইলও একরকম, আক্রমণাত্মক খেলাই পছন্দ করেন। গোল করাও পছন্দের। প্রাথমিক পর্বের কয়েকটি ম্যাচে রাইয়ের খেলা ব্রাজিলকে জিততে দারুণ সাহায্য করেছে। আমেরিকাতেও আসন্ন ফাইনাল রাউন্ডে রাই দলকে নির্ভরতা দেবেন বলেই মনে হয়।
রাইয়ের সতীর্থ কার্লোস দুঙ্গাও মাঝমাঠের সেরা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেন। প্রচণ্ড পরিশ্রমী ফুটবলার দুঙ্গা। ইতালিয়া নাইনটিতে চমৎকার খেলেছেন তিনি। এখনও ব্রাজিল দলে দুঙ্গা প্রায় অপরিহার্য।
ইতালির রবার্তো দোনাদোনিও মিডফিল্ডার হিসেবে এবার সেরা হতে পারেন। দোনাদোনি মাঝমাঠে খেলেন বটে, কিন্তু খেলেন সারা মাঠ জুড়ে। এ. সি. মিলান দলের এই মিডফিল্ডারের অক্লান্ত পরিশ্রম, মাঠ জুড়ে দৌড়নোর ক্ষমতা, নিখুঁত পাস বাড়াবার দক্ষতা এবারও ইতালির বড় ভরসা।
কলম্বিয়ার কার্লোস ভালদেররামা স্কিমার

টমাস হেসলার

হিসেবে এবার সবচেয়ে সফল ফুটবলার। কলম্বিয়াকে বিশ্বকাপের ফাইনাল রাউন্ডে নিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব তাঁর। একমাথা ঝাঁকড়া সোনালি চুলের ফুটবলারটি কলম্বিয়ার প্রায় সব গোলেরই রূপকার। আর্জেন্টিনার মতো বিশ্বসেরা দলও এই মিডফিল্ডারটির দক্ষতার কাছে হার স্বীকার করেছে। শারীরিক শক্তি নয়, প্রখর

জিওর্জি হাজি

রাইকার্ড

ফুটবল-বোধ, ড্রিব্‌ল করার দক্ষতা এবং অসাধারণ টাচ প্লে-র গুণে ভালদেররামা কলম্বিয়ার সেরা অস্ত্র হয়ে উঠেছেন। কলম্বিয়া দলটির বড় ভরসা মাঝমাঠের এই নায়ককে ঘিরে। আক্রমণ ও রক্ষণের সঠিক সংযোগ রক্ষা করে ভালদেররামা দেখিয়ে দিয়েছেন প্রকৃত মাঝমাঠের ফুটবলারের ভূমিকা। এবারের বিশ্বকাপে তাঁর দিকে নজর থাকবে সকলের।
সবশেষে, মাঝমাঠের আরও দুই সেরা-র কথা বলতে হবে। মারাদোনা এবং রাইকার্ড। দু'জনেই এবারের বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত অনিশ্চিত। মারাদোনা যদিও প্রাথমিক পর্বের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ম্যাচে যথেষ্ট ভাল খেলেছেন, তবু ৩৩ বছরের এই সুপারস্টার শারীরিক কারণেই আমেরিকায় সেরকম খেলতে পারবেন না বলে অনেকের ধারণা। তবে 'ফুটবলের রাজপুত্র' মারাদোনা মাঠে নামলে এখনও যে সেরা হতে পারেন, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। শিল্পের ঝলকে এখনও মাতিয়ে দিতে পারেন মারাদোনা। হল্যান্ডের অসাধারণ মিডফিল্ডার ফ্রাঙ্ক রাইকার্ডও চোট-আঘাতের সমস্যা কাটিয়ে যদি দলে নির্বাচিত হন, তবে তাঁরও দক্ষতার পরিচয় পাব আমরা।
এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলে লড়াই হবে যেমন এক সেরা দেশের সঙ্গে অন্য সেরা দেশের, তেমনই লড়াই হবে বিশ্বসেরা মিডফিল্ডারদের মধ্যেও। সেই লড়াই যে উপভোগ্য হয়ে উঠবে এতে কোনও সন্দেহ নেই।

খেলার অঙ্ক

মিশরে বহু প্রাচীনকালে আবিষ্কৃত হয়েছিল ছক্কা। এই ছক্কা নিয়েই নতুন খেলা

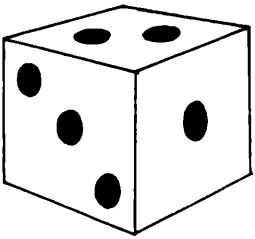

একটা লুডোর ছক্কা ওপরের ছবির মতো বসানো আছে। প্রশ্ন হল, ২ ফোঁটা বা পয়েন্টের নীচে, অর্থাৎ একেবারে তলায় কোন সংখ্যাটি আছে ?
উত্তর খুবই সোজা, ঠিক উলটো দিকে থাকবে ৫। ছক্কার সংখ্যাগুলো বা ফোঁটাগুলো এমনভাবে সাজানো হয়, যাতে দুটো বিপরীত দিকের যোগফল সবসময় হয় ৭। এবার একটা ছক্কা নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেই পরীক্ষা করে দেখা যায়, অবশ্য ছক্কাটি সঠিক হওয়া চাই। বাজারে অনেক সময় ভুল ছক্কাও বিক্রি হয়।
আমরা সাধারণত যে ছক্কা দিয়ে খেলি তা হল আকারে ঘন চতুষ্কোণ (cube)। কিন্তু এক সময় এই ছক্কার ছিল নানা ধরনের আকৃতি। যেমন, টেট্রাহেড্রন (tetrahedron), অকট্রাহেড্রন (octrahedron), ডোডিকাহেড্রন (dodecahedron) ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে প্রাচীন হল 'কিউবিকাল ডাইস', অর্থাৎ যে ডাইস বা ছক্কা আমরা এখন খেলার জন্য ব্যবহার করি। এই ডাইস প্রথম পাওয়া গিয়েছিল মিশরে। কিউবিকাল ডাইস আবার দু' ধরনের আছে, একটি হল 'অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ' (anti clockwise) এবং অন্যটি হল 'ক্লকওয়াইজ' (clockwise).

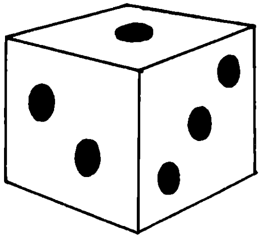

অ্যান্টিক্লকওয়াইজ

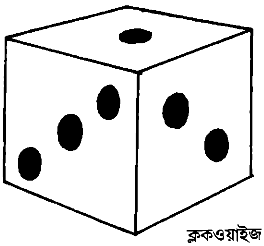

ক্লকওয়াইজ

যেটি হল অ্যান্টিক্লকওয়াইজ ডাইস, তার ওপরে যদি ১-এর ফোঁটা রাখা যায় তা হলে ২ ফোঁটাটি থাকবে বাঁ দিকে, তেমনই ক্লকওয়াইজ ডাইস-এর ১ ফোঁটাটি ওপরে রাখলে ২-এর ফোঁটাটি থাকবে ডান দিকে। এই দু' ধরনের ডাইসের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত হল অ্যান্টিক্লকওয়াইজ ডাইস। আর ক্লকওয়াইজ ডাইসটি একটিমাত্র জাপানি খেলাতেই ব্যবহার করা হয়, যে খেলার নাম 'Mah-jongg'. Lewis Carroll-এর 'Alice in wonderland' একটি বিখ্যাত বই। সেখানে অ্যালিস বলছে, এ ছক্কা উলটো দিকে ঘোরে "goes the other way."

এই ছক্কা দিয়ে অসংখ্য বোর্ড গেম যেমন খেলা যায়, তেমনই ছক্কা দিয়ে নানারকম অঙ্কের জাদুও দেখানো যায়। এখন একটা মজার খেলা শেখানো যাক। এর জন্য লাগবে তিনটি একই মাপের ছক্কা। ইচ্ছে করলে বোর্ড দিয়ে বড় করে ছক্কা তিনটি তৈরি করে নেওয়া যায়। এইবার পর-পর তিনটি ছক্কা নীচের ছবির মতো সাজাও।

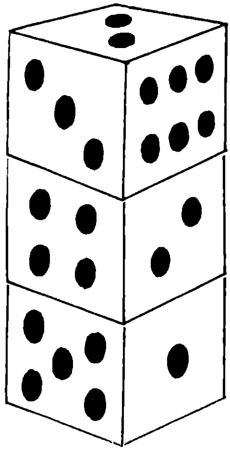

একটা ছক্কার ছ'টা পিঠ। তিনটি ছক্কার ৬×৩=১৮টা পিঠ। এইভাবে ছক্কা তিনটি রাখলে ১৮টা পিঠের মধ্যে ১৩টা পিঠ দেখা যায়, কিন্তু ৫টা পিঠ ভেতরে ঢাকা থাকে, কোনওভাবেই তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। একেবারে ওপরের পিঠে আছে ২ ফোঁটা। এবার প্রশ্ন করা যেতে পারে, যে পাঁচটা পিঠ বা তল আমরা দেখতে পাচ্ছি না, সেই পিঠগুলির ফোঁটা বা পয়েন্টের যোগফল কত ? উত্তর খুব সোজা। আমরা জানি, ছক্কা যেমনভাবেই রাখা হোক না কেন, দুই বিপরীত পিঠের যোগফল ৭। অতএব ৭×৩=২১ হবে। এর মধ্যে ওপরের পিঠের ফোঁটা-টি দেখা যাচ্ছে। সেটি হল ২। অতএব ২১—২=১৯।
তেমনই ওপরের ফোঁটা যদি ৪ অথবা ৫ যা'ই থাকুক, সেটা ২১ থেকে বিয়োগ দিলেই উত্তর পাওয়া যাবে।

শুভঙ্কর

ছবি : দেবাশিস দেব

অরণ্যদেব লি ফক

অরণ্যদেবের বন্দুক !
ওঁর কাছে যেতে হবে !
আপনি···ভাল আছেন ?
বাঘ কোথায় ?
খাসা আছি । বাঘ চলে গেছে ।
আমি ওকে মারতে চাইনি । চমৎকার জানোয়ার । ওর গা থেকে তোমার বর্শার ফলাটা তুলে নিয়েছি ।
ওকে ছেড়ে দিলেন ?
ও ফিরে এসে আমাদের খাবে··· গোরু-ছাগল চুরি করবে···
না··· ও ফিরে আসবে না ।
গুলি ছুড়ে ওকে তাড়াবার আগে ওর গলায় হাত রেখেছিলুম । ওর গলায় একটা জিনিস ছিল । একটা কলার ।
কলার ? !
ও কারও পোষা । যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে যাচ্ছে···
পোষা··· সে কে··· কোথায় ?
জানি না, ওয়াম্বো । এটা এক রহস্য··· খোঁজ নিতে যাচ্ছি···
??
7-12

অরণ্যদেব লি ফক

জখম বাঘের গা থেকে বর্শার ফলা তুলে ফেলতে গিয়ে... অপ্রত্যাশিত কিছু...
ওকে মেরে ফেলেননি? ও ফিরে আসবে !
না...ও চলে গেছে ! ওর গলায় একটা কলার ছিল ! ও ঘরে ফিরে গেছে... ঘর যেখানেই হোক ।
আমাদের বনে বাঘ...গলায় কলার পরা ?
ওকে খুঁজে পেতেই হবে...সেইসঙ্গে উত্তরটাও !
তিনি বাঘের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে চললেন...
বর্শার ক্ষত থেকে এখনও রক্ত ঝরছে....
অনেকদিন পরে হঠাৎ শিকার ধরেছে...
ক্ষত শুকোচ্ছে...খাওয়ার জন্য এখানে থেমেছিল...
এবার গতি বাড়িয়েছে...ও যেখানেই যাক...মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি যেতে চাইছে ।
স্বাগত, অরণ্যদেব !
বড় একটা ডোরাকাটা বেড়ালের মতো জন্তুর পিছু নিয়েছি... জন্তুটাকে বাঘ বলে ...ওকে দেখেছ ?
7-19
ভুতুড়ে বাঘ ! পিছু নেবেন না ।
ফিরে যান ।
ওদের মারা যায় না ।
ওদের ?
(ক্রমশ)

গল্প

শিবায়ন ঘোষ

এখন দুঃখ করার কোনও মানে হয় না

বনের সবাই তাকে 'কানা হরিণ' বলে ডাকে। কানা তো আর কেউ শখ করে হয় না, ভাগ্য তাকে কানা করে দিয়েছে। যাচ্ছিল বাঘের পেটে, হঠাৎ দৌড়তে পেরেছিল ঠিক সময়ে, তাই শেষ অবধি প্রাণে বেঁচে গেল।

এখন ইচ্ছে করেই সে তার প্রতিবেশীদের এড়িয়ে যায়। বনের এক প্রান্তে, লোকালয় ছেড়ে এখানেই থাকে এখন।

চারদিকে ঘন বন। খয়ের, শাল, শালারু, গর্জন, তেজপাতা, আরও কত কী নাম না জানা গাছগাছালি। আর বুনো লতাপাতা তো কতই আছে। ঠিক তার মাঝখানে একটা ঝরনা। সেই ঝরনার কাছে শুয়ে-শুয়ে নিজের দুঃখে নিজেরই তার মরতে ইচ্ছে করে। তবু যতদিন বেঁচে আছে, এভাবেই থাকতে হবে।

ঠিক এমনই সময়ে তার সঙ্গে হঠাৎ করে পরিচয় হয় একটা খোঁড়া ঘোড়ার। সামনের ডান দিকের একটি পা খোঁড়া। ডান দিকটায় ঝাঁকুনি দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সে-ও এসে দাঁড়ায় ঝরনার কাছে, একটু জল খাবে। এতখানি পথ হেঁটে বড় ক্লান্ত সে। তো জলটল খেয়ে সে যখন বনের দিকে হেঁটে যাবে-যাবে করছিল, গলা উঁচু করে হরিণ তাকে ডাকল। বলল, "এই ভাই, এদিকে এসো, কথা আছে!"

ঘোড়াটা চোখ তুলে দেখল, অল্প হেসে বলল, "ডাকছ ভাই?"

কানা হরিণ বাঁ চোখ নাচিয়ে বলল, "হুঁ।"

ডান চোখ তার কানা। তার সব চোখের কথা বাঁ চোখে। বলল, "তোমার অবস্থাও দেখলাম আমার মতো। কত কষ্ট করেই না হাঁটছ তুমি?"

ঘোড়া একটু হেসে বলল, "হুঁ, তা আর কী করব ভাই। ভাগ্য, এসব নিছক কপালদোষ। নইলে এককালে বন কাঁপিয়ে ছুটে বেড়াতাম, আর আজ এই হাল! কপালদোষ ছাড়া আর কী?"

হরিণ খুব আন্তরিকতা মিশিয়ে বলল, "তোমাকে তো ভাই আগে কখনও এখানে দেখিনি? মুখটাও তেমন চেনা-চেনা লাগছে না।"

ঘোড়া মনখারাপ-করা গলায় বলল, "দেখবে কী? কোথায় ছিলাম, আর আজ কোথায় আছি! ছিলাম রাজার হালে, দশ-দশটা লোক আমার দেখাশোনা করত, আর আজ একা, একেবারে একা!"

হরিণ ওর কষ্টটা অনুভব করল। বলল, "আমারও দ্যাখো না একই হাল। বেশ আনন্দে ঘাস খাচ্ছিলাম, লতাপাতা খাচ্ছিলাম, হঠাৎ শত্তুর লেগে গেল!"

"কীরকম?"

"আরে ভাই, সুখে কি আর থাকার উপায় আছে? আমি বলি, বনে যদি থাকতে হয় তো বাঘ-সিংহ হও, হরিণ-বনমুরগি হোয়ো না!"

"তা যা বলেছ ভাই! জলে থাকলে তিমি হওয়া ঠিক, নইলে ঝাঁক বেঁধে পিরান্‌হা! শত্রু, শত্রু, চারদিকে শত্রু!"

হরিণ ফিক করে একটু হাসল। তারপর বলল, "দোষটা একটুখানি আমারও। বোঝা উচিত ছিল, ঘাস লতাপাতা খেতে-খেতেও একটু আগে-পিছে দেখতে হয়। সেইটেই হল ভুল। হঠাৎ কোত্থেকে একটা চিতাবাঘ করল সই তাড়া! তা আর কী করি, হুড়মুড় করে দৌড়তে-দৌড়তে যা হোক প্রাণে বেঁচে গেলাম, কিন্তু একটা শুকনো গাছের ডাল যে ওরকম বিষচোখে তেরছাভাবে তাকিয়ে ছিল, কে জানে! লাগল জোর খোচা, সেই থেকে ডান চোখটা আমার নষ্টই হয়ে গেল!"

ঘোড়াটা বেশ ভারী গম্ভীর গলায় দার্শনিক ভঙ্গিতে বলল, "তবু তো জগৎ দেখার জন্যে একটা চোখ আছেই?"

বলে, একচোখ বন্ধ করে আবার যোগ করে দিল, "এক চোখেও সব দেখা যায়— ফুল, পাখি, গাছপালা, ঝরনার স্রোত— সব কিছু! এই তো, আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি। ওই ওদিকে একটা শালগাছের ডালে শকুন বসে আছে না?"

হরিণ বলল, "হ্যাঁ।"

"তবে দেখেছ, এক চোখেও বেশ দেখা যায়— রোদ ঝকঝকে, বৃষ্টি ভিজে-ভিজে, ঝরনা আঁকাবাঁকা..."

হরিণ ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, "যায়, কিন্তু সেরকম কি আর দেখা যায়? কোথায় এক চোখ, আর কোথায় দু' চোখ— এক হয় কখনও? কখনও না।"

ঘোড়া মাথা নাড়ায়, "তা অবশ্য ঠিক!"

"তা ছাড়া মুখের একটা সৌন্দর্য আছে তো! ঝরনার জলে মুখ বাড়িয়ে দেখতেও ইচ্ছে করে না, নিজেকে দেখে বড্ড কষ্ট হয়, মনে হয় দেহের সব সৌন্দর্য বুঝি চোখে।"

হরিণ তার খেদটাকে স্পষ্ট করল। ঘোড়া তার ডান-পা-টাকে দেখিয়ে দুঃখের সঙ্গে বলল, "দ্যাখো না আমার পা-টা। দৌড়নো তো দূরের কথা, এখন হাঁটতে গেলে জিভ বেরিয়ে যায়। তবু শান্তি এইটুকু, এখন অন্তত পরের ফাইফরমাশ আর খাটতে হচ্ছে না! রাজার বাড়িতে থাকার যে কী যন্ত্রণা, যদি বুঝতে! রাজা লোকটি খুব একটা মন্দ ছিল না, কিন্তু তার লোকগুলি এক-একটা মিচকে শয়তান। যখন-তখন, কারণে অকারণে ধরে-ধরে পেটাত! দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পেতাম, কিন্তু কী মনে হত জানো?"

হরিণ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

"মনে হত, বিষও বোধ হয় ওর চেয়ে মিষ্টি! তাই একদিন অন্ধকার থাকতে রাজার বাড়ি ছেড়ে পালালাম। দিন পাঁচ-ছয় হল এই বনে আছি। এই ঝরনায় জল খেতে আজই প্রথম এলাম!"

হরিণ অবাক হয়ে তার কথাগুলো শুনে বলল, "তাই দেখা হয়নি! নতুন এসেছ তো! তো হ্যাঁ, ভাল কথা, থাকো কোথায়?"

ঘোড়াটা দুঃখের মধ্যেও বেশ খুশি-খুশি গলায় উত্তর দেয়, "সেও এক মজার কান্ড! আছি একটা শিম্পাঞ্জির বাড়ি! খুব কাছেই! তা ধরো এখান থেকে আধ-মাইল-খানেক হবে।"

শিম্পাঞ্জির বাড়ি? হরিণ যেন গাছ থেকে পড়ল। ঘোড়াটা বলে কী? ঘোড়া কিনা থাকে শিম্পাঞ্জির বাড়ি? কেমন এক আজগুবি গন্ধ পেল ও। জিজ্ঞেস না করে আর পারল না, "অদ্ভুত কথা তো! শিম্পাঞ্জির বাড়ি! তুমি ভাই নিশ্চয়ই রগড় করছ?"

"উহু, একদম না! সত্যিই আমি একটা শিম্পাঞ্জির বাড়িতেই আছি এবং বেশ বন্ধুর মতন আছি।"

"তা ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হল কীভাবে?"

"সে অনেক কথা! বললে বিশ্বাস হবে না, চোখে দেখতে হবে।"

কেমন রহস্য খেলিয়ে হেসে বলল ঘোড়াটা!

হরিণ প্রশ্ন করে, "তবু বলো না কেন, একটু শুনি।"

ঘোড়া চোখ মটকে বলল, "শুনবে?"

হরিণ ছোট্ট করে 'হুঁ' করল।

ঘোড়া প্রস্তাব করল, "তা চলো না কেন, আমাদের বাড়িই চলো। রাতটা না হয় ওখানেই থাকবে!" হরিণ প্রথমটায় যাবে না ভেবে বলল, "পরিচয় যখন হল, যাব তো বটেই, তবে আজ না, অন্য কোনওদিন।"

"সে আবার করে? চলো, দেখলেই বুঝবে, যেতে যতটুকু কষ্ট, বন্ধুকে দেখলে তোমার ভালই লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। চলো, চলো!"

ঘোড়া নাছোড়। ও ছাড়তেই চাইছে না। প্রায় হাত ধরে টানাটানিই শুরু করে দেয়। বাধ্য হয়ে একরকম হরিণ সম্মত হয়ে বলে, "বেশ, এত যখন বলছ, তবে চলো, তোমার নতুন বন্ধুকে দেখেই আসি।"

যেতে-যেতে ঘোড়া বলল, "আমার নতুন বন্ধু কিন্তু আমাদেরই মতো, সেও খুব বুড়ো হয়ে গেছে, এবং কুঁজো। লাফ-ঝাঁপ দেওয়া তো দূরের কথা, এখন একটা থাম্বা বাঁশের লাঠি ছাড়া সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারে না!"

"তাই?" হরিণের বেশ আনন্দ হল। বলল, "একদিক থেকে ভাল, আমরা তিনজনই বড় কষ্টে বেঁচে আছি। আমি কানা, তুমি খোঁড়া, তোমার বন্ধু কুঁজো— জীবনে হেরে যাওয়ার চিহ্ন। সবারই অনেকখানি করে দুঃখ আছে, কেউ আর কাউকে ভেংচি কাটবে না।"

ঘোড়া বিস্মিত হয়ে তাকাল। সে ঠিক বুঝল না। পরে প্রশ্ন করল, "ভেংচি কাটবে কেন?"

হরিণ চটপট উত্তর দেয়, "কাটে ভাই, কাটে! কেন, এই আমাকে দ্যাখো না, কত সুখের দিন ছিল, বউ ছিল, বাচ্চা ছিল, আমার বাড়িতে তখন কত বন্ধু ছিল, খাওয়াদাওয়া হই-হল্লা কত কী! যেই কানা হয়ে গেলাম, সবাই তাচ্ছিল্য করতে শুরু করল। আমার নামটাই হয়ে দাঁড়াল কানা হরিণ। আরে, হাতে করে বড় করে তোলা পুঁচকে-পুঁচকে বাচ্চাগুলো অবধি দাদুর বয়েসি এই আমাকে পথেঘাটেও দেখে বলে কিনা কানা হরিণ। যেন কানা বলে আমার আর মানসম্মান কিছু নেই।"

হরিণের চোখ ছলছল করে উঠল। ঘোড়াটা তাকে বেশ নরম গলায় সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "ওসব যুগের নিয়ম, ও নিয়ে মনখারাপ করলে কষ্ট বাড়বে বই কমবে না। ওসব ভেবো না ভাই।"

হরিণ দুঃখটাকে সামলে নিয়ে চোখ মুছে বলল, "ভাবতে চাইনে, কিন্তু অটোমেটিক ভাবনাটা এসে যায়।"

বলে স্বভাবমতো জোর একটা লাফ দিয়ে কুড়ি-বাইশ গজ এগোল। তাই না দেখে ঘোড়া বলল, "আস্তে ভাই, আস্তে। পাশাপাশি হাঁটো, তুমি দেখছি আমার কথাটা ভাবছই না। আমি কি আর আগের মতো তত জোরে ছুটতে পারি?"

তা ঠিক! হঠাৎ লাফ দিয়ে ফেলে ও এখন লজ্জা পেল। দাঁতে জিভ কেটে বলল, "আই অ্যাম ভেরি সরি, ফ্রেন্ড।"

ঘোড়া মৃদু হেসে বলল, "তোমার কোনও দোষ নেই, এতদিনের অভ্যেস তো হাজার হোক!"

কষ্টের মধ্যে ঘোড়ার কথা বলার ধরন দেখে হরিণ হেসে ফেলল। বলল, "তুমি তো বেশ হাসাতে পারো?"

"হ্যাঁ, তা আর পারব না? একসময় তো আমাকে সবাই রগড়দাদু, রগড়কাকু, রগড়জেঠু বলে ডাকত। কত মজার-মজার গল্প বলতাম, সেসব এখন স্মৃতি।"

ঘোড়া কেমন আফসোস করল।

দু'জন বনের মধ্যে হাঁটতে-হাঁটতে এগোচ্ছে।

কিছুদূর এসে ঘোড়া বলল, "একটু দাঁড়াও ভাই এখানে। দ্যাখো কেমন ছায়া চারদিকে, আঃ, বুক জুড়িয়ে যায়।"

বলে, একটা বড় জারুলগাছের নীচে এসে দাঁড়াল। হাঁসফাঁস অবস্থা তখন ঘোড়ার, হরিণকে উদ্দেশ করে বলল, "একসঙ্গে অনেকখানি হাঁটতে পারিনে, একটুকুতেই ক্লান্ত হয়ে যাই।"

ঘোড়ার শরীরের অবস্থা হরিণের জানা হয়ে গেছে। সত্যি! তার যদি চারটে পায়ের একটা খোঁড়া হত! সে ভারী কষ্টের হত! নিজের কষ্টের চেয়ে এখন তার কাছে ঘোড়ার কষ্টটাই বড় হয়ে উঠল। সহানুভূতির সঙ্গে জানাল, "ঠিক আছে, একটু বিশ্রাম নাও।"

ঘোড়াটা চিত হয়ে শুয়েই পড়ল। বলল, "বিশ্রাম আমার এই— পাগুলোকে একটু বিশ্রাম দিই। মাঝে-মাঝে, কী বলব, মরে যেতে ইচ্ছে করে।"

"বালাই ষাট! ওসব বলে না, ওসব অলুক্ষুনে কথা মুখেও আনবে না।"

হরিণ ওর মনোবল বাড়াতে চেষ্টা করে।

ঘোড়াটা যেন একটু উৎসাহ পেয়েছে, এরকমভাবে বলল, "বেশ, আর বলব না, কিন্তু সত্যি-সত্যি একবার ভেবে দ্যাখো তো! তবু তো আগে ভাবতাম আমিই বুঝি এখানে সবচেয়ে দুঃখী, এখন শিম্পাঞ্জিটাকে দেখে, তোমাকে দেখে, তবু বুঝতে পারছি, আমার কষ্ট তো তুচ্ছ!"

হরিণ ওর কথা শেষ হতেই বলল, "তা যা বলেছ বন্ধু! আমারও ওরকমই মনে হত। এখন তবু তোমাকে দেখে ভাবছি, কত কষ্ট তোমার!"

ঘোড়াটা ম্লান হেসে বলল, "বাড়িতে চলো, ওকে দেখে আরও বুঝবে, কষ্ট ঠিক কাকে বলে!"

একটু বিশ্রাম নিয়ে ঘোড়া আবার উঠে

পড়ল। কিছুদূর হেঁটেই ওরা পৌঁছল শিম্পাঞ্জির বাড়ি। বাড়ি মানে নিছক মাটির দোচালা। লতাপাতা দিয়ে তৈরি। বুনো গাছগাছালির ডাল ভেঙে বাড়িটা করেছে অবশ্য বেশ ভাল।

বাড়ির চারদিকে এক শান্ত পরিবেশ, বেশ মনোরম। দু-একটা দলছুট পাখির ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

বাড়ির উঠোনে এসে গলা চড়িয়ে ডাকল ঘোড়াটা, "কালুভাই, ও কালুভাই!"

কালু ভাই! এ আবার কেমন ডাকনাম! হরিণ জিজ্ঞাসার চোখে তাকাতে ঘোড়া বলল, "ওর ডাকনাম। জাতি তুলে তো আর ডাকা যায় না, সেভাবে বললে শুনতে মন্দও লাগে। ধরো, আমাকে যদি সবসময় 'ঘোড়া, এই ঘোড়া, হেই ঘোড়া, আরে হেইই ঘোড়া' বলে কেউ ডাকে, কিংবা তোমাকে যদি 'হরিণ-হরিণ' বলে ডাকে, কেমন শ্রুতিকটু লাগবে না, তুমিই বলো?"

হরিণ মাথা নাড়িয়ে সমর্থন করল, "তা ঠিক।"

তাই তো ও নিজেই মশকরা করে বলল, "দ্যাখো ভাই, তুমি তো একটু লাল-লাল দেখতে, তো তোমাকে যদি লালু ভাই বলে ডাকি, তুকি কি রাগ করবে?"

বলে, হরিণটার দিকে তাকিয়ে আবার যোগ করে দেয়, "বলো তো কীরকম কথা! আমি বললাম, রাগ করব কেন? তোমার যা ইচ্ছে, ডাকো। বন্ধুরা তো এরকম ভাবেই ডাকে। তো সেইদিন থেকে আমাকে ও লালু ভাই বলে, আর আমিও ওকে কালু ভাই বলি!"

তো কালু ভাই, অর্থাৎ শিম্পাঞ্জিটা বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সত্যি তার হাতে একটা বাঁশের লাঠি। লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "এঁকে তো ঠিক—"

কথাটা টেনে নিল ঘোড়া। পরিচয় করানোটা তার দায়িত্ব। বলল, "নতুন বন্ধু। ওরও ঠিক আমাদের মতন হাল। ঝরনার কাছে জল খেতে গিয়ে হঠাৎ দেখা হল। বড্ড ভাল লাগল ওকে, নিয়েই এলাম। তুমি রাজি হলে, আমি চাইছি, ও আমাদের কাছে থাক।"

শিম্পাঞ্জিটা বেশ ভাল। মনটা খুব উদার, সে তৎক্ষণাৎ বলল, "তো থাক। তুমি যখন সঙ্গে নিয়ে এসেছ, আবার জিজ্ঞেস করার কী আছে? ভালই হল, ছিলাম একা, তোমাকে পেয়ে দু'জন হলাম। এঁকে পেয়ে আজ থেকে আমরা তিনজন। আর আমাদের পায় কে?"

বলতে বলতে কথা ঘোরাল ও, বলল, "তা ওঁকে উঠোনে দাঁড় করিয়ে রাখলে কেন? ঘরে নিয়ে এসো।"

ঘোড়া অপ্রস্তুত। সত্যি, ভারী অভদ্রতা হল। আসলে শরীর তো গেছেই, সেইসঙ্গে মাথাটাও গেছে।

শিম্পাঞ্জি ঘরের ভেতর থেকে একটা শুকনো পাতা দিয়ে তৈরি গদি এনে বলল, "বারান্দায় বসবেন? কী সুন্দর চাঁদের আলো পড়েছে, আজ পূর্ণিমা, বাইরেটা লাগছেও বেশ ভাল।"

হরিণ কথা ঘুরিয়ে আচমকা বলল, "সবই তো হল, কিন্তু একটা কথা বলি, বন্ধুকে কি কেউ আপনি-আপনি করে?"

শিম্পাঞ্জি লজ্জা পেল। বলল, "প্রথম প্রথম একটু তো বাধো-বাধো লাগবেই, পরে ঠিক হয়ে যাবে, তখন কত আড্ডা, কত মজা।"

হরিণ বারান্দায় উঠে বসল। পাশে ঘোড়া। মুখোমুখি শিম্পাঞ্জি। শিম্পাঞ্জিই মুখ খুলল, "আমার ডাকনাম কালু, তো ইচ্ছে করলে, আপনি—"

'আপনি' বলেই যেন শর্তভঙ্গ হল এরকমভাবে নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বলল, "মানে তুমি আর কী! তো তুমি আমাকে স্বচ্ছন্দে কালু বলে ডেকো!"

"উঁহু, শুধু কালু না, কালু ভাই।"

শিম্পাঞ্জি নিঃশব্দে হাসল।

"তা তুমি তো শুনলাম খুব ভাল নামকরণ করতে পারো, আমারও একটা নাম দাও।"

"হুম, দাঁড়াও। আগে একটু তামাক খেয়ে নিই। আমার আবার তামাক না খেলে বুদ্ধি খোলে না, মাথায় কেমন বুদ্ধির গিঁট বেঁধে থাকে।"

বলে, শিম্পাঞ্জি নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল। সঙ্গে যোগ দিল ঘোড়া। সেও কেমন হ্যাকোড়া-হ্যাকোড়া করে হেঁড়ে গলায় হেসে উঠল। হরিণও হাসল একটু তাল মিলিয়ে।

শিম্পাঞ্জির তামাক খাওয়াটা বেশ। তারপর হাত ঝেড়ে গোঁফে হাসি ফুটিয়ে বলল, "নাম দিতে হবে তো? তা এ এমন কী কঠিন?"

ঘোড়া এবং হরিণ দু'জনে ওর মুখের দিকে তাকাল।

শিম্পাঞ্জি বলতে থাকে, "আমি কালো, আমার নাম কালু। ও হচ্ছে লাল-লাল, ওর নাম লালু। আমাদের হরিণভাই হচ্ছে গিয়ে সোনালি-সোনালি, বেশ, তবে ওর নাম থাক সোনা ভাই।"

নিজের নাম আবিষ্কারের কৃতিত্বে শিম্পাঞ্জি যে খুব খুশি হবেই; সে তো জানা কথা, ঘোড়াও দেখা গেল বেশ খুশি হয়েছে। গায়ে একটু ছোট্ট করে টোকা দিয়ে ঘোড়া জিজ্ঞেস করল, "কী হরিণ ভাই, পছন্দ তো?"

"পছন্দ, পছন্দ!"

হরিণের খুব পছন্দ হল নিজের ডাকনাম।

প্রসঙ্গ পালটে হরিণ প্রশ্ন করে, "তা কালু ভাই, এসব তামাক খাওয়ার অভ্যেস কোথায় শিখলে? এসব শুনেছি ভাল অভ্যেস নয়।"

"হুঁ, সে আর তুমি বলবে কেন? আমিও জানি। কিন্তু কী করব বলো? এত ছাড়ার চেষ্টা করি, পারিনে। কতবার ধরলাম, কতবার ছাড়লাম। নাঃ, এবারে ছাড়ব তো একদম ছাড়ব, ভাবছি, সামনের মাসের ছ' তারিখে আমার জন্মদিন। ওইদিন থেকে আর ছোঁব না।"

"পারবে তো?"

প্রশ্নটা ঘোড়ার। প্রশ্নটা বোধ হয় হরিণেরও। শিম্পাঞ্জিও বেশ কঠিন ভাবে বলল, "পারব না মানে? দেখে নিয়ো। এখন বুঝতে পারি এসব কত খারাপ। খকখক কাশি হয়। এখন আবার নতুন উপসর্গ দেখছি, কয়েকদিন ধরে বুকে একটু চিনচিন করে ব্যথাও হচ্ছে!"

"তার মানে ফার্স্ট ওয়ার্নিং!"

হরিণটা মাঝেমধ্যে ইংরেজি বলে। বলবে না? একসময় দু-একটা হরিণের বাচ্চাকে পড়াত তো। চর্চাটা এখন নেই, তবুও পুরনো অভ্যাসে ঠোঁট থেকে হুটহাট ইংরেজি বের হয় দু-একটা।

ঘোড়াটা কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "নেশা কি আর আমারও কম ছিল? একসময় একটু আফিম না পেলে রাত্তিরে ঘুমই হত না। রাজার ঘোড়াদের জন্যে রোজ একটু আফিম বরাদ্দ ছিল। তা, আমি কিন্তু সেই যেদিন রাজার বাড়ি ছেড়েছি, আফিমও ছেড়েছি।"

শিম্পাঞ্জি বলতে শুরু করল নিজের কথা, "আমার তো সর্বনাশ করেছে আমার ছোটবাবু।"

ছোটবাবু! হরিণ কেমন ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে তাকাল। ওদের আবার ছোটবাবু, সেজোবাবু, বড়বাবু আছে নাকি? এমন কথা তো জন্মেও শোনেনি ও। ওসব মানুষের মধ্যে থাকে বটে!

ঘোড়াই মুখ খুলল, "আসলে কালু ভাই তো একসময় সার্কাসে ছিল!"

শিম্পাঞ্জি বেশ গর্ব করে বলতে শুরু করল, "সেসব আশ্চর্যের কথা! শুধু কি সার্কাস? আমার মতন এতরকম পেশায়

ক'জন কাজ করে ? প্রথমে ছিলাম একটা চিড়িয়াখানায়। একসঙ্গে জনা চোদ্দ ! তারপর গেলাম একটা সার্কাসে। আসলে হল কী, বুড়ো হয়ে গেলে সবার দাম কমে যায়। আমারও গেল। চিড়িয়াখানায় থেকে-থেকে একদিকে বাত ধরে গেল, অন্য দিকে ঘন-ঘন ভাল্লুকজ্বর হত। শুয়ে-শুয়ে থাকতাম দেখে আমাকে চিড়িয়াখানা থেকে একজন মানুষ নিয়ে গেল !"

"বেশ মজার গল্প তো ?" হরিণ আশ্চর্য হয়ে মন্তব্য করল।

শিম্পাঞ্জিও উত্তরে বলল, "হ্যাঁ, মজারও বটে, আবার দুঃখেরও বটে ! পড়লাম এক পাষন্ড লোকের পাল্লায়। ভাই, কী বলব, দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিত, কিন্তু কত কাজ যে করাত আমাকে দিয়ে ! আমি ছিলাম, একটা বানর ছিল, আর একটা বড় পাটনাই পাঁঠা।"

বলতে-বলতে বার কয়েক ঘড়ঘড় করে কেশে নিল ও। তারপর বলতে শুরু করল, "তো কী বলছিলাম যেন।"

"পাটনাই পাঁঠা ছিল !"

হরিণ খুব উৎসাহে শুনছে বোঝা যায়, সঙ্গে-সঙ্গে কথার খেই ধরিয়ে দিল।

"তো হ্যাঁ, পাটনাই পাঁঠা। পাঁঠা বলে পাঁঠা। ওর একটুও লজ্জাশরম নেই। লোকটা যা বলত, তাই করত ! এমনকী, ওঠ বললেই বানরটা পাঁঠার পিঠে উঠে বসত। শ'য়ে-শ'য়ে লোক দেখত আর হাততালি দিত। আমার তো লজ্জায় মাথা কাটা যেত। দু'বেলা কতটুকু-বা খাই, তার জন্যে এত ! তোমরাই বলো ?"

হরিণ সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "সত্যি কথা। অসম্মানের চূড়ান্ত। আমি হলে পারতাম না, ঠিক পালাতাম।"

শিম্পাঞ্জি চট করে কথাটা ধরল। "হ্যাঁ, আমিও তো তাই করলাম। তা ছাড়া আরও কী বলল জানো ?"

"কী ?"

"বলে কিনা ডিগবাজি খেতে হবে। তা না হয় খেলাম। শরীরে সেরকম জোর থাকলে সে একটা কথা। বুড়ো হয়েছি, শরীর পারে না ; কিন্তু কোনও মায়ামমতা নেই। কোত্থেকে একটা ঢিলে পাজামা পরিয়ে, গায়ে একটা ফতুয়া চড়িয়ে, মুখে চুনকালি মাখিয়ে ডিগবাজি খেতে হবে। আবার তাতেও হবে না। বানরকে কাঁধে নিয়ে হাঁটতে হবে।... আমি বলি, কেন রে বাপু, মানুষ আর আমি কতটুকু ফারাক ? আমি তো প্রায় মানুষ-মানুষ দেখতে। মানুষের কাছাকাছি। শুধু কথা বলতে পারিনে, এই যা ! তা বলে আমার কোনও সম্মান নেই ?"

ঘোড়ার এসব শোনা কাহিনী, তবুও সে খুব মন দিয়েই শুনছিল, যেন এই প্রথমবার শুনছে। আর হরিণের তো বলতে গেলে পলক পড়ছিল না। শিম্পাঞ্জি থামতেই সে জোর তাগিদ দেয়, "তো শেষপর্যন্ত কী করলে ? পালালে নিশ্চয়ই ?"

"তা ছাড়া আবার কী ? আমার সব ভাল লাগে, কিন্তু অসম্মান পছন্দ করিনে। ...একদিন গভীর রাতে চুপিচুপি পালালাম। ভাবছিলাম, ছোটবাবুর বাড়ির সব তছনছ করে দিয়ে যাই, কিন্তু পারলাম না।"

"কেন, কেন ? এসব ব্যবহারের উচিত শিক্ষা দেওয়া ভাল।" হরিণ বেশ কঠোরভাবে উচ্চারণ করল।

শিম্পাঞ্জি ধীর, শান্ত। বলল, "পারলাম না কারণ, ছোটবাবুর দুটো মেয়ে ছিল। যমজ। একই রকম দেখতে। ওরা আমাকে বড্ড ভালবাসত।"

"সেটা অবশ্য ঠিক করেছ ! তুমি যে মানুষের কাছাকাছি, তুমি তার প্রমাণ রেখেছ। ওটা খুব অনুচিত কাজ হত।"

শিম্পাঞ্জি মৃদু হাসল। কথাটা তেমন নিতে পারল না বোধ হয়। তারপর বলল, "সেই যখন পালিয়ে এসেছিলাম, তখন এরকম কুঁজো ছিলাম না। কুঁজোটা হয়েছি এই বছরখানেক হল ! এখন লাঠিছাড়া দু'পা নড়তে পারিনে। তা তোমরাই বলো, লাঠি হাতে কি পাহাড়ে ওঠা যায় ?"

কোন কথায় কী আসছে ! হরিণ প্রায় না বুঝেও কথার তালে তাল মিলিয়ে বলল, "উঁহু, নেভার।"

কিন্তু হঠাৎ পাহাড় এল কোত্থেকে ? মনে একটা খটকা থেকে গেল। হরিণ জিজ্ঞেস করল, "পাহাড়ে ছিলে মানে ?"

"মানে আর কী ! পাহাড়েই তো ছিলাম। এখানে এসেছি এই তো কয়েক মাস। আগে একটা মস্ত টিলার ওপরে থাকতাম। চারদিকে গাছগাছালি। ওখানে পাথর সরিয়ে গুহা বানিয়ে বেশ ছিলাম। বাড়িটা যদি দেখতে, অট্টালিকা কোথায় লাগে ! ঝড়বৃষ্টি হলেও ভেঙে পড়ার ভয় ছিল না। কিন্তু থাকা হল না। উটকো ঝঞ্ঝাট ! একে তো পাহাড়ে ওঠানামা করতে-করতে কোমরটা ভেঙে গেল, মাঝে-মাঝেই টনটন করে ব্যথা করত, শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে পারতাম না, তার ওপর গুড়ুম-গুড়ুম করে কী যেন ফাটত, জোর শব্দ হত, পাহাড় কেঁপে কেঁপে উঠত। আর থাকা গেল না।"

গল্প শেষ করতেই হরিণ বলল, "সত্যি কালু ভাই, তোমার অভিজ্ঞতা অনেক।"

"অনেক ? অনেক বলে অনেক ! আমাদের তো ওর সিকিও নেই।" ঘোড়া মন্তব্য করল।

হরিণ একটু ভেবে উপসংহার টানে, "তার মানে, দেখা যাচ্ছে, আমরা তিনজনই একভাবে না একভাবে দুঃখী। কিন্তু তোমাদের পেয়ে বড্ড ভাল লাগছে ! এখন একটা চোখ নেই বলে কষ্ট হচ্ছে না।"

ঘোড়া কথাটা টেনে নেয় নিজের দিকে, "হুঁ, তাই ! আমার আগে কষ্ট হত, খোঁড়া পায়ের জন্যে। এখন তেমন হচ্ছে না।"

"আমারও এখন মনখারাপ ভাবটা কেটে গেছে। বেশ লাগছে। তোমাদের দুঃখটা আমার চেয়ে অনেক বড়। আমার আর কী ! বয়েস হয়েছে, একটু কুঁজো হয়েছি। কিন্তু তোমাদের কথা ভাবলে আমার বড্ড খারাপ লাগে। হাত মেলাও ভাই, আজ থেকে আর কেউ মনখারাপ করব না।"

সন্ধে তখন গাঢ় হয়েছে। চাঁদের আলোয় ভরে আছে উঠোন। চারদিক। পৃথিবীতে নতুন আনন্দ, এখন দুঃখ করার কোনও মানে হয় না !

হরিণ হাত মেলাল শিম্পাঞ্জির সঙ্গে। ঘোড়াও হরিণের সঙ্গে বেশ উষ্ণতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলল, "এই আনন্দে একটা গান হয়ে যাক।"

"কে গাইবে ?"

শিম্পাঞ্জি মজা করে প্রশ্ন করল।

হরিণ বলল, "আমি আবার গানটান গাইতে পারি না। ওই একটা বস্তু দিতে বোধ হয় ভুল করেছিলেন ভগবান।"

ঘোড়া ফিচিক করে হেসে বলল, "বেশ, আমি গাইছি !"

ঘোড়া গান ধরল :

ঘোঘঘোড়া কো ঘোঘঘোড়া
আ ঘোড়া, যা ঘোড়া
ইক ইক
খা ঘোড়াকো খোঁড়া খোঁড়া
হাঁটো বাবা থোড়া থোড়া
ইক ইক

যেমন গাইয়ে, তেমনই তার দোসর। শিম্পাঞ্জি দেখা গেল তুড়ি ঠুকছে। আচ্ছা তুড়ি ঠোকে ও। আর হরিণও কি বসে ছিল ? সেও দেখা গেল কোমর বাঁকিয়ে বেশ ঘুরে-ঘুরে তালে-তালে নাচছে।

সে এক কাণ্ড ! চাঁদের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে তিনজন বন্ধু অন্তরঙ্গতায় কাটাল জীবনের কিছুটা সময়। কে খোঁড়া, কে কানা, কে কুঁজো—কারও মনেও ছিল না।

ছবি : দেবাশিস দেব

বাইরের জানালা

কথা বলার সমস্যা দূর করবে ক্লডিয়াস

নানা কারণে যাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন স্বাভাবিক কথা বলার ক্ষমতা, তাঁদের মুখে হাসি ফোটাবে কম্পিউটারভিত্তিক ছোট্ট একটি যন্ত্র। লিখেছেন পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

অকস্মাৎ বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন নেভিল হাফগেনি, তিরিশোর্ধ্ব নেভিল শিকার হয়েছিলেন পথদুর্ঘটনার। হঠাৎ আঘাতে মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে অবশ হয়ে যায় তাঁর মোটর স্নায়ু, লুপ্ত হয়ে যায় তাঁর বাক্‌শক্তি। অসহায় নেভিলের কথা বলার পুরনো অভ্যাসে নড়ে ওঠে ঠোঁট, কিন্তু কোনও কথা ফোটে না। শেষে হাত নেড়ে মনের কথা বোঝানোর চেষ্টা করেন তিনি। কিছুদিন হল হাসি ফুটেছে নেভিলের মুখে, এখন তাঁর হয়ে কথা বলছে, একটি যন্ত্র, যার নাম 'ক্লডিয়াস'।

যাঁরা জন্ম থেকে কথা বলতে পারেন না, তাঁরা তো বটেই, এমনকী নেভিলের মতো যাঁরা হঠাৎ হারিয়ে ফেলেন বাক্‌শক্তি, তাঁদের অসহায়তার কথা ভেবেই 'ব্রিটিশ টেলিকম ল্যাবরেটরি' তৈরি করেছে ক্লডিয়াস — সহজ-বহনযোগ্য একটি 'স্পিচ কমিউনিকেশন ডিভাইস'— তাৎক্ষণিক কথা বলার কম্পিউটারভিত্তিক যন্ত্র। যন্ত্রটির নাম ক্লডিয়াস কেন? টেলিকম ল্যাবরেটরির এক মুখপাত্র বলেছেন, রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারতেন না। তিনি চেয়েছিলেন এমন একটা কিছু তাঁর হাতে থাকুক, যা তাঁর হয়ে কথা বলবে। ক্লডিয়াসের এই ইচ্ছে তাঁর জীবদ্দশায় পূরণ না হলেও, টেলিকম ল্যাবরেটরি তৈরি করেছে সেই যন্ত্র। যন্ত্রটি তাই ক্লডিয়াসকেই উৎসর্গ করেছেন তাঁরা। অনেকটা ক্যালকুলেটরের মতো দেখতে এই যন্ত্র। ছোট-ছোট বাক্য আর বেশ কিছু শব্দ মাইক্রোফোনের মাধ্যমে একজন দক্ষ 'স্পিচ থেরাপিস্ট'কে দিয়ে রেকর্ড করিয়ে কম্পিউটার মেমরি চিপ্‌সে ধরে রাখা হয়। পরে নির্দিষ্ট বোতাম টিপে স্পিকারের সাহায্যে রেকর্ড করা বাক্যগুলিই শোনানো হয় স্বাভাবিক গলার আওয়াজে। প্রয়োজনে রেকর্ড করা শব্দ থেকে বাক্য তৈরি করেও নেওয়া যায়, এক-একটি বাক্যাংশ আলাদাভাবে বা অন্য শব্দের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে তৈরি করা যায় নতুন কথা। শুধু মুখোমুখি নয়, ফোনের মাধ্যমেও কথা বলা যায় ক্লডিয়াসের সাহায্যে।

লন্ডনের এক পুলিশের কাছে রাস্তা জেনে নিচ্ছেন নেভিল

"যাঁরা জন্ম থেকে কথা বলতে পারেন না, তাঁরা তো বটেই, এমনকী যাঁরা হঠাৎ হারিয়ে ফেলেন বাকশক্তি, তাঁদের অসহায়তার কথা ভেবেই ব্রিটিশ টেলিকম ল্যাবরেটরি তৈরি করেছে 'ক্লডিয়াস', সহজ-বহনযোগ্য একটি স্পিচ কমিউনিকেশন ডিভাইস—তাৎক্ষণিক কথা বলার কম্পিউটারভিত্তিক যন্ত্র।"

ক্লডিয়াস চলে ব্যাটারিতে। ল্যাবরেটরির তরফ থেকে বলা হয়েছে, 'রিচার্জেব্‌ল' ব্যাটারির সাহায্যে একনাগাড়ে দু'ঘণ্টা চালানো যেতে পারে যন্ত্রটি, পরে 'মেন'-এর সঙ্গে সংযুক্ত করে রিচার্জ করে নেওয়ারও সুযোগ আছে। এক কিলো ১০০ গ্রাম ওজনের ক্লডিয়াস সহজেই বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। টেলিকম ল্যাবরেটরি ইতিমধ্যেই যন্ত্রটি বাজারে বিপণন শুরু করেছে। স্ট্রোক, সেরিব্রাল পল্‌সি, গলার ক্যানসার বা পার্কিনসন্‌স রোগে যাঁরা কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন তাঁরা সবাই ক্লডিয়াসের সাহায্য নিয়ে কথা বলছেন স্বাভাবিকভাবে। এমনকী যাঁরা শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য কি-বোর্ডও চালাতে পারেন না, তাঁরাও যাতে সহজেই যন্ত্রটি ব্যবহার করতে পারেন টেলিকম ল্যাবরেটরি তারও ব্যবস্থা করেছে। একটি ছোট চালকযন্ত্র সংযোগ করে নিলেই ক্লডিয়াস হাসি ফোটাবে তাঁদের মুখেও।

সম্পূর্ণ উপন্যাস

শিবতোষ ঘোষ

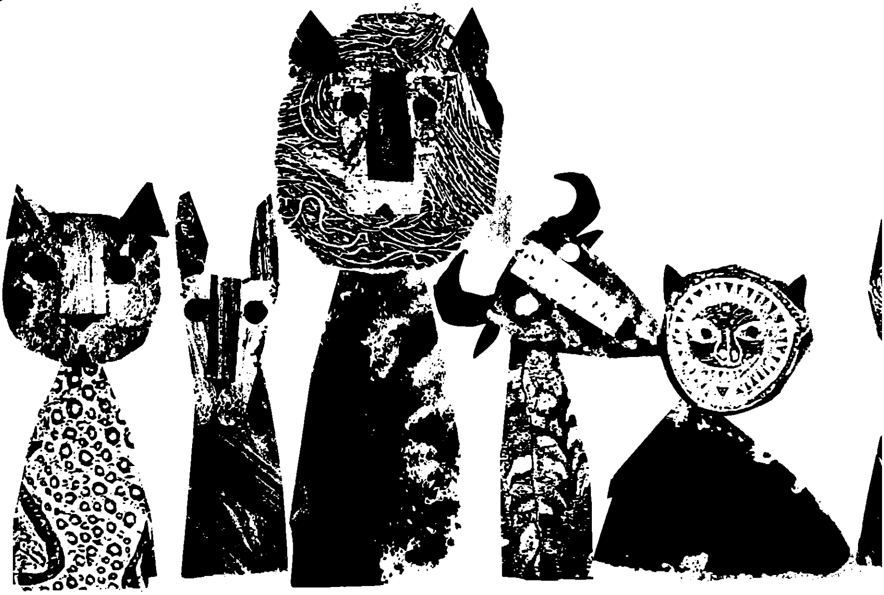

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল সাণ্টা-বাণ্টা তাদের মনে নেই। দুধি তাদের খুঁচিয়ে ডেকে তুলল।

ভুত তো হাড়সম্বল, ভুত মানেই হাড়, তবে অদ্ভুত ব্যাপার জ্যান্ত অবস্থায় যার যেখানে যেমনটি হাড় ছিল, এখনও সেখানে তেমনইভাবে সাজানো। খালি হাড়গুলো যে কী করে অমন আটকে আছে! একেবারে অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার। আর ওদের ভ্যানিশ হয়ে যাওয়া! যার অস্তিত্ব আছে সে কখনও অদৃশ্য হতে পারে না। এজন্য যাঁরা ভূতে বিশ্বাস করেন না, এজন্যই করেন না।

দুধি তার নুলো দিয়ে ঠেলছে। আমরা দু' ভাই-ই আ-আ করে ছিটকে উঠে বসলাম।

দুধি বলল, "চুপ, অমন আ-আ করিস না! মানুষ বড় ভিতু, বড় ভয় পায়, ছায়া দেখেও ভয় পায়। কোথাও খুড়ত করলে এমন কুঁকড়ে যায় যেন তার লাল হৃৎপিণ্ডটাকেই কেউ খাবলে ধরতে যাচ্ছে। 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে....' সাণ্টা দুলে-দুলে মুখস্থ করেছিল, আমি শুনেছি। তবু তোরা ভয় পাস, বোকা-বোকা! নে চল, আমার সঙ্গে চল!"

"কোথায়?" সাণ্টা জিজ্ঞেস করল।

দুধি বলল, "চল না দেখবি, কাদের ধরে এনেছি!"

আমি এখান থেকেই পা নেংচে চেঁচিয়ে উঠি, "বুড়ু!"

দুধি তেড়ে বলে ওঠে, "খামোশ!"

আমি বলি, "কী খামোশ, একফোঁটা বাচ্চা মেয়ে, কেজি টু-তে পড়ে, তুই তার ওপরেও...."

দুধি বলে, "ওসব সেণ্টু দেওয়া কথাবার্তা তোদের মুখে আমি অনেক শুনেছি, এতদিন ভাবতাম এগুলোই সত্যি, কিন্তু এখন তোদের আপাদমস্তক সব জেনে গেছি, আর ভুলছি না।"

দাদা বলল, "দুধি, তোর পায়ে পড়ি, বোনটাকে আমার ছেড়ে দে!"

আমি বললাম, "দুধি, আমাকে দুটো কামড়ে দে, বুড়ুকে কিছু বলিস না!"

"আরে চল না, দেখবি চল না, আরও কত জনে ধরে এনেছি। মানুষের হাট বসে গেছে হিজলতলায়। তোদের নিয়ে গেলে এবার বিচার শুরু হবে। এতদিন তোরা করেছিস আমাদের বিচার, এবার আমরা করব তোদের বিচার!"

তাদের দু'জনকে তাড়িয়ে-তাড়িয়ে নিয়ে এল দুধি।

তারা বিচারসভায় এসে দ্যাখে, সভায় অসংখ্য ভূত, ভূতের সমুদ্র, চারদিকে কিলবিল করছে সব পশুভূত। এখানে কত যে হাতিভূত, ভালুকভূত, শেয়ালভূত, ইঁদুর-ছুঁচো-চামচিকে....বাদুড়ভূত গাছের ডালে পা দুলিয়ে দোল খাচ্ছে, তারা দোল খেতে-খেতে আমাদের বিচার শুনবে।

বাণ্টা দাদাকে টেনে দাঁড় করিয়ে তার বুকে মাথা রেখে জিজ্ঞেস করল, "দাদা, ভাল করে দ্যাখ তো কোথায় বুড়ু, মা-বাবা? দুধি 'ফল্স' দিচ্ছে না তো!"

সাণ্টা বলল, "এখন নিজেদের কথা ভাব, গাছ থেকে নীচে নেমেছি, মাটিতে পা রেখেছি, সকলে এখন বিচার-পঞ্চায়েত নিয়ে

ভূতের বিচার

ব্যস্ত, কী করে পালানো যায় উপায় বের কর ! আমার তো ভূতের দঙ্গলে পড়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের রীতিমত কষ্ট হচ্ছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে !"

"আমারও । ভূতের গায়ের বিকট গন্ধ । ওরা স্নান করে না । জলই ছোঁয় না ভূত । জল আর আগুন, জীবনের গোড়ার কথা যে দুটো, এ-দুটোকেই ওরা সহ্য করে না ! ভূত আর মানুষে তফাত হল একদল জল-আগুন ছাড়া বাঁচে না, আর একদল ও দুটোর কাছেই যায় না !"

দুধি বলল, "কী রে, তোরা যে এখানে দাঁড়িয়ে গেলি ! নে, নে, চল, চল ! সবার মাঝখানে চল ! আমাদেরও কাঠগড়া আছে, সেখানে দাঁড় করিয়ে তোদের জেরা করা হবে ! আমাদেরও দোষ দেখলে বিচার হয়, শাস্তি হয়, বনবাস হয়, দ্বীপান্তর হয়, শূলে চড়ানো হয় ! কী, ঘাবড়ে যাচ্ছিস নাকি ?"

দুধি আমাদের ঠেলতে-ঠেলতে হিজলগাছের গোড়ায় নিয়ে এল । হিজলগাছের গোড়া ঘিরেই ভূতেদের মঞ্চ বা বিচারশালা । দুধি আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল মা-বাবাকে, বুড়ুকে ।

"ওই যে ওঁরা নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছেন ।"

বুড়ুকে দেখে মনে হচ্ছে ও অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে-কেঁদে এখন ভূতের ভয়ে চুপ করে গেছে । এত দূর থেকেও যেন বোঝা যাচ্ছে চোখের নীচে চোখের জল শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে ।

আমাদের দু'জনকে ওদের কারওর সঙ্গে দেখা করতে দিল না, টেনে নিয়ে গিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিল । আমি একটু ছটফট করতেই দুধি নুলো দিয়ে থাপ্পড় মেরে বুঝিয়ে দিল এটা বিচারসভা, আদিখ্যেতার জায়গা নয় ।

দুধি বলল, "সভার সভাপতিরা তোদের যখন যা জিজ্ঞেস করবেন তোরা তার সাচ-সাচ জবাব দিবি । কী রে বুঝতে পারলি ? আন্ডারস্ট্যান্ড ?"

বাবা কথায়-কথায় বলেন, "আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড !" শুনে-শুনে দুধিও শিখে গেছে !

দাদাকে বললাম, "তবে তুই যে বলিস ইংরেজি ভেরি 'টাফ', বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে ইংরেজিতেই ফেল করে ?"

দাদা আমাকে পাত্তাই দিল না, "থাম !"

খুব প্রাজ্ঞর মতো এক হাত ঘাড়ে বুলোতে-বুলোতে দাদা দুধিকে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে দুধি, এখানেও কি শপথ নিতে হবে, সত্য বই মিথ্যা বলিব না ?"

বাপ্টা তাড়াতাড়ি বলে, "হ্যাঁ রে দাদা, আমি সিনেমায় দেখেছি । কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে এরকম শপথবাক্য পাঠ করানো হয় !"

দুধি দাবড়ে দেয়, "ওসব শপথটপথের কথা একদম মুখেও উচ্চারণ করিস না এখানে, শুনতে পেলে কেউ রাগের বশে তোদের ঘাড়ই মটকে ধরতে পারে !"

"কেন ? আমাদের ধর্মগ্রন্থেই আছে শপথবাক্য যে পালন করে সে স্বর্গে যায় !"

"খামোশ !" দুধিভূত অসহনীয় গর্জে ওঠে ।

"তোদের কাছে যা ধর্ম, আমাদের কাছে তা অধর্ম । যেমন জীবন তোদের কাছে সবচেয়ে বড় ধর্ম, চলে গেলেই সব ফুস-তুবড়ির মতো, যে তুবড়িটা জ্বলল না বাজির হাটে তার কানাকড়িও দাম নয় । কিন্তু আমরা হলাম গিয়ে ওই না-জ্বলা তুবড়ি । মৃত্যু ছাড়া আমাদের আর কোনও অস্তিত্ব নেই । জীবন নিয়ে তোরা গর্ব করছিস, মৃত্যু আমাদের গর্ব । সেজন্য তোদের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন', আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'মরণ রে তুহুঁ মম' । তোদের দিন প্রিয়, আমাদের রাত, তোদের পূর্ণিমা, আমাদের অমাবস্যা ।"

এক কাঠগড়ায় আমরা দুই শীর্ণকায় বালক, ঘাড় নিচু করে দাঁড়িয়ে আছি । বুড়ুকে যে একবার চোখের দেখা দেখব, তাও দিল না । আহা বেচারা, হয়তো এখনও ভেতরে-ভেতরে কেঁদেই যাচ্ছে ! আর মা-বাবা, ওঁদের কি কম দুঃখ ! ঘর শূন্য করে সব ক'টা ছেলেমেয়েকে তুলে এনেছে ! না, এ হল ভূতের দৌরাত্ম্য, অত্যাচার !

তবে লোকে যে বলে ভূত নেই ? যদিও-বা আগে ছিল, এখন সব পালিয়েছে ! আরে থাকবে কোথায় ? ডালভাঙা বিশাল অশ্বত্থ গাছ, পোড়ো কুঠি, গা-ছমছম করা বাঁশবাগানের ভেতর দিঘল কালো জলের পুকুর ! শ্মশান চত্বরেই এখন তিনতলা বাড়ি, সন্ধে হলে টিভি চলে ।

কিন্তু আমাদের মতো কেউ যদি কোনওদিন হিজলতলায় এসে পড়েন সেদিন বুঝবেন ভূত আছে কি নেই !

কাঠগড়ায় মুখ-নিচু অবস্থাতেই দাদাকে বললাম, "তোর ক্যামেরাটা আনলে ভাল হত, ভূতের একটা গ্রুপ ফোটো তুলে নিয়ে যেতাম । ছবি না দেখাতে পারলে লোকে বিশ্বাসই করবে না হিজলতলার কথা ।"

দাদা বলল, "ভ্যাট, বোকা কোথাকার ! ভূতের আবার ছবি হয় ! ওই মানুষের ফোটোর যেমন নেগেটিভ, তেমনই হবে কালো-কিম্ভূত একখানা । ভূতের ছবি তুলে নিয়ে যেতে হবে কেন, সে তো মানুষের নেগেটিভগুলোই দেখালে হবে ।"

আর নেগেটিভ দেখানো, জানে ফিরি তো, তারপর । ওদের

বিচারসভার যা আয়োজন দেখছি, মনে তো হয় না আমরা কেউ এ-যাত্রা রক্ষে পাব !

ঠ্যাং উঁচিয়ে দেখে বলল, "সেই হিন্দিবলা লোকটাকেও দুধি ধরে এনেছে দেখছি, সেই যে দুধিকে পুকুরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। লোকটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তবে গোঁফজোড়াটা দেখা যাচ্ছে। গোঁফ আর কার হবে, বাবার তো গোঁফ নেই, এ নিশ্চয় সেই লোক।"

"আমাদের চেয়ে ওর তো বেশি দোষ, আমরা যদি অ্যাটেম টু মার্ডারের আসামি হই, ও তা হলে খোদ মার্ডারের আসামি। ওর খুব কঠিন শাস্তি হবে না রে দাদা ?"

"অয়েল ইয়োর ওন মেশিন !" বলে সাণ্টা গম্ভীর হয়ে গেল।

একটু পরেই বিচারসভার সভাপতি গাধাভূত প্রবেশ করলেন, তাঁর পেছনে-পেছনে আরও পাঁচ-ছ'টা সভাসদ ভূত।

বাণ্টা জিজ্ঞেস করল, "দাদা, গাধাটাকে অমন সম্মান দেখাচ্ছে সবাই কেন বল তো ? শেষপর্যন্ত ওই কি আমাদের বিচার করবে নাকি ?"

সাণ্টা তেমনই গম্ভীর গলায় বলল, "ওটা গাধা না, জেব্রা ?"

"সকলের গায়েই তো ওই একই জিনিস, হাড়। আলাদা করে কাউকে চেনাই যায় না। তবে জেব্রা হলে ঘাড় লম্বা হত, এর কান দুটো লম্বা।"

গাধাকে দেখে সকলে বলে উঠল, "সভায় সভাপতি এসে গেছেন, সভাপতি এসে গেছে, সকলে চুপ করো।"

সভাপতি হাত নাড়লেন। তাঁর দেখাদেখি সভাসদগণও হাত নাড়েন।

হঠাৎ কী হল, দেখি সকলে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করছে। নিশ্চয় কোনও পশুভূত দেহ রেখেছেন। কিন্তু ভূতের তো দেহই নেই, ভূত থেকে মুক্তিলাভ ঘটেছে তা হলে। আমাদের তিন কাল, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান। ভূত হচ্ছে আমাদের অতীত, অতীত মানে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে আমরা জীবনে এসেছি। আর ভূত জীবন থেকে মৃত্যুতে এসেছে, ওদের অতীত জীবন। ভূতের সঙ্গে আমাদের দেখছি গোড়াতেই গলদ।

আমরা দু' ভাইও ভূতের সঙ্গে নীরবতা পালন করলাম। নীরবতা ভঙ্গ করে সকলে যে যার আসন গ্রহণ করল, হাড়ের ঠকঠক শব্দ হল।

কোর্টের চাপরাশির মতো এক ভূত চিৎকার করে সকলকে চুপ করাচ্ছে, "আপনারা সকলে চুপ করুন, সভার কাজ শুরু হচ্ছে !"

সে সুর করে ডাকছে, "বাদি দুধি বেড়াল, হাজির....হাজির...."

দুধি লম্বা লেজ নেড়ে সভার মাঝে এসে দাঁড়ায়।

সভাপতি জিজ্ঞেস করল, "বলো, তোমার কার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ ?"

দুধি বলল, "আজ্ঞে, আমার অভিযোগ সব এদের বিরুদ্ধে। আমার অভিযুক্ত মানুষগুলোকে আমি বিচারস্থলে ধরে এনেছি। আপনারা এর বিচার করুন !"

সভায় চারদিকে 'মানুষ' 'মানুষ' রব উঠল। অনেক পশুভূত তো হুমড়ি খেয়ে পড়ল মানুষ দেখার জন্য।

কোনও ভূত বলে, "সেজন্য তো বলি এমন বোঁটকা গন্ধ এল কোত্থেকে ?"

বাণ্টা শুনে রেগে যায়, "কী বললি, আমাদের গায়ে বোঁটকা গন্ধ ! আমরা দামি সাবান মেখে রোজ শাওয়ারে স্নান করি, মা যখন ক্রিম-পাউডার মেখে সাজেন তখন তাঁর গায়ের গন্ধ ঠিক যেন পূজা-পূজা গন্ধ। আমাদের ছোটবোন সে তার কড়ে আঙুলের

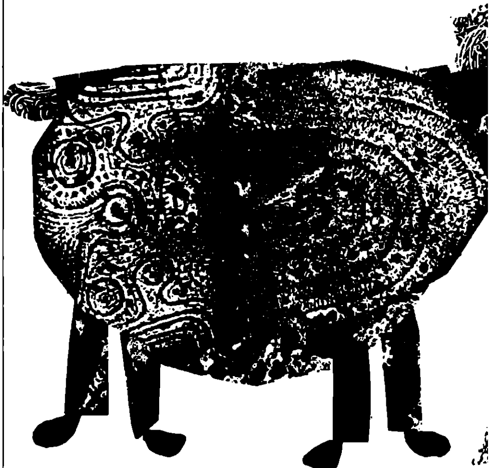

নখটিকে পর্যন্ত সাজায়। তবু বলছে আমাদের গায়ে বোঁটকা গন্ধ !"

সাণ্টা বলল, "আসল হল মানুষ ভূতের গন্ধ টের পায়, ভূত মানুষের গন্ধ টের পায়। ভূত ভূতের গন্ধ টের পায় না, মানুষ মানুষের গন্ধ টের পায় না !"

আমি একটি কিশোর ভূতের সঙ্গে কথা বলছিলাম, বেশ ভাল লাগছিল ওকে, গল্প জুড়ে দিয়েছি দু'জনে। সে বলছে, "দ্যাখো আমার পরিচয় খুলে না বললে তুমি ঠিক বুঝবে না। আমি একজন বিখ্যাত ডাক্তার বাড়ির কুকুর ছিলাম। এতদিন ডাক্তারবাবুর কাছে 'মেডিসিন', 'পেশেন্ট'...এসব শব্দ খুব শুনতাম, কিন্তু ইদানীং ডাক্তারবাবু 'স্মাগলিং' কথাটা খুব বলছেন। এখন একটা দাড়িওলা লোক প্রায়ই আসে বাক্সভর্তি সোনা নিয়ে। ডাক্তারবাবুকে সোনা দিত, বিনিময়ে সে বাক্সভর্তি সোনা নিয়ে যেত। এই চোরাকারবার দেখে-দেখে একদিন আমার আর সহ্য হল না, সেদিন লাফিয়ে টুঁটি চেপে ধরলাম ওই সোনা-পাচারকারী লোকটার। ডাক্তারবাবু নিজে কয়েকবার খুব চেষ্টা করলেন ছাড়ানোর জন্য, না ছাড়াতে পেরে উনিই আমাকে গুলি করেন। এই দ্যাখো না, আমার চোয়ালের একটা দিক নেই, গুলিতে উড়ে গেছে !"

হেসে আরও বলল, "ভাগ্যিস আমাকে জ্যান্ত কুকুরের মতো এখন আর হাড্ডি চিবিয়ে খেতে হয় না, না হলে কী হত বলো দিকি ? চিরদিনের জন্য ওই মানুষ আমার খাওয়ার মুখটাই ভেঙে দিয়েছে !"

কিশোর কুকুরভূত তার গল্পের শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

কিশোর কুকুরভূত উঠে দাঁড়িয়ে সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করে বলে, "সভাপতি মহাশয়, মানুষের বিরুদ্ধে আমারও কিছু অভিযোগ আছে। আমার গালপাট্টার দিকে তাকান !"

"মানুষের বিরুদ্ধে আমারও অভিযোগ আছে সভাপতি মহাশয় ! এতক্ষণ দুধির অভিযোগ আপনারা শুনলেন, কিশোর কুকুরেরও অভিযোগ শুনলেন, এবার আমার শুনুন, সংক্ষেপে বিবৃত করছি।"

"আমি হলাম গিয়ে শেয়াল। আমার একটাই দোষ, আমি মানুষের গৃহপালিত হতে পারিনি। কুকুর, গোরু, ছাগল...প্রথম দিকে

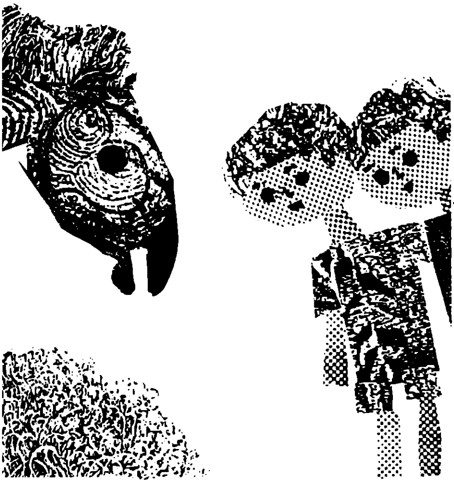

এরকম গোটাকয়েক গৃহপালিত ছিল মানুষের, কিন্তু এখন ? মানুষ সমস্ত পশুপক্ষীকেই তার আজ্ঞাধীন দাস করে রাখতে চায় ! আপনারা ভাবতে পারেন এমন চঞ্চল ময়না, সেও আজ মানুষের খাঁচায় বসে-বসে বলছে, 'নাধা-নেস্ট, (ভূত ঠাকুর-দেবতার নাম উচ্চারণ করে না সেজন্য রাধা-কৃষ্ণকে বলল— নাধা-নেস্ট ।) সাপের মতো নৃশংস, নেউলের মতো একরোখা, হাতির মতো শক্তিমান, ঘোড়ার মতো দুরন্ত, গণ্ডারের মতো সহ্যশক্তি, সর্বোপরি বাঘ ও সিংহের মতো বলিষ্ঠ....এদেরও ধীরে-ধীরে মানুষ কেমন বশ করে ফেলল ।

"সবচেয়ে লজ্জার কথা কী শুনবেন আপনারা ? এঁরা অন্যের স্বাধীনতা হরণ করে স্বাধীনতার গান রচনা করেন, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে....'"

বিচারসভার চারদিক থেকে রব ওঠে, "শেম, শেম !"

সভাপতি গাছের ডালে গায়ের হাড় ঠুকলেন, টেবিলে হাতুড়ি ঠোকার মতো শব্দ হল, "অর্ডার-অর্ডার !"

শেয়াল আবার বলতে শুরু করে, "সভাপতি মহাশয় ও মান্যগণ ! আমি যেহেতু মানুষের খিদমত খাটতে রাজি হলাম না, অমনই তারা চটে উঠল আমার ওপর । কী, হাতিকে আমরা যা বলি সে তাই শোনে, অত বড়-বড় উঁচু পাহাড় থেকে গাছ বয়ে আনছে নীচে, সব সার্কাসেই তো একটা করে বিশালদেহী বাঘ থাকে, যার বিশাল হাঁ-মুখের ভেতর একটা মানুষ তার মাথা ঢুকিয়ে খেলা দেখায় । আর শেয়াল, সে তো ওসব পশুর তুলনায় নেহাতই পুঁচকে, সে সাতজন্ম চেষ্টা করলেও অ্যালসেশিয়ান কুকুর হতে পারবে না, তার এত বাহাদুরি !

"সভাপতি মহাশয় ও সভাস্থ পশুভূতগণ, আমি পেটের জ্বালায় হয়তো কখনও একটা হাঁস, দুটো বাচ্চা মুরগি ধরে খেয়েছি, কিন্তু এজন্য আমাদের নিঃশেষ করে দিতে উদ্যত হল । আমাদের বাসার দুটো পথ, প্রবেশ পথ, বেরনোর পথ, বেরনোর পথটা লুকনো, পালানোর জন্য । কিন্তু কিছু মানুষ একদিন আমাদের বাসার লুকনো পথটাও খুঁজে পেয়ে গেল । তারা দু' মুখেই আগুন ধরিয়ে দেয় ভেতরে তখন আমি, আমার স্ত্রী ও দুই বাচ্চা ।

"সভাপতি মহাশয়, প্রথমে আমার দুই শিশুপুত্রের গায়ে আগুন লাগে । ধোঁয়ায় ধোঁয়াময়, কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছি না । গর্তের মধ্যে বাচ্চা দুটো পিঠে আগুন ধরিয়ে ছুটছে, গর্তের দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে । ওদের মা নেভাতে গেল, তারও গায়ে আগুন ধরে যায়, তার গায়ের আগুন নেভাতে গিয়ে ধরল আমাকে । দেখতে-দেখতে আমরা চারজনই পুড়ে মরে কাঠ হয়ে গেলাম ।

"মাননীয় উপস্থিত সভাস্থগণ, আমি মানুষের এই নির্মম অত্যাচারের জন্য ওইসব মানুষের শাস্তি প্রার্থনা করছি !".

গোরুভূত উঠে দাঁড়িয়েছে । সভাপতি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি কিছু বলবে ?"

গোরুভূত বলল, "আজ্ঞে, আমি গোরু । জীবজগতের মধ্যে আমিই বোধ হয় সবচেয়ে নির্বোধ, তাই শঙ্কিত হচ্ছি, যা বলতে চাই এতজনের সামনে সব গুছিয়ে বলতে পারব তো ?"

সভার চারদিক থেকে আওয়াজ এল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি যেমন পারো বলো !"

আমি দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "হ্যাঁ রে দাদা, গোরু বেশি বোকা, না গাধা ?"

দাদা ফিসফিস করে বলে, "বোকা কেউ-ই না, আমরা ভাবি । কষ্ট পেলে দু'জনেরই কষ্ট হয়, দু'জনেই কষ্ট বোঝে । তবে গোরু ও গাধার মধ্যে তফাত হল, গোরু কষ্ট পেয়ে কাঁদে, দরদর করে তার দু' চোখ বেয়ে জল গড়ায়, গোরুর কান্না আমরা দেখতে পাই । কিন্তু গাধা কাঁদলেও তার চোখ দিয়ে জল গড়ায় না, তার কান্না সব ভেতরে-ভেতরে । গাধা চোখের কোনা দিয়ে জল গড়িয়ে দিতে পারে না গোরুর মতো ।"

সভাপতি বললেন, "কী হল, বলতে গিয়ে কাঁদতে বসে গেলে যে গোরুভূত ? নাও বলো, মানুষের বিরুদ্ধে তোমার কী অভিযোগ ?"

"মহাশয়, গোরুর চেয়ে কেউ-ই বেশি ভালবাসেনি মানুষকে, মনুষ্যজাতিকে । অহঙ্কারের কথা হয়ে যায়, তবু সত্যি বলে বলতে বাধ্য হচ্ছি, মানুষ গোরুর কাছ থেকে যে উপকার পেয়েছে, সে ঋণ সে কোনওদিন শোধ করতে পারবে না । কিন্তু অকৃতজ্ঞ মানুষ ! গোরুকে ভুলতে বসেছে ! এখন কলের লাঙল আবিষ্কার হয়ে গেছে, কৌটোর দুধ আবিষ্কার হয়ে গেছে । একদিন গো-সম্পদ ছিল মানুষের বড় সম্পদ, গোরু ভগবতীর জায়গায় স্থানলাভ করেছিল । কিন্তু এখন আমরা শুধু গোরু, এখন আমাদের গায়ের লাল রক্তকেও সাদা দুধ করে বের করছে মানুষ । মানুষ ইঞ্জেকশন আবিষ্কার করল, বালতিভর্তি দুধ বের করার ইঞ্জেকশন । আপনারা দেখুন আমার গায়ে হাড়ের ভেতর পর্যন্ত এক-একটা গভীর ক্ষত । গায়ের জোরে আমার হাড়ে ফোটাত সুচটা । এভাবে যখন সুচ ফোটাতে-ফোটাতে গায়ের রক্তও শেষ হয়ে গেল তখন একদিন এই এত মোটা বাঁশের লাঠি দিয়ে আমাকে বেঁধে পেটাতে শুরু করল । আমার গায়ে যে রক্তই নেই সেটা দেখল না । বলতে লাগল আমি চোরা গাই । মারের চোটে একদিকের পাঁজরই ভেঙে গেল চিরদিনের মতো । এই দেখুন !" বলে গোরুভূত ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল ।

সভাপতি গাধাভূত বললেন, "আহা, কাঁদছ কেন, বিচার তো হবে, মানুষ যাবে কোথায় !"

ভালুকভূত উঠে দাঁড়িয়েছে । বলল, "মানুষের বিরুদ্ধে আর কী অভিযোগ করব সভাপতি মহাশয়, আমার মালিকের অত্যাচার তো মুখে বর্ণনা করা যায় না । আমার মালিক ছিল এক ম্যাজিকওলা । তার সঙ্গে আমাকেও ম্যাজিক দেখাতে হত, আসলে আমিই ছিলাম

শব্দসন্ধান — **দেবসেনাপতি**

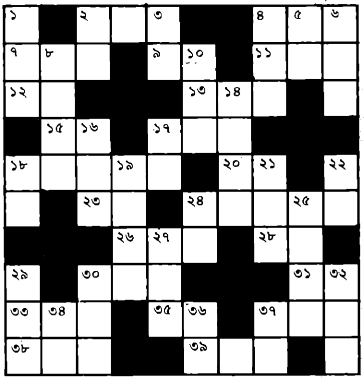

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (২) মহামারী। (৪) ভৃত্য। (৭) শ্রেষ্ঠ রাজা। (৯) যা দেখতে গোল, থাকলে গোল, না থাকলেও গোল। (১১) স্নিগ্ধ দখিনা বাতাস। (১২) যা জোড় করে ভিক্ষা করতে হয়। (১৩) 'তোমার — যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।' (১৫) গন্ধ। (১৭) মেষ। (১৮) মোড়লি। (২০) সাদা মনে — নেই। (২৩) যে সয়, সে —। (২৪) উপযুক্ত। (২৬) খাজনার চেয়ে — বেশি। (২৮) কয়েদি। (৩০) টাটি। (৩১) ক্ষতি। (৩৩) বাতাস। (৩৫) শিয়াল আঙুরফলকে যা বলেছিল। (৩৭) শিখদের গুরু। (৩৮) স্বামীর ভগিনী। (৩৯) দুর্ধর্ষ।

উপর-নীচ : (১) তফাত। (২) গম্ভীর ধ্বনি। (৩) পিঙ্গল। (৪) অকারণ। (৫) যা দরাজ ছিল নবাবদের। (৬) এ-পাখি বড় সুকণ্ঠ। (৮) মকদ্দমায়, দেনায় যা হতে হয়। (১০) — নেই তার কাছা। (১৪) কানার চেয়েও এরা বেশি দিশেহারা। (১৬) দেশভ্রমণ। (১৭) মুসলিম ধর্মযোদ্ধা। (১৮) তুল্য। (১৯) রাজার কাছে দূতের নিবেদন। (২১) যার নিধনের জন্য দধীচিকে তনুত্যাগ করতে হয়েছিল। (২২) যা ফেলতে ভাঙা কুলোর দরকার। (২৪) নিষেধ। (২৫) সন্দেহযুক্ত। (২৭) ঘনীভূত। (২৯) বসার স্থান। (৩০) মমতা। (৩২) সমূহ। (৩৪) মাছ। (৩৬) ঝোলের লাউ, অম্বলের —। (৩৭) শব্দ।

গত সংখ্যার সমাধান

■	■	বা	ম	■	শ	শ	ধ	র	■
■	অ	বা	ধ্য	■	ব	স্ত্র	■	ক্ত	■
ল	স্বা	■	স্থ	বি	র	■	■	পা	তা
প	■	বা	ল	ক	■	■	চি	ত	ল
সি	ক	তা	■	শি	ব	নে	ত্র	■	■
■	■	হ	র	ত	ন	■	ক	র্ক	শ
ভ	র	ত	■	■	চা	ক	লা	■	তা
ব	ঙ্গ	■	■	মা	রী	চ	■	বা	য়ু
■	ভূ	■	র	থ	■	লা	জু	ক	■
■	মি	ট	মা	ট	■	ন	য়া	■	■

তার ম্যাজিকের মূল আকর্ষণ। টিনের চোঙে মুখ লাগিয়ে লোকটা শুধু ভালুক-ভালুক করে চেঁচাত, 'আমার ভালুক এখন এই খেলা দেখাচ্ছে, আপনারা আসুন উপভোগ করুন!' একটা লোহার রিংয়ের চারপাশে আগুন জ্বেলে দিত, ওই আগুনের ভেতরে রিংয়ের ফাঁকটুকু দিয়ে আমাকে লাফিয়ে পার হতে হত। কিন্তু মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার লম্বা লোম, শরীরটা একটু বেঁকে গেলেই ব্যস, সব শেষ! কিংবা কখনও, কোনওদিন আমার ভেতরের ভালুক-শক্তি যদি হঠাৎ জেগে উঠে বলে, 'তুই পশুসমাজে রাজার জাত, তুই শুনিসনি, লোকে কথায়-কথায় বলে, বাঘ-ভালুক? আর সেই তুই কি না একটা নোংরা লোকের কথায় ওঠ-বোস করছিস!' আমার ভয় হত, যদি সত্যি-সত্যি একদিন আমার শরীর বেঁকে বসে!

"সভাপতি মহাশয়, একদিন সত্যি-সত্যি তাই হল, সাত জায়গায় ম্যাজিকের আসর পেতেছিল ম্যাজিকওলা, আমি সব জায়গাতেই লাফিয়ে গিয়ে লাথি কষিয়েছি ওই গোল রিংটার গায়ে। একবারও গলে পার হওয়ার চেষ্টা করলাম না। ম্যাজিকওলা তার সাত নং ম্যাজিকের আসরেই সকলের সামনে আমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল।"

বাঘভূত 'হালুম' শব্দ করে দু'বার গা ভেঙে নিয়ে বলল, সভাপতি মহাশয়, শুনলে আপনারা অবাক হবেন যে, মানুষ আমার হালুম শব্দটাও কেড়ে নিয়েছিল। এক পশুবিজ্ঞানী আমাকে ছেলেবেলা থেকে কুকুরের বাচ্চা, বেড়ালের বাচ্চার সঙ্গে পালন করছিলেন। আমার গায়ের যে বাঘের গন্ধ তা লোপ পাওয়ানোর জন্য গায়ে সব সময় আতর ছড়িয়ে রাখা হত। আমাকে নিরামিষ খাবার খাওয়ানো হত। বিজ্ঞানী আমাকে নিয়ে গবেষণা করছিলেন, আমাকে কুকুর-বেড়ালের মতো একটা জীব তৈরি করতে পারলেই তিনি আমাকে জার্মানির এক সংগ্রহশালায় বেচে প্রচুর টাকা পাবেন। কিন্তু একটু বড় হতেই আমি বুঝতে পারলাম, কুকুর, বেড়াল ও আমি, আমরা এক নই। ওদের দু'জনকে তুলে আছাড় দিতে আমার একটুও পরিশ্রম হয় না, অথচ ওরা দু'জনে মিলে আমাকে তুলতেই পারে না। ওদের এক-একজনের আট-দশটা কামড় আমি অনায়াসে সহ্য করি, কিন্তু ওরা আমার দুটো দাঁত ফুটনোতেই ককিয়ে ওঠে। আমি একটা জোরে লেজের বাড়ি দিলে যে ওরা কে কোথায় ছিটকে পড়ে! আমি অচিরেই জেনে গেলাম, আমি হচ্ছি বাঘের বাচ্চা, ভুক-ভুক কি ম্যাঁও-ম্যাঁও করা আমার কাজ নয়। আমার হালুম-হালুম। একদিন সকাল থেকেই লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে হালুম-হালুম ডাকতে লাগলাম। আমার এক-একটা লাফ হতে লাগল বারো হাত করে। তখনই বিজ্ঞানী আমাকে গুলি করে মেরে দেন!"

সিংহভূত বলল, "আমাকে পিঠে করে রামছাগল বয়ে বেড়াতে হত সার্কাসে। জানেন সভাপতি মহাশয় ও পশুভূত বন্ধুরা, আমার দাড়ি ধরে ঝুলত চার-পাঁচটা মেনি বানরের বাচ্চা। আমি ওই সার্কাসওলার চরম শাস্তি চাই!"

এভাবে ছাগল, ভেড়া, উট...প্রজাপতিটি পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়ে মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে থাকে। মানুষ ওদের কাউকেই স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। মানুষের বিরুদ্ধে পশুপাখি, কীটপতঙ্গ সকলের এত অভিযোগ যে, অভিযোগে-অভিযোগে গণ্ডগোল বেধে গেল। শেষপর্যন্ত প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে সভাপতি মহাশয়কে চেঁচিয়ে 'বাবা-বাছা' করে সকলকে থামাতে হয়। তিনি লম্বা কান নেড়ে বলছেন, "বাবারা, আপনারা থামুন, শান্ত হোন!"

গাধার ধরা গলা, কী আর করবেন, ঈশ্বর যা দিয়েছেন! সকলে যখন কিছুটা শান্ত হল তখন তিনি নতমস্তকে বলছেন, "শুনুন,

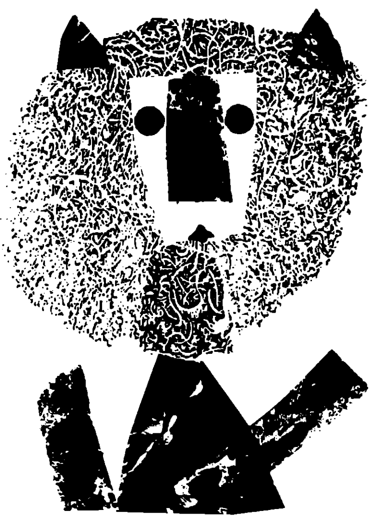

আপনাদের অভিযোগ শুনে আমারও মনে পড়ে গেল, আমি গাধা বলে এতদিন মনে পড়েনি। কিন্তু আপনারা কি জানেন মানুষই আমাকে গাধা তৈরি করেছে! আমার পিঠে একরাশ বোঝা তুলে দিয়ে সেই বোঝার ওপর বাপ-ছেলে চড়ে বসে, ছেলেটাও দশ বছর। আমাকে চড়াই ভেঙে-ভেঙে যেতে হয়। আমার কোমর বেঁকে যায়, শিরদাঁড়া বেঁকে যায়, চোখে সরষে ফুল দেখতে থাকি। চলতেই হবে, নইলে চাবুক। এভাবে চাবুক খেতে-খেতে, মানুষের ভার বইতে-বইতেই আমি একদিন পুরোপুরি গাধা হয়ে গেলাম। দেখতে-দেখতে আমার গা-র চামড়া মোটা হল, মার খেতে-খেতে শরীর থেকে কষ্ট-যন্ত্রণার অনুভূতিই চলে গেল একদিন, হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্য চোখের কোনা থেকে চোখের জল। আমি বোধ-বুদ্ধিহীন এক কিম্ভূত জন্তুতে পরিণত হলাম।" বলা শেষ হতে-না-হতেই গাধা সভাপতি মহাশয় হঠাৎ চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে বলল, "মরে ভূত হওয়ার পর তবে কান্না ফিরে পেয়েছি। মরে ভূত হয়ে প্রথম যখন কাঁদলাম সেদিন বুঝতে পারলাম যে, আমারও জীবন ছিল, একদিন আমিও বেঁচে ছিলাম।"

সব পশুভূত সমস্বরে বলতে লাগল, "সভাপতি মহাশয়, আপনি কাঁদবেন না, আপনি ওইসব মানুষের বিচার করুন, তাদের এই অত্যাচার করার জন্য এমন কঠোর শাস্তি দিন, যেন কোনও মানুষ কোনওদিন পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গের ওপরে নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে সাহস না পায়!"

সভাপতি মহাশয় চোখের কোনা মুছে বললেন, "হ্যাঁ, মানুষের কঠোর শাস্তিই প্রাপ্য।"

আমাদের শাস্তি হচ্ছে শুনেই পশুভূতের ছানাগুলো আনন্দে ডিগবাজি খেতে লাগল, দু-চারটে তো মুখের পাটি খুলেই এগিয়ে এল আমাদের দিকে, যেন এখনই মানুষকে কামড়ালে তবে তাদের শান্তি হবে।

সভা থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "সভাপতি মহাশয় যখন বলে দিয়েছেন মানুষের শাস্তি হবে, তখন হবেই, এ-ব্যাপারে আপনারা সকলে নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে যত বড় অপরাধীই হোক আত্মপক্ষ সমর্থনে তাকে কিছু বলতে বলা হয়। আমরা প্রধান সভাসদরা সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক করেছি ওদের কিছু বলতে দেওয়ার জন্য। কেন ওরা এই অত্যাচারীর ভূমিকা নিয়েছে, এদের কী বক্তব্য?"

সভাপতি মহাশয় সান্টা-বান্টাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী, তোমরা কি কিছু বলবে? বলতে চাইলে বলতে পারো!"

সান্টা-বান্টা ভাবছে, মানুষ সম্পর্কে কী সাফাই গাওয়া যায়! মানুষ যা কীর্তি করে বসে আছে তাদের সম্পর্কে তো ভাল কথা কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না!

প্রধান সভাসদ বললেন, "এই খোঁকাবাবুরা, তোমাদের যদি মানুষের 'ফর'-এ কিছু বক্তব্য না থাকে তা হলে বলো, সময় নষ্ট না করে আমরা সভাসদরা আলোচনা করে সভাপতি মহাশয়কে আমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিই। আমাদের সিদ্ধান্তের ওপরেই তো উনি ঠিক করবেন তোমাদের কী দণ্ড!"

আমি ফিসফিস করে বললাম, "দাদা, এই মওকা!"

দাদা জিজ্ঞেস করল, "মানে?"

"তুই আত্মপক্ষ সমর্থনে এমন কথা বল যেন ভূতগুলো শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়। বক্তৃতার জোরে কী না হয়! তুই ভাল করে গুছিয়ে বল, তুই পারবি, সেভেনে পড়িস! তুই কত জানিস রে দাদা—অ্যালজেব্রা, ফিজিক্যাল সায়েন্স, ত্রিকোণোমিতি..."

সান্টা বলে, "ভয়ে আমার হাত-পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে, তুই এ সময় আমাকে বক্তৃতা দিতে বলছিস! মা-বাবা কোনওদিন আমাদের বক্তৃতাই শুনতে দেননি, কীভাবে বলতে হয়, না, না, আমি পারব না রে বান্টা!"

বান্টা বলে, "পারবি না মানে, এ আমাদের বাঁচার লড়াই, বাঁচতে হলে এ-লড়াই জিততে হবে!"

সান্টা বলল, "একটা কাজ করতে পারি।"

"কী?"

"আমাদের ক্লাসের 'সমাজের প্রতি ছাত্রদের কর্তব্য' এই নিয়ে একটা রচনা লিখে দিয়েছিলেন, বাংলা-সার, তারই প্রথম ছ'-আট লাইন... শোন না, কোটেশন দিয়ে আরম্ভ।

ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান
হও সবে আগুয়ান
সাথে আছে ভগবান..."

বান্টা ঝট করে থামিয়ে দেয়, "দাদা, থাম, থাম! ভূতের কাছে ভগবান-ভগবান করিসনি! ভগবান শুনলেই সব ভূত এসে গলা টিপে ধরবে!"

বান্টা সভাপতি মহাশয় ও সভাসদগণকে সম্বোধন করে বলল, "আমি আপনাদের কাছে জোড়হাতে আবেদন জানাচ্ছি, আমরা দু'জনেই একেবারে শিশু, এখনও মা শুয়ে-শুয়ে গল্প না বললে আমাদের ঘুম আসে না। তা আমরা এরকম অবোধ বাচ্চা ছেলে, আমরা না হয় একটা অপরাধ করে ফেলেছি, সেজন্য আপনারা আমাদের মেরে ফেলবেন!"

বান্টার কথা শেষ হল না, সান্টা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।

সভাপতি চুকচুক করে বললেন, "আহা, তোমরা আবার কাঁদো কেন? তোমাদের বক্তব্য তোমরা বলো, আমরা শুনব। হ্যাঁ, তোমরা একেবারে ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ তো দোষ-ত্রুটি করেই, ওই তো সেদিন আমার ছেলে খেলতে-খেলতে আমার কানের গর্তে একটা

আমার আছে

চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমার তো নেই খেলনাপাতি
আমার তো নেই বাড়ি,
আমার আছে ছোট্ট সোনা
এই ভাব, এই আড়ি।

আমার তো নেই প্রশস্ত পথ
আমার তো নেই ছুটি,
আমার আছে ছোট্ট সোনা
মন-ভরা খুনসুটি।

আমার তো নেই রামের ধনু
আমার তো নেই পথ,
আমার আছে ছোট্ট সোনা
বুক-ভরা শপথ।

আমার তো নেই কালি-কলম
আমার তো নেই খাতা,
আমার আছে ছোট্ট সোনা
পদ্যে-ভরা পাতা।

আমার তো নেই তেপান্তরে
সওয়ার হওয়া ঘোড়া,
আমার কাছে ছোট্ট সোনা
দুষ্টুমিতে ভরা।

ছবি : দেবাশিস দেব

শক্ত শুকনো বাঁশের কঞ্চি এমন ঢুকিয়ে দিল, সেই থেকে এই কানটায় কিছু শুনতে পাচ্ছি না। কিন্তু তাই বলে কি ছেলেটাকে মেরে ফেলব! নাও, তোমরা আত্মপক্ষ সমর্থনে কী বলছ বলো, শুনি, তারপর রায়।"

সান্টা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "কী বলব সভাপতি মহাশয়, শুধু একটা কথাই বলতে পারি..."

সে শুনল না, সমাজের প্রতি ছাত্রদের কর্তব্য রচনাটাই মুখস্থ বলতে লাগল।

"ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান
যারা আছ হেথা বিদ্যমান
ভূত কিংবা প্রেত
মোরা সবে সকলে সমান
আমাদের সকলেরই হবে-হবে জয়।"

সঙ্গে-সঙ্গে হাজারো ভূত-কণ্ঠের উল্লাসধ্বনি, হাজারো ভূত-হাড়ের তালি বাজানো। আশ্চর্য, দাদার মুখে ভুলে ভরা মূর্খের মতো বানানো, ছন্দভাঙা পদ্য শুনে সবাই মোহিত হয়ে গেল! যে বাচ্চা ভূতটা খানিক আগে দাঁত বের করে আমাদের কামড়াতে চাইছিল, সেও দাদার পদ্য শুনে প্রাণভরে গায়ের হাড় বাজাচ্ছে। আসলে দাদা যে বলেছে, 'মোরা সবে সকলে সমান'। ভূত আর মানুষ সমান, কেউ ছোট-বড় নয়, মানুষের মুখে এ-কথা শুনে ভূতগুলো সব বেজায় খুশি।

দুধি আমাদের পাশে বসে লেজ নেড়ে-নেড়ে বিচার শুনছিল। সে বুঝতে পেরেছে এর পর আমাদের দোষ মুকুব হচ্ছেই! সে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "সভাপতি মহাশয়, তা হলে মানুষ আর কারও ওপর কোনও অত্যাচার করবে না? সে আর গাছ কাটবে না? মধুর চাক ভাঙবে না? জঙ্গলে ঢুকে হরিণ-শূকর বধ করবে না? শেয়ালের বংশ লোপ করার জন্য উঠে পড়ে লাগবে না? গোরুকে ইঞ্জেকশন দিয়ে তার রক্ত জল করে আর দুধ বের করবে না? কুকুরকে চেন দিয়ে বেঁধে রাখবে না, অসহায় ছাগল-মুরগিকে কাটবে না? বেড়ালকে থলেয় ভরে ভাল করে থলের মুখ বেঁধে হিজলতলায় ছাড়তে আসবে না?"

সান্টা বলল, "আমরা তোকে থলেয় ভরে নিয়ে আসিনি দুধি, মিথ্যে দোষ দিস নে!"

আমি বললাম, "দুধি, আমরা কোনওদিন আর এরকম করব না, কথা দিচ্ছি!"

"আরে, শুধু তোদের কথা হচ্ছে না, তোদের ওই যে টুকরি বোন, একফোঁটা মেয়ে, সেও কী নৃশংস, আমার পিঠ বেঁকিয়ে দিয়েছিল ঝাঁটা মেরে! তোদের ঘরের বারান্দার ভেন্টিলেটারে একটা চড়ুই পাখির বাসা ছিল, একদিন আমাকে জোর করে ছুড়ে দিল কার্নিশে, বলল, 'যা, পাখির বাচ্চা কিচমিচ করছে, খেয়ে নে গে যা!' আমি না খেয়ে নেমে এলাম দেখে আমাকে কী মার!"

মানুষের লজ্জায় আমাদের দু' ভাইয়েরই মাথা হেঁট হয়ে আসে। পাখির বাচ্চা খেয়ে নেওয়ার জন্য যে বেড়াল লেলিয়ে দেয়, তার হয়ে কী ওকালতি করব!

দুধি সভাপতিকে সম্বোধন করে বলল, "আর দেখুন, ওই যে দাঁড়িয়ে আছেন সান্টা-বান্টার বাবা। উনি নাকি কোনও বিখ্যাত কোম্পানির বড় অফিসার! মাসে সাড়ে আট হাজার টাকা বেতন পান, কিন্তু সাড়ে আট পয়সারও হৃদয়বৃত্তি নেই। আমাকে কতবার যে বুটে করে শট মেরেছেন, যেন আমি ফুটবল! হ্যাঁ গো সান্টা-বান্টা, তোমাদের পিতাজি কি ইস্টবেঙ্গলে খেলতেন?"

ছোট ভূতগুলো সব হেসে গড়িয়ে পড়ে। কেউ-কেউ আবার ফুটবলের বিখ্যাত বাইসাইকেল কিক মারার ভঙ্গিতে উলটেও পড়ল।

"উনি একদিন বন্দুক নিয়েও বেরিয়েছিলেন আমাকে মেরে ফেলার জন্য। সেদিন সান্টা-বান্টা আমাকে লুকিয়ে না ফেললে...! সুন্দর করে সাজানো রসগোল্লার প্লেট থেকে একটা রসগোল্লা তুলে নিয়েছিলাম, বাব্বাঃ, এতেই বন্দুক! তা যুবা বয়সে উনি নাকি বিখ্যাত শিকারি ছিলেন। এখনও বৈঠকখানার দেওয়ালে গর্বের নিদর্শনস্বরূপ একটা হরিণছাল ফোটোর মতো বাঁধিয়ে রেখেছেন, বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত এলে লোকে যেমন গোল্ড মেডেল দেখায়, উনি তেমনই হরিণবধ দেখান। পশুশিকার মানুষের সবচেয়ে গর্বের! এমনকী, সান্টা-বান্টা আনন্দের সঙ্গে শিকারকাহিনী পড়ে!"

আমি বললাম, "আমরা দু' ভাই কোনওদিন বন্দুক ধরব না, কোনওদিন শিকার করব না! তুমি বললে শিকারকাহিনীও পড়ব না, শুধু পড়ি,পড়তে ভীষণ ভাল লাগে বলে, আমরা শিকারকাহিনী পড়ে শিকারি হব এজন্য নয়!"

সভাপতি মহাশয় বললেন, "না, তোমরা কাহিনী পড়বে না কেন, কাহিনী তো গল্প! কিন্তু তোমাদের টুকরি বোনকে বলো, ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুলে পড়ছে তো, তার ঝাঁটা হাতে করাটা ঠিক শোভা পায় না!"

সান্টা তাড়াতাড়ি বলে, "আজ্ঞে, আমরা কথা দিচ্ছি, ও আর কোনওদিন ঝাঁটা স্পর্শও করবে না!"

সভাপতি মহাশয় বললেন, "আর বাবাকে বলো, উনি যেন দেওয়াল থেকে হরিণের চামড়াটা খুলে নেন!"

সঙ্গে-সঙ্গে প্রধান সভাসদ বললেন, "বাঁবারা, ওঁখানে যঁদি তোঁমাদের ঠাঁকুর্দার ছাঁল-চাঁমড়া টাঙিয়ে রাখা হত, ওঁর কি ভাল লাগত, তখন কি লোককে ডেকে-ডেকে দেখাতেন?"

ভূতগুলো সব হো-হো করে সভা কাঁপিয়ে হেসে ওঠে। সান্টা বলে, "হরিণের চামড়াটা ওঁর খুনের চিহ্ন বলে মনে হয়নি, মনে হয়েছে কৃতিত্বের উদাহরণ!"

সভা জুড়ে আর-একপ্রস্থ হাসি ভূতদের।

"একজনের মৃত্যু আর-একজনের কৃতিত্ব!"

ভূতগুলো সব বিদ্রূপ করতে থাকে।

দুধি ঝাঁজগলায় বলল, "কী বলছেন, এদের মায়ের মতো এমন স্বার্থপর মহিলা আমি দুটি দেখিনি! বাড়িতে যে-কোনও ভাল খাবারদাবার আসুক সব তাঁর ছেলেমেয়ে, স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি, এঁরাই শুধু খাবেন। বাড়িতে যে আরও কেউ আছে, একটা বেড়াল, একটা কুকুর, চারটে চড়ুই, দুটো কাক, দুটো ইঁদুর...ওরা একটা কিছু মুখে তুললেই মার! হাতের কাছে যা পান, বঁটি ছুড়ে তো একদিন আমাকে কেটে ফেলেছিলেন আর কী! পিঠে এখনও কাটা দাগ আছে। আমি দু' মাস ধরে চেষ্টা করে ভাল করেছি!"

সান্টা-বান্টা দু'জনে একসঙ্গে বলল, "মা'কে মাফ করে দিন সভাপতি মহাশয়। মাকে বঁটিই রাখতে দেব না বাড়িতে। সবজি কাটার মেশিন আনব, আমাদের জেলা দপ্তরে প্রদর্শনী হয়েছিল, সেখানে দেখিয়েছিল ছোট্ট একটা মেশিনে আলু-পেঁয়াজ-কপি-বরবটি সবকিছু কাটা হচ্ছে ঘ্যাঁস-ঘ্যাঁস করে। মা দাম জিজ্ঞেস করেছিলেন, পঁয়ত্রিশ টাকা বলেছিল।"

সভাপতি হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, "মা কি একটুকরো মাছ এর পর দুধিকে রোজ দেবেন? তা হলে আমরা না হয় এবারের মতো...।"

সান্টা-বান্টা লাফ খেয়ে বলে, "একটুকরো নয়, একটা গোটা পিস ও এবার থেকে খাবে। ওরা আমাদের পরিবারের মেম্বার—বেড়াল, কুকুর, কাক, চড়ুই, পিঁপড়ে, ইন্দুর......আমরা সকলে এক পরিবারের। এটা মা-বাবাকে স্বীকার করিয়ে ছাড়ব! আজ থেকে আমরা সবাই ভাই-ভাই।"

দুধি বলল, "সভাপতি মহাশয়, ওই দুধঅলাকে কিন্তু ছাড়বেন না। ও শুধু আমাকে জলে ফেলে দিয়েছিল তাই নয়, প্রতি বছর ওর গোয়ালে যে বাছুর জন্মায় দুধ না খাইয়ে-খাইয়ে সবক'টাকে মেরে ফেলে, দু'বেলা নিংড়ে দুধ দুয়ে নিলে বাচ্চা বাঁচবে কী করে? বাচ্চা মারা গেলে ওর সুবিধে,একফোঁটাও দুধ বাজে খরচ হয় না, সব ওর বালতিতে পড়ে! বাচ্চার শোকে ঠ্যাং নাড়বে, দু' ঠ্যাংই কষে বেঁধে দেয়, গাই গোরুগুলোর পা একবার দেখে আসবেন চলুন, কেমন দগদগে ঘা হয়ে গেছে! ওকে শাস্তি দিন!"

সান্টা বলে, "এক যাত্রায় দু'রকম ফল করিসনে দুধি! আমরা সবাই দোষী, কেউ একটু বেশি, কেউ একটু কম।"

বান্টা বলে, "আমরা কথা দিচ্ছি, ও রোজ একপো করে দুধ কুকুর-বেড়ালকে দেবে!"

সান্টা বলল, "গাই বাছুরকে সুস্থ রাখবে! গোরুর ঘায়ে যাতে মলম লাগায় আমরা সেটাও দেখছি!"

খানিক পরেই সভাপতি গাধা রায় পড়ার মতো করে বলতে লাগলেন, "অদ্যকার বিচারসভায় আসামি মনুষ্যগণকে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি প্রদান করা হল..... মনুষ্যগণকে ক্ষমা করা হল...... সভার কাজ এখানেই শেষ।"

বেড়াল ছেড়ে দিয়ে হিজলগাছের ঠাণ্ডা বাতাসে বসতে-বসতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সান্টা-বান্টা। ইস, কী গভীর ঘুম!

ছেলে দুটো বাড়ি ফেরেনি বলে সবাই মিলে খুঁজতে বেরিয়েছে। বেড়াল ছাড়তে গিয়ে.....কিড্ন্যাপ হয়ে গেল! ছেলেধরা! সেই বিকেল থেকে খোঁজা চলছে!

খুঁজতে-খুঁজতে হিজলতলায় এসে দ্যাখে, দু' ভাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তাদের মাঝখানে দুধিবেড়াল, সে বসে পাহারা দিচ্ছে।

সবাই যখন সান্টা-বান্টাকে খুঁজতে বেরোয় তখন বুড়ুর কী কান্না, "আমি বড়দার কাছে যাব, আমি ছোটদার কাছে যাব!" সেজন্য বুড়ুকেও সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। এ কী, সঙ্গে তাদের দুধঅলা নবীন কাশ্যপও এসেছে! চোখেমুখে টর্চ-হ্যাজাকের আলো পড়তে ঘুম ভেঙে প্রথমটা খুব হকচকিয়ে যায়, তারপর সব মনে পড়ে।

এত লোকজন দেখে দুধি সরে পড়ছিল। মার খাওয়ার ভয়ে, হাতে লাঠিসোটাও আছে কারও-কারও।

সান্টা-বান্টা দৌড়ে গিয়ে দুধিকে ধরে কোলে তুলে নেয়। দু' ভাই-ই কেঁদে চিৎকার করে বলে, "মা, বাবা, দুধিকে আমরা ছেড়ে যেতে পারব না!"

সান্টা-বান্টাকে সকলে আদর করে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে। দুধিবেড়াল আবার ওদের কোলে। একবার সান্টা, একবার বান্টা কোল বদলায়। একটু পরেই কোল আলো-করা শিশুর মতো পরম নিশ্চিন্তে দুধির নাক ডাকতে থাকে।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

ছোটদের জন্য অভিনব ক্যাসেট

রণরঙ্গিণী দুর্গা
দি গ্রামোফোন কোম্পানি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড
৩৩ যশোর রোড,
কলকাতা-৭০০ ০২৮
একসঙ্গে দুটি ক্যাসেটের
দাম : ৫০ টাকা

মহালয়ার দিন দেবী দুর্গার বোধনের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের জীবনে মিশে গেছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'মহিষাসুরমর্দিনী' চণ্ডীপাঠ। তাঁর সেই অসাধারণ স্তোত্রপাঠ এবং বিখ্যাত সব শিল্পীর অসাধারণ সেই সব গান আমরা সহজে ভুলব না। মহিষাসুরমর্দিনীর বিপুল জনপ্রিয়তার কথা মনে রেখে

গ্রামোফোন কোম্পানি ছোটদের এই ক্যাসেটের পরিকল্পনা করেছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডী অবলম্বনে ছোটদের এই গীতিনাট্যের নাম 'রণরঙ্গিণী দুর্গা'। ক্যাসেটটি শুরু হয়েছে ছোটদের কণ্ঠে ঠাম্মার কাছে গল্প শোনার বায়না দিয়ে। তাদের বায়না শুনে ঠাম্মা গল্প বলতে শুরু করেন। তাঁর গল্প বলায় প্রথমেই একটি ত্রুটি রয়েছে। তিনি বলেন—

"অনেকদিন আগে আমাদের ভারতবর্ষে সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন। সে খুব সৎ এবং ধার্মিক ছিলেন।" এই 'সে' এবং 'ছিলেন'—তুমি-আপনির ত্রুটি কানে পীড়া দেয়।

এর পর গল্পের মধ্য দিয়ে নাটকে প্রবেশ। সঙ্গে রয়েছে গানের ডালি। বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রচিত গানগুলি ছোটদের ভাল লাগে। অসুরের কণ্ঠের গান—'বাজা রে রণভেরী, আয় রে রথের রথী' বা 'রাখ, রাখ, রাখ অমন মেয়ে দেখেছি যে ঢের' ছোটদের খুশি করবে। গানগুলিতে সুর দিয়েছেন সুকুমার মিত্র। নাটক পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেছেন অপর্ণা গাঙ্গুলি এবং অরুণাভ গাঙ্গুলি। নাট্যরূপ, গ্রন্থনা, আবহসঙ্গীত এবং সম্পাদনার কাজ যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে করা হয়েছে। গুরুভার বিষয় নিয়ে তৈরি এই সুন্দর ক্যাসেটটি ছোটদের ভাল লাগবে। গ্রামোফোন কোম্পানির এই চেষ্টা নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য।

খুদে ম্যাজিশিয়ান

ছোট্ট মেয়ে রোশনি শীল সম্প্রতি 'সারা ভারত ম্যাজিক উৎসব'-এ ম্যাজিক দেখিয়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে। কালিকটে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে এসেছিলেন ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল থেকে ৮২ জন বিখ্যাত জাদুকর। বাংলার প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিল রোশনি, সঙ্গে ছিলেন ওর বাবা বিখ্যাত জাদুকর প্রিন্স শীল। দর্শকরা রোশনির ম্যাজিক দেখে এতই খুশি যে, স্থানীয় মেয়রের অনুরোধে ওকে পর পর তিনদিনই ম্যাজিক দেখাতে হয়। এমনকী তাকে 'চিলড্রেন ম্যাজিক ক্লাব'-এর উদ্বোধনও করতে হয়।

সাড়ে আট বছরের রোশনি খুব ছোট থেকেই ম্যাজিক দেখাচ্ছে। ওর বাবা যেখানেই ম্যাজিক দেখান, সেখানে রোশনিও হাজির থাকে। খুব সামান্য জিনিস দিয়ে আশ্চর্য সব ম্যাজিক দেখায় রোশনি। আরও প্রশংসার কথা, পরিবেশ

ম্যাজিক দেখাচ্ছে রোশনি শীল

দূষণ, গাছ বাঁচানো, পশুপাখির কষ্ট দূর করার কথা ম্যাজিকের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে তুলে ধরে এই ছোট্ট জাদুকরটি। লোরেটো (বউবাজার) স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী রোশনি লেখাপড়াতেও বেশ ভাল। মরা গাছে ফুল ফুটিয়ে বন্ধুদের বহুবার অবাক করে দিয়েছে রোশনি।

কলকাতা, কলকাতা

কলকাতা এক স্বপ্নের শহর। এখানে মানুষের দুঃখ-দুর্দশাও যেমন আছে, তেমনই আছে আনন্দের অঢেল উপকরণ। কলকাতা ছেড়ে দূরে গেলে, টের পাওয়া যায় কলকাতার দুর্বার আকর্ষণ, মায়াময় ভালবাসা। তাই কলকাতাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য কবি, শিল্পী থেকে সাধারণ

ইডেন উদ্যানের 'প্যাগোডা'

মানুষের চেষ্টার শেষ নেই। কেউ কলকাতাকে নিয়ে দারুণ ছবি এঁকেছেন, কেউ লিখেছেন কবিতা, গল্প বা উপন্যাস, আবার কেউ উপহার দিয়েছেন গান।

আলোকচিত্রীরাও বসে নেই। তাঁরাও অনেকে তাঁদের ক্যামেরায় ধরে রেখেছেন কল্লোলিনী কলকাতাকে। সম্প্রতি অশোক দে প্রকাশ করেছেন 'সিটি অব জয়' নামে কলকাতার একটি মূল্যবান রঙিন আলোকচিত্রের সঙ্কলন। ২৫ টাকা দামের এই সঙ্কলনটিতে আছে নিক্কো পার্ক, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া থেকে পাতাল রেল, জাতীয় গ্রন্থাগার, নন্দন বা দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-এর মতো ২৭টি রঙিন 'পিকচার পোস্টকার্ড'। পুরনো কলকাতার পাশাপাশি খুঁজে পাওয়া যায় নতুন কলকাতাকে।

শুধু ক্যামেরার চোখ দিয়ে নয়, রঙে ও রেখায় এই কলকাতাকে ধরে রাখার কাজে শিল্পীদের নিষ্ঠার

অভাব নেই। তরুণ শিল্পী সমীর বিশ্বাসের আঁকার প্রায় সবটাই জুড়ে আছে কলকাতা। তিনি প্রকাশ করেছেন 'পোর্ট্রেট অব ক্যালকাটা' নামে পোস্ট কার্ড সাইজের ছবির ১৫টি সেট। প্রত্যেকটি সেটে আছে ১০টি বা তার বেশি ছবি, দাম ন' টাকা থেকে ৪৫ টাকা। বড় প্রিন্টও আছে অনেক। এক-একটির দাম পাঁচ টাকা থেকে ২৫ টাকা। এ ছাড়া, আছে কলকাতার ছবি দিয়ে তৈরি রাইটিং প্যাডও। ইতিমধ্যেই তাঁর আঁকা কলকাতার ছবি অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছে। পুরনো কলকাতার ছবিও এঁকেছেন তিনি। তাঁর এইসব কাজ সংগ্রহে রাখার মতো। সব মিলিয়ে কলকাতা নিয়ে শিল্পী সমীর বিশ্বাসের আঁকা ছবি ভাল লাগবে খুব।

বর্ণপ্রিয় বসু

গোয়েন্দা শার্লক হোমস্

সার আর্থার কোনান ডয়েল

ছবি : এডিথ মাইসর, ফ্র্যাঙ্ক জকোলা

গোয়েন্দা শার্লক হোমস

সার আর্থার কোনান ডয়েল

ছবি : এডিথ মাইসর, ফ্রাঙ্ক জকোলা

আর্চি
ক্লাসে ঘুমের জন্য কি তোমাকে আবার আটকে রেখেছে ?
না ! আটক থাকার সময় ঘুমের জন্য আটক হয়েছি !
জাগহেড ! তুমি ছুটির পরে আটক আছ ! জায়গায় ফিরে যাও !
কিন্তু আর্চিকে বলতে চাই বসে থেকো না !
ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর গাড়িতে বসে আছে !
বাড়িয়ে বলা বন্ধ করো ! ও পনেরো মিনিট বসে আছে !
জাগহেড !!
জল খেতে চাই ! আমি তেষ্টায় মরে যাচ্ছি !
মরে যাচ্ছ না ! তুমি বাড়িয়ে বলছ !
জল চাও ? আমি জল এনে দিচ্ছি !
হতভাগা জাগহেড ! ওকে ফেলেই চলে যাচ্ছি !
দুম
এই রে ! ঝামেলা বাধিয়েছি !
আমি নাকি বাড়িয়ে বলি !
10-24

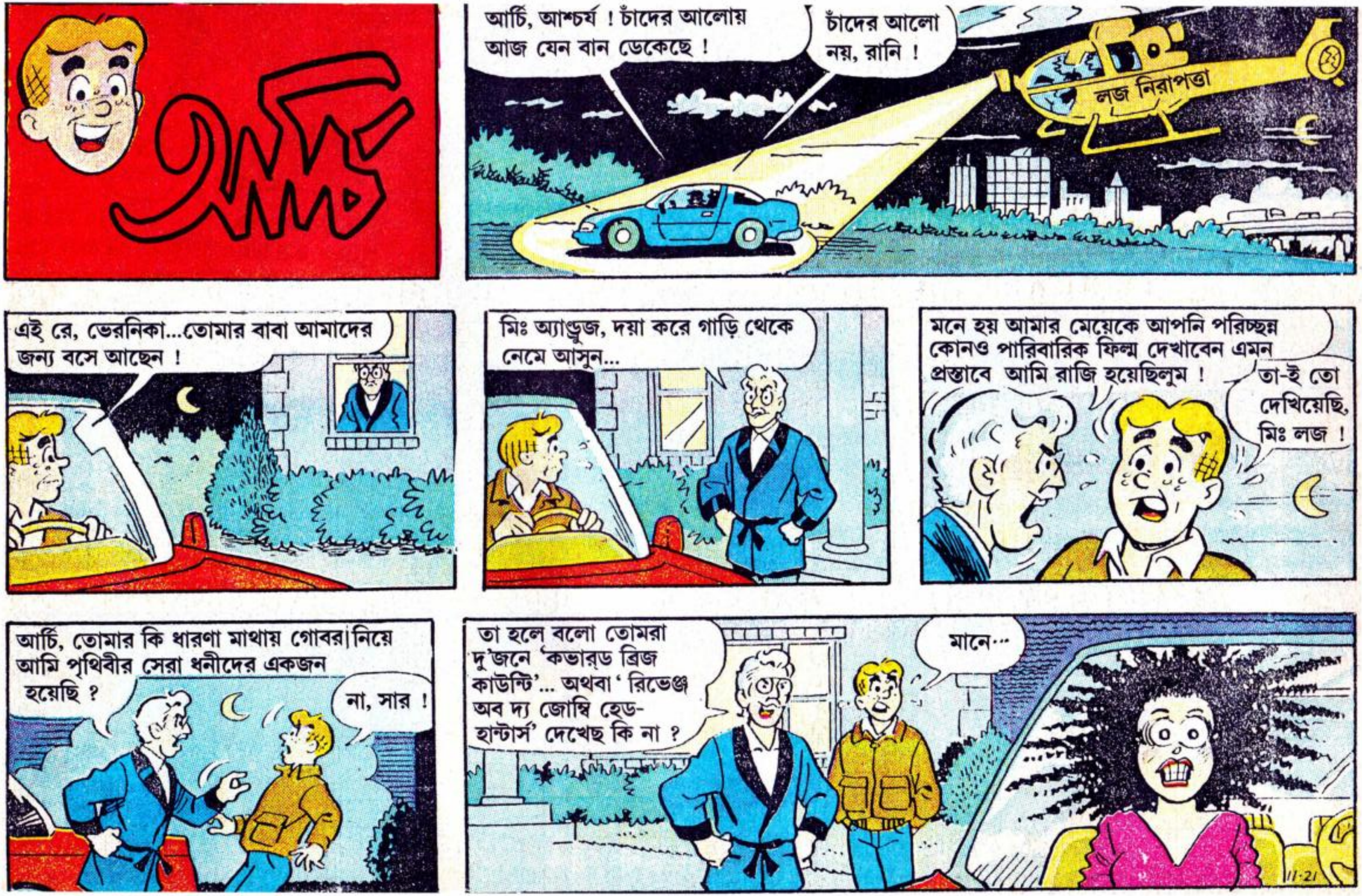
আর্চি
আর্চি, আশ্চর্য ! চাঁদের আলোয় আজ যেন বান ডেকেছে !
চাঁদের আলো নয়, রানি !
লজ নিরাপত্তা
এই রে, ভেরনিকা...তোমার বাবা আমাদের জন্য বসে আছেন !
মিঃ অ্যাণ্ড্রুজ, দয়া করে গাড়ি থেকে নেমে আসুন...
মনে হয় আমার মেয়েকে আপনি পরিচ্ছন্ন কোনও পারিবারিক ফিল্ম দেখাবেন এমন প্রস্তাবে আমি রাজি হয়েছিলুম !
তা-ই তো দেখিয়েছি, মিঃ লজ !
আর্চি, তোমার কি ধারণা মাথায় গোবর নিয়ে আমি পৃথিবীর সেরা ধনীদের একজন হয়েছি ?
না, সার !
তা হলে বলো তোমরা দু'জনে 'কভারড ব্রিজ কাউন্টি'... অথবা 'রিভেঞ্জ অব দ্য জোম্বি হেড-হান্টার্স' দেখেছ কি না ?
মানে...
11·21

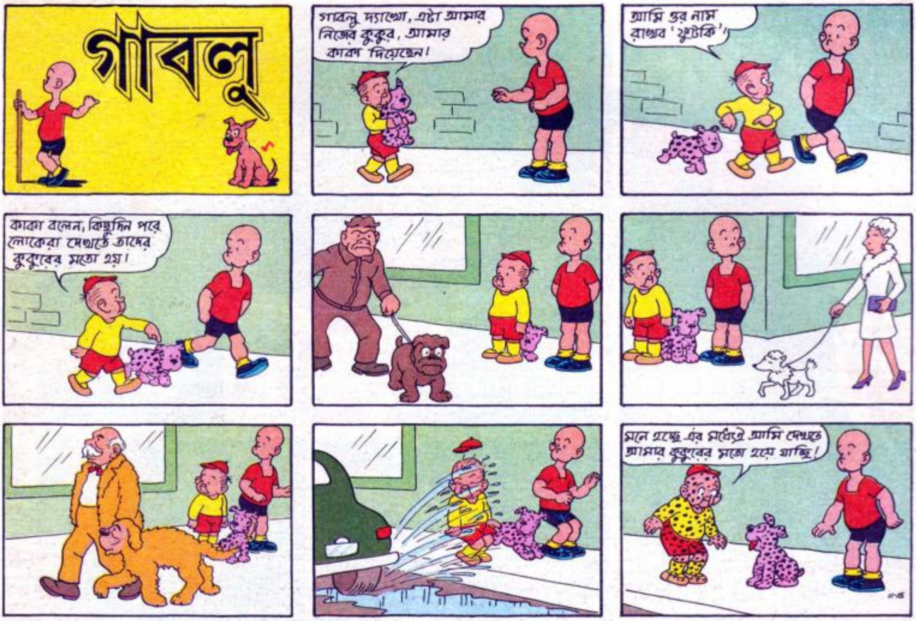
গাবলু
গাবলু দ্যাখো, এটা আমার নিজের কুকুর, আমার কাকা দিয়েছেন।
আমি ওর নাম রাখব 'ফুটকি'।
কাকা বলেন, কিছুদিন পরে লোকেরা দেখতে তাদের কুকুরের মতো হয়।
মনে হচ্ছে এর মধ্যেই আমি দেখতে আমার কুকুরের মতো হয়ে যাচ্ছি!

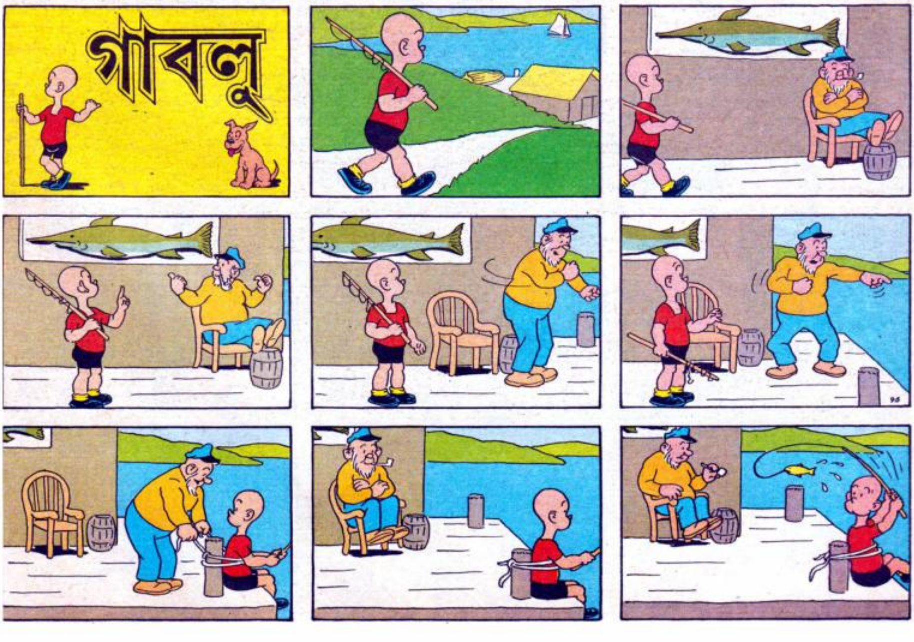
গাবলু

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
কাছে চলো !
হয়তো তোমার কথাই ঠিক... নীচে কিছু যেন নড়াচড়া করছে ।
দক্ষিণ আমেরিকায় আমাজনের বিষুব অরণ্যে পুরস্কারের লোভে খুনিরা যখন এস্তেবান মার্তোনেসকে ঘিরে ধরছে টারজান তখন মারিয়া মার্তোনেসকে রাক্ষুসে ময়ালের আলিঙ্গন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে...
ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও !
লুকিয়ে পড়ো... ...এখনই...
ওদের রেডিয়োতে বলে দাও যে,পুরস্কার পেতে হলে ওদের তাড়াতাড়ি এখানে এসে পৌঁছতে হবে ।
ধৈর্য ধরো, বিরাট একটা চমক পাবে ।
দুঃখিত, আমরা ব্রাসিলিয়া যাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের নেমন্তন্ন নেই !

ধারাবাহিক উপন্যাস

মন্দারগড়ের রহস্যময় জ্যোৎস্না

বিমল কর

কুমারসাহেব হলেন প্রবীণ লোক, আমাদের মতন ছেলে-ছোকরার হঠকারিতা তাঁর নেই। তবে উৎসাহ আছে ; প্রবল উৎসাহ।

সেদিন সন্ধেবেলা কুমারসাহেবকে ঘিরে আমাদের আলোচনা হল অনেকক্ষণ। প্রথমেই যা দেখলাম, কুমারসাহেব এমন একটা ব্যবস্থা করছেন যেন আমরা কোনও শিকারের ক্যাম্প বসাতে যাচ্ছি কোথাও। গাড়ির তেল-মোবিলের ব্যবস্থা থেকে নিজেদের থাকা-খাওয়ার সবরকম ব্যবস্থা তিনি করে ফেললেন। একটাই অসুবিধে হল, কুমারসাহেব তো তাঁবুর ব্যবস্থা করে আসেননি— কাজেই বনে-জঙ্গলে তাঁবু ফেলে থাকতে পারবেন না, পাঁড়েজির ধর্মশালাতেই থাকতে হবে।

ব্যবস্থা পাকা করে কুমারসাহেব বললেন, "ডায়েরিতে কী লেখা আছে একবার পড়ো। ভাল করে শুনি।"

ডায়েরি খাতাটা আমার কাছে-কাছে থাকে। পড়লাম, যা লেখা ছিল।

মন দিয়ে শুনলেন কুমারসাহেব ; তারপর বললেন, "স্ট্রেঞ্জ ! আমি এতকাল আছি এদিকে— এত ঘোরাফেরা করেছি— কিন্তু তোমাদের ওই জ্যোৎস্নার কথা তো শুনিনি। প্রোটেক্‌টেড এরিয়ার কথা যা শুনেছি, বলেছি তোমাদের।"

আমি যেন একটু আহত হয়ে বললাম, "কথাটা কি মিথ্যে বলছেন ?"

কুমারসাহেব মাথা নাড়লেন। "না, তা বলছি না। তবে এরকম একটা ঘটনার কথা এখানে কেউ জানবে না, এ কেমন করে হয় !"

"যদি না হয় তবে দাদা খবরটা পাবেন কোথা থেকে ?"

কুমারসাহেব মাথা নাড়লেন, তা ঠিকই। তারপর বললেন, "গুজব নয় তো ! চোখের ভুলে কতরকম গুজব রটে। আবার গুজব নিয়ে বইপত্রও লেখা হয়। দেখো, আমি নিজে একটু-আধটু ইউ. এফ. ও. নিয়ে বইপত্র দেখেছি। আমার ইন্টারেস্টও আছে। কিন্তু দেখলাম— ওই যে গ্রহান্তর থেকে মাঝে-মাঝে এটা-সেটা আমাদের পৃথিবীতে নেমে আসে বলে শোনা যায়, তার বেশিরভাগটাই গল্প।"

"আমরা—" আমি বললাম, "আমরাও ওসব বিশ্বাস করতে পারি না কুমারসাহেব, কিন্তু একেবারে গল্প বলে উড়িয়ে দিতেও পারি না

এটা। বিশেষ করে এই ঘটনার পর। আমার বড়দা মিথ্যে কথা লেখার মানুষ নয়।"

"না, না— তা নয়। তুমি হয়তো অবাক-অবাক ঘটনার কথা অনেক পড়েছ। আমি সামান্য পড়েছি। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় একসময়— সালটা বোধ হয় সিক্সটি সিক্স, সিক্সটি সেভেন হবে, ঝাঁকে-ঝাঁকে অদ্ভুত জিনিস দেখা যেত। হিউজ ফিগার— সাত ফুট মতন লম্বা, রেড আইজ, জাইগেনটিক উইংস ফোল্ডেড। তা এসব দৃশ্য দেখার পর গবেষণাও অনেক হয়েছিল— কিছুই ধরা পড়েনি। আগুনে গোলা, নীল মতন দেখতে, ছাতার মতন একরকম ইউ. এফ ও., সসার— এরকম কত কিসের কথা শোনা যায়। প্রমাণ কিছু হয়নি। তার মানে আমি বলছি না, তোমার দাদা মিথ্যে-মিথ্যে কথাগুলো লিখেছেন। আমি বলছি, তাঁর শোনার ভুল হতে পারে। চোখের ভুলও।"

"চোখের ভুল?"

কুমারসাহেব হাসলেন, "হ্যাঁ, চোখের ভুলটাই বেশিরভাগ সময় হয়। নেচার মিসলিড্‌স আস।"

"তা কেমন করে হবে?"

"হয়।... তোমাদের বয়েস কম— এখন বুঝবে না; পরে দেখবে— চোখ অনেক সময় ভুল করে, মনও ভুল করে। কিছু রিড্‌ল থেকে যায় ভাই মিরার বা আয়নার কথাই ধরো। আয়নায় আমরা রিভার্স দেখি। কিন্তু মাথা বা পায়ের বেলায় তো সেটা উলটে যায় না। মাথা ওপরেই থাকে। পা নীচে। যাক গে, কাল আমরা ওই জায়গাটায় যাব। ওটা মন্দারগড় হোক, বা মানিদাগড় যাই হোক, যাব। দেখব সেখানে কী রহস্য আছে!"

পরের দিন বিকেলের গোড়ায় গিরিলালের ধর্মশালায় পৌঁছে গেল কুমারসাহেবের ট্রেকার।

গাড়িতে আমরা চারজন। কুমারসাহেব, তাঁর ড্রাইভার, আনন্দ আর আমি।

পাঁড়েজি ট্রেকার গাড়ি দেখে কেমন থতমত খেয়ে গেল।

কুমারসাহেব দু-তিনটে ঘরের ব্যবস্থা করে নিলেন পাঁড়েজির সঙ্গে।

পাঁড়েজির লোক লালা ঘরদোর পরিষ্কার করে— দড়ির খাটিয়া বিছিয়ে দিল।

বিকেলে আমাদের চা খাওয়া হল— কুমারসাহেবের ব্যবস্থা।

সন্ধে হয়নি তখনও।

কুমারসাহেব বললেন, "চলো।"

সারাদিন পরে বিকেল থেকে সামান্য মেঘলা হয়েছিল। বৃষ্টি হবে বলে অবশ্য মনে হয়নি।

ট্রেকারের মধ্যে আমাদের নানান সরঞ্জাম। কুমারসাহেবের ব্যবস্থা সব। খাবার-দাবার থেকে বিশ্রাম নেওয়ার গদি বালিশ। বড়-বড় টর্চ। মায় একটা স্পট লাইট। নেহাত আগেভাগে জানতেন না কুমারসাহেব, নয়তো তিনি তাঁর বন্দুকটাও নিয়ে নিতেন। সেটা তো আর সঙ্গে আনেননি কটোরাঘাট আসার সময়। অবশ্য আমাদের আনন্দের কাছে একটা পাহাড়ি গুপ্তি আছে।

ট্রেকার চলতে শুরু করল।

কুমারসাহেব পথ বলে দিচ্ছিলেন।

পাহাড়-জঙ্গল জায়গা, এখানে পথ বলে কিছু নেই, আন্দাজে এগিয়ে চলা। যেতে-যেতে অন্ধকার হয়ে এল।

অন্ধকারের মধ্যেও চোখে পড়ছিল— দূরে কোথাও যেন কালো মেঘের মতন ভাঙাচোরা কী দেখা যাচ্ছে। কুমারসাহেব টর্চ ফেলে বললেন, "ওগুলো ভাঙা গড়, পাথরের। কতকাল ধরে পড়ে আছে।"

ঘন জঙ্গলের এক গন্ধ আছে। সামনে গিয়ে না দাঁড়ালে বোঝা যায় না— অনুভব করাও যায় না। তবু এই গন্ধ যেন গাছলতাপাতা আর অন্ধকারের এক বন্য গন্ধ। একটু ভয়-ভয়ও হয়।

ট্রেকার যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। একই পথে বারকয়েক ঘোরাও হয়ে গেল। ঘড়িতে রাত সাড়ে আটটা প্রায়। বৃষ্টিও শুরু হল হঠাৎ।

আচমকা আমাদের ট্রেকার দাঁড়িয়ে গেল।

কুমারসাহেব টর্চ ফেললেন। দেখলেন। বললেন, "ওই দেখো।"

দেখলাম— লোহার বড়-বড় অ্যাঙ্গেলের মধ্য দিয়ে তারকাঁটা ঢুকিয়ে সামনে এক বিরাট বাধা দাঁড় করানো আছে। সোজা কথায় তারকাঁটার ফেন্সিং।

কুমারসাহেব গাড়ির জোরালো স্পট লাইট জ্বেলে দিলেন।

বোঝা গেল, ফেন্সিংয়ের ওপারে যাওয়া চলবে না, ওটা প্রোটেক্টেড এরিয়া।

কুমারসাহেব বৃষ্টির মধ্যেই আলো ফেলে-ফেলে দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন, "এ দেখছি ভয়ঙ্কর অবস্থা। প্রথমে কাঁটাতার, তারপর কংক্রিটের থাম, তারপর খাদ— ডিচ— শেষে ওয়াচ টাওয়ার। তারপর যে কী, দেখতে পাচ্ছি না। এখানে এরকম একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মতন জায়গা আছে জানতাম না তো! আশ্চর্য! ভেরি স্ট্রেঞ্জ!" (ক্রমশ)

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

ধারাবাহিক উপন্যাস

শিউলি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

কিশোর মনে একটা আঘাত লাগল। সবচেয়ে কাছের মানুষটা কেমন ঝপ করে চলে গেল ! বলা নেই কওয়া নেই। জয়ের মনটা কেমন যেন আকাশের মতো হয়ে গেল। অন্যমনস্ক সবসময়। একটা ভয় ঢুকেছে মনে। দাদি, ঠাকুমা, এঁদের তো বয়েস হয়েছে। তবে ! তবে এঁরাও তো একে-একে চলে যাবেন। জয় বাগানের শিউলিগাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিল। সারা রাত ধরে যে-ফুল ফোটে, সারা সকাল সেই ফুল ঝরে যায়। গাছ ! তোমার দুঃখ হয় না কোনও ?

গাছ বলবে, কিসের দুঃখ। এই তো নিয়ম ! পৃথিবীর যেমন নিয়ম, সেইরকমই তো হবে। জয় গাছের তলায় ঘাসের ওপর বসে পড়ল। সবে সকাল হচ্ছে। পরিষ্কার নীল আকাশ। চার্চের চূড়াটা ঝকঝক করছে। সেইদিকে তাকিয়ে জয় বসে আছে। জয়া দূর থেকে ভাইকে দেখছিল। তারও খুব দুঃখ হয়েছে। প্রকাশ করে না। তার এখন সবচেয়ে বড় চিন্তা, ভাইটাকে কেমন করে সামলানো যায় ! ছেলেটা বড় নরম প্রকৃতির। কথায়-কথায় জল এসে যায় চোখে। সকলকে নিয়ে থাকতে ভালবাসে। সকলের জন্য বড় বেশি ভাবে।

জয়া এগিয়ে এসে বলল, "এই ওঠ। চল আমার সঙ্গে। অনেক কাজ আছে। আমি একা পারব না।"

"কী কাজ রে দিদি ! এই সকালে এত কাজ তুই কোথায় পেলি ?"

"দেখবি চল।"

এই বাড়ির একটা ঘরে শুধু বই থাকে। তিনপুরুষের যত বই সব সাজানো আছে পর-পর, খোলা র‍্যাকে। দেওয়াল চাপা পড়ে গেছে। সব বই। মাসখানেক হল, একটা কি একজোড়া জ্ঞানপাগল ইঁদুর এই ঘরে ঢুকেছে। ইঁদুর তো চোখ দিয়ে পড়ে না, দাঁত দিয়ে পড়ে। কেটে-কেটে পড়ে। কেটে পড়ে কেটে-পড়ে। কিছুতেই আর খুঁজে পাওয়া যায় না তাদের। এখানে-ওখানে জমে থাকা গ্রন্থচূর্ণ দেখে শিবশঙ্কর হায়-হায় করে ওঠেন। জ্ঞানের চানাচুর। সব গেল, বেদ, বেদান্ত, অ্যাস্ট্রোনমি, ফিলজফি, শেলি, বায়রন, কিট্স। উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার/ কাঠ কাটে, বস্ত্র কাটে, করে ছারখার ॥

ইঁদুর বইয়ের কোনা ধরে জ্ঞানের গভীরে কেটে-কেটে ঢুকতে চায়। বিশ্লেষণাত্মক লেখাপড়া। শিবশঙ্কর মাথা খাটিয়ে একটা লোশন বের করেছেন। বইয়ের চারপাশে মাখিয়ে দিলে ইঁদুরের

কাছে জ্ঞান আর তেমন সুস্বাদু নাও লাগতে পারে। বইয়ের সংখ্যা তো কম নয়, আবার সব বইয়ে লাগাতে না পারলে বোঝা যাচ্ছে না, ফর্মুলাটা কার্যকর হল কি না। মূর্খ ইঁদুর বড় একটা দেখা যায় না। সকলেরই জ্ঞানের ক্ষুধা অসীম। শিবশঙ্কর বলেন, ভোরেসাস।

সিংজি চলে যাওয়ার পর লছমি এখন এই বাড়িরই এক মেয়ে। জয়ার সঙ্গে তার আর কোনও তফাত নেই। পরিষ্কার বাংলা বলে। মেয়েটা খুব ভাল। সবসময় নিজের ভাবে থাকে। শান্ত, ধীর। এই বয়েসেই অনেক হাতের কাজ জানে। একধরনের প্রতিভা। কেউ শেখায়নি। নিজে-নিজেই সব বের করে মাথা খাটিয়ে। জয়াও অনেক কিছু জানে। তাই দু'জনে খুব মিলেছে। লছমি ভীষণ পরিচ্ছন্ন, আর খুব খাটতে পারে। এ সেই জালা থেকে বেরিয়ে আসা দৈত্যটার মতো। কাজ ছাড়া থাকতেই পারে না।

এই বইয়ে মেকআপ লাগাবার কাজে লছমিও লেগে গেছে। বেশিরভাগ বইই র‍্যাক থেকে নেমে এসেছে মেঝেতে। ঘরে আর পা রাখার জায়গা নেই। জনসভা নয়, বইসভা। অভিধান, বিশ্বকোষ, বেদান্ত ভাষ্য, এঁরা যেন সব প্রধান অতিথি, সভাপতি, বিশেষ অতিথি। ঘরে পা রেখেই মনে হল, সারারাত অনেক বক্তৃতার পর যেন কারও শোকে পাঁচ মিনিটের নীরবতা চলছে। বইয়ের আড়ালে কে যেন খুসখাস করছে। সামান্য নড়াচড়া। লছমি আগেই এসে বইয়ের আড়ালে কাজে বসে গেছে। শিবশঙ্কর যে ফর্মুলাটা তৈরি করেছেন তার একটা বিশেষ গন্ধ আছে। শিকার ধরার সময় বেড়ালের শরীর থেকে নাকি এইরকম একটা গন্ধ বের হয়। সেই গন্ধে ইঁদুর চম্পট দেয়। সেই গন্ধটাই ঘরে ছড়িয়ে আছে।

লছমির একটা সুন্দর নতুন নাম হয়েছে, 'সাহারা'।

জয়া বলল, "সাহারা, তুই এসে গেছিস, আমাকে ডাকিসনি কেন ?"

"দিদি, আমি তো সেই শেষ রাত থেকে এখানেই আছি।"

"কেন রে ? তুই ঘুমোসনি ?"

"ঘুমিয়ে তো ছিলুম দিদি, কে আমাকে ডেকে দিলে। সেই সাধু, যে রোজ আমার স্বপ্নে আসে। তার হাতে সাজিভরা ফুল। এক মাথা পাকা চুল। সাদা, লম্বা, দাড়ি-গোঁফ। চোখে চকচকে হাসি। আর আমার ঘুম এল না।"

"আমাকেও ডাকবি তো !"

"তুমি কাল কত রাতে শুয়েছ বলো ? ঠিকমতো না ঘুমোলে তোমার তো শরীর খারাপ হবে !"

"তোকে বলেছে।"

বইয়ের বাধা টপকে জয় আর জয়া সাহারার পাশে চলে গেল। সেই জায়গার মেঝেতে একটু ফাঁক আছে। নিয়মটা এই হয়েছে, যেসব বইয়ের কাজ হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো চলে যাচ্ছে পেছন দিকে। আর তিনপাশে ছড়িয়ে আছে না-হওয়া বই। তার সংখ্যা কম নয়। যে-গতিতে কাজ হচ্ছে, দেখেশুনে মনে হচ্ছে, কমসে কম আরও পনেরো দিন লেগে যাবে শেষ করতে।

সাহারার পাশে বসে পড়ে জয়া বলল, "এইসব বই একা একজন পড়ে শেষ করতে পারবে !"

জয় বলল, "স্বামীজি হলে পারতেন। শুধু পারতেন না, পাতার পর পাতা গড়গড় করে মুখস্থ বলতেন। কী করে এমন হয় রে দিদি ! আমার কেন হয় না !"

"স্বামীজি এক-এক পাতা একনজরে পড়তেন। একটা অক্ষর, একটা লাইন নয়। তুই চেষ্টা কর, তোর সবটা না হলেও, কিছুটা তো হবে ! সবাই কী আর স্বামীজি হতে পারেন ? তুই চেষ্টা কর।"

সাহারা হাসতে-হাসতে বলল, "কোসিস করো ভাইয়া।"

এইসব কথা শুনলে জয়ের ভীষণ ভাল লাগে। এমন একজন হতে হবে, যার কথা সবাই মনে রাখবে। হ্যাঁ, একজন এসেছিল বটে, মানুষের মতো মানুষ ! দাদি বলেন, ইচ্ছেটাই সব। মানুষ ইচ্ছে করেছিল বলেই চাঁদে যেতে পেরেছিল। ইচ্ছে করেছে বলেই আরও দূর কোনও গ্রহে চলে যাবে একদিন। ইচ্ছাই হল বিজ্ঞান। জয় যত না কাজ করে, তার চেয়ে বেশি পড়ে। জয়া এইটাই চায়। বই হল মনের দরজা আর জানলা। ওই পথ ধরে যদি বেরিয়ে যেতে পারে, মন মশগুল। জয়ের হাতের কাছে স্বামীজির একখণ্ড রচনাবলী। পাতা ওলটাতেই একটা জায়গা বেরিয়ে পড়ল, কে আন্ডারলাইন করে রেখেছেন, "পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে ভালবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বরে ও নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ।" (ক্রমশ)

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

আঁকিবুকি — রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

আঁকো ফুলের ছবি

গত সংখ্যায় আমরা দিয়েছিলাম নতুন ছবির আভাস। কেননা, আমরা পাখি আঁকা শিখেছি আগেই। তাই আমরা গত সংখ্যায় যে-ছবির আভাস দিয়েছিলাম, সেই ফুলের ছবি এখন আমাদের আঁকার পাতায়। তোমরাও কি এই ফুলের ছবির কথাই ভেবেছিলে ? এরকম আরও ফুলের ছবি আঁকো।

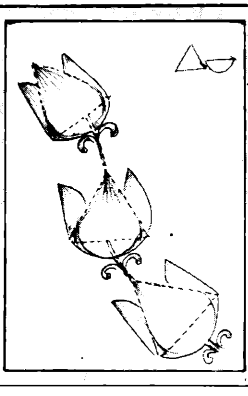

হাসিখুশি

মাস্টারমশাই বললেন, "বাবুন, তুমি খাবার খেয়ে কখনও মুখ ধুয়ে ফেলো না। আমি তোমার মুখ দেখেই বলতে পারি তুমি আজ কী খেয়েছ।"

বাবুন বলল, "বলুন তো মাস্টারমশাই ?"

মাস্টারমশাই বললেন, "চকোলেট।"

বাবুন বলল, "চকোলেট তো আমি কাল খেয়েছিলাম।"

❑

দিলীপবাবু : ডাক্তারবাবু, আপনার কথাই ঠিক হল। আপনার চিকিৎসার পর আমি নিজের

পায়ে চলতে পারছি।

ডাক্তারবাবু : এ-কথা জেনে আমি খুব খুশি হলাম।

দিলীপবাবু : আসলে, ডাক্তারবাবু, আপনার বিলের টাকাটা জোগাড় করতে গিয়ে আমাকে গাড়িটা বিক্রি করে দিতে হল।

ছবি : দেবাশিস দেব

ইতিহাস

সলোমন রাজার রত্নভাণ্ডার ছিল যে-দেশে

মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশে প্রাচীন শহর ও সভ্যতা চিহ্নিত করা এবং তাদের সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। লিখেছেন **সুব্রত রায়**

পূর্বে ইরান। উত্তরে ইরাক এবং কুয়েত। দক্ষিণে ইয়েমেন। আর পশ্চিমে রোমাঞ্চকর মিশরসমেত আফ্রিকা।

মাঝে লোহিত সাগর, আরব সাগর এবং ওমান খাড়ি দিয়ে ঘেরা মরা জমি ও ধু-ধু বালির দেশ সৌদি আরব। জমি মরা হলে কী হবে। ভেতরে লুকনো আছে অজস্র তেলের খনি। তরল সোনা পেট্রোলিয়ম।

বহুযুগ আগে, এক, দেড় কি দু' কোটি বছর হবে,মধ্যপ্রাচ্যের এই অংশটি পূর্ব আফ্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তখন বিশালকায় হাতি, জিরাফ, গণ্ডারেরা আফ্রিকা থেকে হেঁটে আরব ডিঙিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশ পার হয়ে নেপাল অবধি উঠে আসত। সে-সময় অবশ্য মানুষ ছিল না। ছিল প্রায়-মানুষ ড্রায়োপিথেকাস। এখন তারা বিলুপ্ত প্রাণী।

কেবল প্রাচীনকালে নয়, মধ্যপ্রাচ্যের এই অঞ্চলটি বরাবর নানা সভ্যতার বিকাশ, সুরক্ষা ও বৃদ্ধিতে কাজ করে এসেছে। কখনও যোগাযোগের সড়ক, কখনও ব্যবসাবাণিজ্য, কখনও বা ধর্মের পীঠস্থান। তিন হাজার বছর আগে আরব ছিল সুগন্ধি আতর, ধূপ, মসলা আর সোনার খনি। রূপকথার রাজ্য। এই শতাব্দীর তিনের দশকে সভ্যতার কাছে এই অঞ্চলের চূড়ান্ত অবদানটি খুঁজে পাওয়া গেল। সোনার রং তেল। পেট্রোলিয়ম। না হলে আজকের যন্ত্রপাতি, গাড়িঘোড়া, চাকা সব বিকল। ১৯৮৩ সালে আমেরিকার কলোরাডো থেকে কিছু খনি বিশেষজ্ঞ এবং সৌদি পুরাতাত্ত্বিকেরা মিলিতভাবে এখনকার ইয়েমেনের সীমানায় খননকাজ চালান। প্রতিকূল পাহাড়ি এলাকা। সরকারি বিধিনিষেধ ও সহযোগিতা। এসব অসুবিধে সত্ত্বেও অনুসন্ধানকারী দলটি খুশি। তাঁরা অন্তত ১০টি খনি খুঁজে পেয়েছেন। যার আকর থেকে সোনা,তামা এবং লোহা পাওয়া যাবে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পুরনো একটা শহর আবিষ্কার করেছেন। সেখানে যেসব সামগ্রী পাওয়া গেছে তা ঐতিহাসিক বিচারে

মাদাইন সাল-এ ধনী নাবাশিয়ানদের কবর এখন ধ্বংসস্তূপ। দরজায় খোদাই-করা ঈগলগুলি ভাঙা

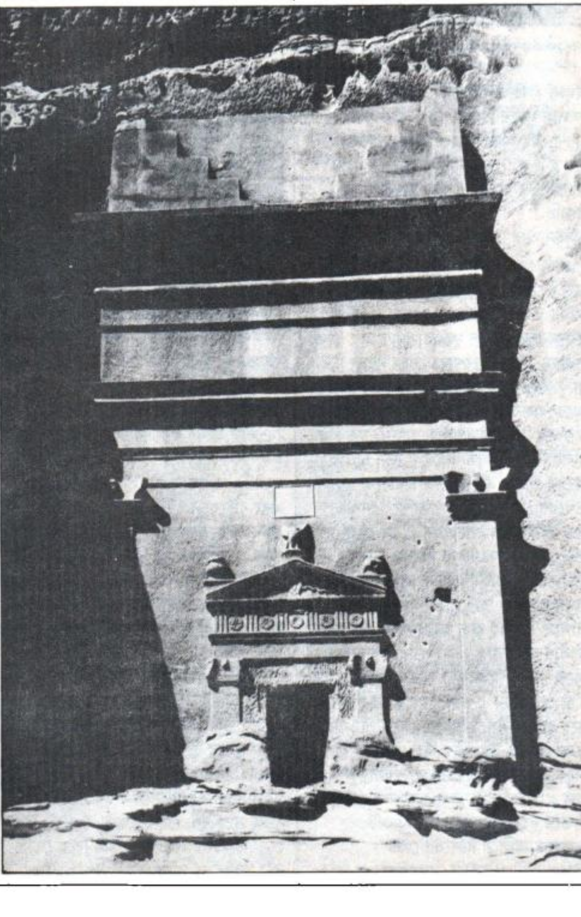

আল ফাও-এ পাওয়া আরবি মুরাল চিত্রকলা যেন কোনও আধুনিক শিল্পীর হাতে আঁকা

অমূল্য। গ্রিক বাইজানটাইন এবং প্রথম ইসলাম যুগের জিনিসপত্র। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই অঞ্চলে এক বিখ্যাত রাজার রাজত্ব ছিল। তাঁর নাম সলোমন। তাঁর বিচারবুদ্ধির অসামান্য গল্প আমরা সবাই শুনেছি।

বেদুইন আর খেজুরের দেশ আরব ভূখণ্ডে মরূদ্যানগুলি ঘিরে অনেক জনবসতি ও শহর গড়ে উঠেছিল। উত্তরের এমন এক শহর তাইমা। খ্রিস্টের জন্মের হাজার বছর আগে এখানে ছিল কেবল ফুলের সমারোহ। এত মনোরম প্রাকৃতিক শোভা দেখে নতুন ব্যাবিলনীয় সম্রাট নাবোনিডাস ব্যাবিলন থেকে রাজধানী তাইমা সরিয়ে আনেন। তাঁর রাজপ্রাসাদ এখনও মরুভূমির বালির নীচে লুকিয়ে আছে। তিন হাজার বছরের প্রাচীন এই নগরের চারদিকে ছিল পাথরের দেওয়াল। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বালি খুঁড়ে তার হদিস পেয়েছেন। সে-দেওয়াল আজও অটুট। ফ্রান্সের বিখ্যাত ল্যুভর মিউজিয়ামে 'তাইমা স্টোন' নামে একটি পাথর আছে। তার গায়ে অ্যারামাইক লিপিতে খোদাই করা আছে নতুন এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্মবৃত্তান্ত। মন্দিরের ভগ্নাবশেষ থেকে সৌদি গবেষকরা আরও একটি পাথর খুঁজে পেয়েছেন। হামরা নামে এই পাথরের গায়ে ব্যাবিলনীয়, মিশরীয়, মেসোপটেমীয় সমেত আরও বহু ধর্মীয় চিহ্ন আঁকা। এর থেকে প্রমাণ হয় তাইমা ছিল ধর্মসহিষ্ণু শহর। আরবীয় উপসাগরের দেড় মাইল ভেতরে দহরান অঞ্চলে আর-একটি খননকাজ চালিয়ে মিশরের স্টেট ইউনিভার্সিটি ও সৌদি গবেষকরা

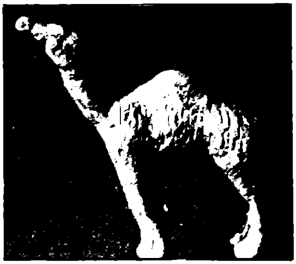

ব্রোঞ্জের তৈরি পুরুষ উটের গায়ে আঁকিবুকি

মেসোপটেমীয় সভ্যতার হাঁড়ি-কলসি, মিশরীয় আসবাবপত্রের টুকরো খুঁজে পান। দুই পৃথক সভ্যতার এ এক যোগসূত্র। সুমেরীয় প্রবাদ ও রহস্যে ঘেরা 'ডিলমান' এবং বাইবেলে বর্ণিত ফুলের দেশ ইডেন। এই দুটোই আরব ভূখণ্ডের পূর্ব উপকূলে ছিল বলে পুরাতাত্ত্বিকদের স্থির বিশ্বাস। কয়েক হাজার বছর পরে মধ্য ও দক্ষিণ আরবে নতুন সংস্কৃতি ও সভ্যতার জন্ম হয়। বাইবেলের সাবা বা সিবা হল এখনকার ইয়েমেন। প্রচুর জল, খাদ্য ও ধনসম্পত্তি ভরা এই অংশ থেকেই খ্রিস্টজন্মের প্রায় ৭০০ বছর আগে আরবি লিপির সৃষ্টি হয়।

আরবে উটই প্রধান যাতায়াত ব্যবস্থা। দক্ষিণাংশের উপজাতীয়রা খ্রিস্টজন্মের আড়াই হাজার বছর আগে প্রথম উটকে গৃহপালিত জন্তু হিসেবে পোষ মানায়। একই সঙ্গে দুধ, মাংস, চামড়া ও ঘর—উট জোগায় সমস্ত। উটের লোম দিয়ে তৈরি তাঁবু মরুভূমির পক্ষে দারুণ উপযোগী।

কারকোরের যুদ্ধে আসেরীয় রাজা তৃতীয় সালমানেসের-এর বিপক্ষে এক হাজার উটবাহিনীসমেত গিনডিব্যু 'আরিবিদের দেশ' থেকে দামাস্কাসের রাজার সঙ্গে যোগ দেয়। ৮৫৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লেখা এক আসিরীয় নথিতে এ-কথা বলা আছে। প্রাচীন আরবে সিংহমুণ্ড ছিল সম্ভ্রমের প্রতীক।

উত্তর-পশ্চিমে জর্ডন সীমান্তের কাছে মাদাইন সালে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ধনীদের সিংহমূর্তি বসানো সমাধি-মন্দিরের সন্ধান পেয়েছেন। দরজায় পাথরের ঈগল। এই অঞ্চল ছিল নাবাশিয়ানদের রাজত্ব। আল ফাও-এ সিংহমুণ্ড ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে সিলমোহর হিসেবে ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

ইয়েমেন সীমান্তের কাছে আল ফাও ছিল মূলত ব্যবসার কেন্দ্র। সৌদি বিশেষজ্ঞরা এই অঞ্চলে একটি বড়সড় সুক বা বাজার আবিষ্কার করেছেন। দেওয়াল-ছবি আঁকা একটি প্রাসাদ এবং ব্রোঞ্জের মূর্তিসমেত ছাদবিহীন উঁচু এক মন্দিরও উদ্ধার করেছেন তাঁরা। আর পাওয়া গেছে স্থানীয় টাঁকশালে ছাপানো কিছু মুদ্রা, মাটির হাঁড়ি-কলসি ও অঞ্চল জুড়ে বিস্তারিত জলসরবরাহ ব্যবস্থা। এই কাজগুলিতে নিলনদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠা সভ্যতা ভূমধ্যসাগরীয় ও সিরিয়ান সভ্যতার ছাপ স্পষ্ট। পূর্ব সীমান্তে দহরানের কাছে থাজ। এর ১২ মাইল চত্বরের মধ্যে দেড় কোটি বছরের পুরনো জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। জনৈক অপেশাদার 'পাথর কুড়োনে' প্রথম এই অঞ্চলে একটি চোয়ালের টুকরো ও চারটি পৃথক ভাঙা দাঁত খুঁজে পান। বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্তে আসেন এগুলি সোয়া কোটি বছর আগে হারিয়ে যাওয়া প্রায়-মানুষ ড্রায়োপিথেকাসের কঙ্কালের অংশবিশেষ। এখন এই সংগ্রহ লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে।

তিন হাজার বছর আগে লোহিত সাগরের পাড়ে দেদান রাজ্যের রাজধানী ছিল মরূদ্যান নগরী আল উলা। প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে নগর জীবন কাটিয়ে ও স্নিগ্ধ এই মরূদ্যান রুক্ষ লাল বালিপাথরের পাহাড়ের পাশাপাশি নিজেকে অক্ষত সবুজ রেখেছে। ১৩০০ বছর আগে উমায়াদের সময়ের কোনও সেনাপতি এখানে একটি দুর্গ গড়েছিলেন। এখন সেখানে সৌদি আরব, জার্মানি, ফিলিপিন এবং জর্ডন দেশের আন্তর্জাতিক সমীক্ষক দলের মূল শিবির। সঙ্কল্প, সলোমন রাজার রত্নভাণ্ডার এই রোমাঞ্চকর দেশ জুড়ে প্রাচীন শহর ও সভ্যতাগুলিকে চিহ্নিত করা এবং তাদের সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া।

গল্প-লেখকদের নিয়ে

গল্পকারের গল্প
শৈলেনকুমার দত্ত
মণ্ডল বুক হাউস
কলকাতা-৯
দাম : ১৬ টাকা

নিছক রূপকথা, রহস্য কিংবা শিকারের গল্পের বই নয়। শিশু ও কিশোর উপযোগী গল্প লিখে বিশ্বসাহিত্যে যাঁরা আজ বিখ্যাত, সেরকম কয়েকজন লেখকের জীবনকথা নিয়ে এই বইটি। হ্যান্স অ্যান্ডারসন ওডেন্সের যে ঘরটিতে জন্মেছিলেন, তা কীভাবে একদিন মিউজিয়ামে পরিণত হল, জ্যাকব ও উইলহেম কীভাবে কোটি-কোটি মানুষের কাছে আপন হয়ে উঠলেন, জুলে ভের্ন-এর বই পড়ে অ্যাডমিরাল বার্ড কীভাবে দক্ষিণ মেরু অভিযানের প্রেরণা লাভ করেছিলেন। এ ছাড়া রয়েছে অস্কার ওয়াইল্ড, এইচ. জি. ওয়েল্‌স, চার্ল্‌স ডিকেন্স, আলেকজান্ডার ডুমা, ঈশপ, জিম করবেট, কোনান ডয়েল, মার্ক টোয়েন-এর মতো অসাধারণ ও বিরল স্রষ্টার জীবনকথা। সুন্দর ভাষায় লেখা এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির জন্য লেখককে ধন্যবাদ।

খেলার নিয়ম নিয়ে বই

অ্যাথলেটিক্‌সের আইনকানুন
কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী
কালিকা প্রেস প্রাঃ লিমিটেড
কলকাতা-৬
দাম : ২০ টাকা

অ্যাথলেটিক্‌স নিয়ে যাঁরা মেতে আছেন, তাঁদের সকলেরই উচিত ঠিক সময় নিয়মকানুনগুলি ঠিকমতো জেনে নেওয়া। তা হলে কোনওভাবেই ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। আই. এ. এ. এফ-এর ১৯৯০-'৯১ সালের 'রুল্‌স বুক' থেকে অনূদিত এই বইখানি পড়লে উপকার পাওয়া যাবে। ছাপার ভুল এড়াতে পারলে বইখানি আরও ভাল হতে পারত। তবু বলতে হয়, এ-ধরনের বই তো খুব বেশি লেখা হয় না। বইটি সে অভাব পূরণ করেছে।

সমীর ঘোষ

ছড়ার মজা

ভীম পালোয়ান
জনা গাঙ্গুলি
প্রজ্ঞা প্রকাশন
কলকাতা-৪
দাম : আট টাকা

ছড়ার যেটুকু মজা, সবই তার ছন্দে, যা দোলা দিয়ে যায় অন্তরে, তার চ্যুতি ঘটলেই সব মজা শেষ। সেই কারণেই ছড়াকারকে সবসময়ই থাকতে হয় সতর্ক, ছন্দ-সচেতন। না, সেদিক থেকে এই গ্রন্থের গ্রন্থকারকে সম্পূর্ণ সার্থক বলা যাবে না। তাঁর যেটুকু ত্রুটি তার সবই ছন্দে, মাত্রায়। এর বাইরে বিষয় বিন্যাসে, ভাবনায় তিনি সার্থক। যেমন, তাঁর অধিকাংশ ছড়ায় কাহিনীই প্রধান। কোনওটি ভীম পালোয়ানকে নিয়ে, কোনওটি আবার ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈকে নিয়ে। একই সঙ্গে তিনি মজা এবং শিক্ষণীয় কথাও শোনাতে চান পাঠকদের। বিশেষ করে তাঁর পাঠকরা যখন ছোট, তখন তো কথাই নেই। হ্যাঁ, ছোটরা এই বই পড়ে ছড়ার মাধ্যমে অনেক ভাল-মন্দ বুঝতে শিখবে। তবে যেটা আগেই বলেছি, পড়তে গিয়ে কোথাও কোথাও ছোটরা হোঁচট খাবে ছন্দেই। সেটুকু বাদ দিলে এ বই ভাল।

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

দোয়েল কোয়েল সোনাই মোনাই
বিষ্ণু সামন্ত
নান্দনিক প্রকাশন, দুর্গাপুর
দাম : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

শিশুদের ছড়া যে কেবলমাত্র কল্পনার বস্তু নয়, সেখানেও যে আনন্দ ভাবনার বিস্তর খোরাক আছে তার আশ্চর্য প্রমাণ রেখেছেন কবি-শিল্পী বিষ্ণু সামন্ত তাঁর 'দোয়েল কোয়েল সোনাই মোনাই' ছড়ার বইটিতে। ৪০ পৃষ্ঠার এই ছোট্ট ছড়ার বইটির পাতায়-পাতায় ছবি আর ছন্দের চমৎকার কারুকাজ।

এবার ছড়া ছড়িয়ে পড়া
প্রণব মাইতি
সম্প্রতি প্রকাশ, কাঁথি, মেদিনীপুর
দাম : ১০ টাকা

প্রণব মাইতি-র 'এবার ছড়া ছড়িয়ে পড়া' বইটি হাতে পেলে ছোটরা এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলবে। পাতায়-পাতায় ছড়া। ছড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছবি। ছন্দের ব্যবহারে, বিষয়-বৈচিত্র্যে বইটিতে ব্যাপ্তি ধরা পড়েছে। ছড়াগুলি খুব মন দিয়ে পড়লে দেখা যায় কল্পনার সঙ্গে বাস্তবতা ছড়িয়ে রয়েছে।

পদ্মবনে পেখম পরে
এম সাকিল আহমেদ
কুসুমের ফেরা প্রকাশন,
ডায়মন্ডহারবার, দঃ ২৪ পরগনা
দাম : সাত টাকা

এম সাকিল আহমেদ-এর ছড়ার বই 'পদ্মবনে পেখম পরে'। ৩৭টি ছড়া নিয়ে ৫৬ পৃষ্ঠার বই। পাতায়-পাতায় ছড়িয়ে আছে অজস্র মজা আর কৌতুক। যেমন, 'ভূত-দর্শন' ছড়াটিতে ভূতদের অদ্ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা নিয়ে এমন এক অপরূপ কল্পলোক রচনা করেছেন কবি, যা সুন্দর।

তাপস রায়

গোয়েন্দা গল্পের সম্ভার

শার্লক হোম্‌স রচনা সমগ্র
অনুবাদ : কবিতা পাল ও সুশান্ত পাল
বসাক বুক স্টোর,
শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০ ০৭৩
দাম : ৯০ টাকা

বিশ্বসাহিত্যের বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র সার আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোম্‌স। রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনীর নামের সঙ্গে একবাক্যে এই নামটিই উচ্চারণ করেন সকলেই। ঘটনাচক্রের পারম্পর্যে ও বুদ্ধিমত্তায় আর্থার কোনান ডয়েলের কাহিনী এতই বাস্তব ও আকর্ষক, যে কোনান ডয়েলকে ছাপিয়ে গিয়েছিল তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র শার্লক হোম্‌স। পাঠকদের অসীম আগ্রহ এবং কৌতূহলের চাপে তাঁর এই অনন্যসাধারণ চরিত্র পাঠকদের কাছে আজও সমান জনপ্রিয়। আর্থার কোনান ডয়েলের লেখা শার্লক হোম্‌সের এই কাহিনী

অনূদিত হয়েছে পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই। আমাদের বাংলা ভাষাতেও এই কাহিনী একাধিকবার অনূদিত হয়েছে। কবিতা পাল ও সুশান্তকুমার পালের অনুবাদ সহজ ও স্বচ্ছন্দ। বইটির নাম শার্লক হোম্‌স রচনা সমগ্র। অঞ্জন বসুর প্রচ্ছদও আকর্ষক। বইটিতে প্রকাশকের সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

উজ্জ্বলকুমার দাস

নানারকম

ধাঁধা

শীতটা এবার জমলই না। এই ক'দিন কনকনে হাওয়া, তারপরই আচমকা অসহ্য গরম। সকালের ঠান্ডা ভাব দেখে যদি-বা সোয়েটার পরে বের হলে, দুপুরে সেই সোয়েটারই খুলে ফেলতে ইচ্ছে করে, হঠাৎ এমন গরম। টানা শীতের দুটো মাস এবার যেন ভোগ করাই হল না।
এই টানাপোড়েনের জন্যই বোধ হয় ছোড়দিরও এবার উলবোনায় তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। বাবার জন্য একটা বুক-খোলা ক্রিম রঙের সোয়েটার শুরু করেছিল ছোড়দি, অর্ধেকের বেশি বোনা হয়ে গিয়েছিল সেই জানুয়ারি মাসে, কিন্তু সে সোয়েটার আর শেষ হল না। এমনিতেই ছোড়দি একটু বেশি খুঁতখুঁতে, রং পছন্দ হয় তো ডিজাইন মনঃপূত হয় না। ডিজাইন একটা ঠিক হল তো, কিছুটা বুনে ফের খুলে ফেলল সেটা। কী, না, যার জন্য বোনা তার পক্ষে এটা মানানসই নকশা নয়, অথবা এই রঙে এই নকশাটা খুলছে না ঠিকমতো।
তো, এই মার্চে এসে ছোড়দি দেখি বাবার জন্য বোনা সোয়েটারটার অংশ আর বাকি গোলাগুলো তুলে রাখছে আলমারিতে। এ-বছর যখন শেষ হল না, সামনের বছর নতুন করে ভাববে। সেই সূত্রেই ছোড়দির বোতামের থলিটাও আবার বেরোল আলমারি থেকে। রাশি-রাশি বোতামের মধ্যে মিশিয়ে দিল বাবার

সোয়েটারের জন্য কেনা নতুন ক্রিম রঙের বোতামগুলো।
ব্যাপারটা যে ছোট্‌কারও চোখে পড়েছে, বুঝতে পারলাম নতুন ধাঁধা চাইতে গিয়ে। দিব্য একটা বোতামের ধাঁধা শুনিয়ে দিল ছোট্‌কা আমাকে। সেটা দিয়েই শুরু করছি এবার।
প্রথম ধাঁধা ॥ একটা থলিতে চার রঙের বোতাম আছে, প্রতি রঙের পনেরো খানা করে। রং চারটেই আলাদা, কিন্তু মাপে এক, নকশাও একই রকমের। একজনের একই রঙের পাঁচটা বোতাম লাগবে। সে যদি অন্ধকারে থলিটা হাতড়ে একই রঙের পাঁচখানা বোতাম বের করতে চায়, তা হলে কমপক্ষে ক'টা বোতাম তাকে থলি থেকে তুলে আনতে হবে বলতে পারো, যাতে নিশ্চিতভাবে এক রঙের অন্তত পাঁচখানা বোতাম তার হাতে আসে?
দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কোন গমে তরকারি রান্না হয়?
তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও— মাঘনয়না
গতবারের উত্তর ॥ (১) একটা পঞ্চাশ টাকার নোট, একটা পাঁচ টাকার নোট এবং চারটে দু' টাকার নোট—এইভাবেই ব্যাগটায় ছিল মোট তেষট্টি টাকা। (২) করমচা। (৩) রাঘববোয়াল।

সত্যসন্ধ

ভাবতে-ভাবতে

জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা ভারতে সেই প্রাচীনকাল থেকে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্টের নাম তো সকলেরই জানা। পরে তাঁরই নামে ভারত আর্যভট্ট উপগ্রহ পাঠিয়েছে মহাকাশে। এখন তো আমাদের দেশ জ্যোতির্বিজ্ঞানে অনেক এগিয়ে গেছে। আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চা এখন বেশ গর্ব করার মতো।

আমাদের এবারের ভাবতে-ভাবতে হল জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে। এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আনন্দও আছে অনেক।
১। কোন গ্রহের চাঁদের নাম 'ট্রিটন' এবং 'নেরিড'?
২। কোন গ্রহের ঘনত্ব সবচেয়ে কম?
৩। পৃথিবীর সূর্যঘড়িটির নাম কী?
৪। কোন বিজ্ঞানী ইউরেনাস গ্রহের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন?
৫। বৃহত্তম গ্রহাণুর নাম কী?

উত্তর : (১) নেপচুন। (২) শনি। (৩) সম্রাট যন্ত্র। (৪) উইলিয়াম হার্শেল। (৫) গ্যানিমিড।

বর্ণপ্রিয়

মজার খেলা

দেশলাইকাঠি দিয়ে নয়, পয়সা দিয়ে নয়, তাস দিয়ে নয়, লুডোর ঘুঁটি কিংবা ছক্কা দিয়ে নয়, স্রেফ কাগজ আর পেনসিল দিয়ে একটা চটজলদি মজার খেলা শিখলাম এই সেদিন। আর এই খেলাটা কে শেখাল জানো? ক্লাস ফাইভের একটা ছোট্ট ছেলে। ছেলেটি ছোট্ট, কিন্তু তার অঙ্কের মাথাটি বেশ পাকা। একশোতে বরাবর একশো পায়। সেই ছেলেবেলা থেকে। পাড়ার স্কুলে পেত, এখন দূরের নামী স্কুলে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু অঙ্কের নম্বরটা একই রয়েছে আজ পর্যন্ত।
তো, ছেলেটির কথা থাক। তার শেখানো খেলাটার কথা বলি বরং। সে করল কী, একটা কাগজে গড়গড় করে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত লিখে ফেলল, তারপর আমার হাতে কাগজটা ধরিয়ে দিল। ঠিক ১ নম্বর ছবির মতো।

১ ২ ৩ ৪ ৫
৬ ৭ ৮ ৯

১ নং ছবি

কাগজটা নিলাম। এবার বললাম, "খেলাটা কী?" সে বলল, "খুব সহজ খেলা। তুমি করবে কী, এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে, যেখানে যেমন দরকার, হয় যোগচিহ্ন না হয় বিয়োগচিহ্ন বসাবে। শুধু খেয়াল রেখো, শেষপর্যন্ত যেন উত্তর হয় একশো। আর হ্যাঁ, এর জন্য সময় পাবে মাত্র দু মিনিট।"
আমি তো ভেবে যাচ্ছি। কেবল ভেবে যাচ্ছি, কোথায় যোগচিহ্ন বসাব আর কোথায় বিয়োগচিহ্ন। ভাবতে-ভাবতে, ভাবতে-ভাবতে, মনে-মনে যোগ আর বিয়োগ, যোগ আর বিয়োগ করতে-করতে, থই আর পাই না। হঠাৎ ছেলেটি বলল, "পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে।" এবার আমি লজ্জা পেলাম। তাই তো, সত্যি-সত্যি সময় বহুক্ষণ পেরিয়ে গেছে। আমি বললাম, "হচ্ছে না। করে দেখাও।" সেই ছোট্ট ছেলেটি তখনই যোগচিহ্ন আর বিয়োগচিহ্ন বসিয়ে দিল কাগজটায় লেখা সংখ্যাগুলোর মধ্যে। ঠিক এইভাবে, দু' নম্বর ছবির মতো করে।

১২৩–৪৫–৬৭+৮৯=
১০০

২ নং ছবি

তাই তো! আমি শূন্য। সে আর-একবার একশোয় একশো।

মজারু

ছবি : দেবাশিস্ দেব

গুঁড়ো নীলের বিচ্ছিরি দাগ আর নয়

জামাকাপড়ে আনুন উজালা'র চোখধাঁধানো শুভ্রতা

গৃহিনীদের জন্যে সুখবর ! বহু বছরের অক্লান্ত গবেষণার পর জ্যোতি ল্যাবরেটরীজের বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন একটি বিশেষ ফর্মূলার উপাদান । নাম, ভি + (V Plus)। আর সেই ভি + 'এরই বৈজ্ঞানিক শক্তির সাহায্যে তাঁরা তৈরী করেছেন যুগান্তকারী এক তরল ফেব্রিক হোয়াইটেনার – উজালা সুপ্রীম *।

আপনার সদ্য ধোওয়া জামাকাপড়ে সাধারণ গুঁড়ো নীল ছেড়ে যায় বিচ্ছিরি দাগ।

ভি + 'এর বৈজ্ঞানিক শক্তিযুক্ত উজালা, আপনার জামাকাপড়কে করে দাগহীন, ঝলমলে সাদা।

ভি + (V Plus) কী ? সাধারণ গুঁড়ো নীল জলে ঠিকভাবে মেশেনা, তাই তলানি পড়ে। পরিষ্কার ধোওয়া জামাকাপড়ে সেই তলানি ছেড়ে যায় বিচ্ছিরি দাগ । অন্যধারে ভি + ফর্মূলার উজালা নিমেষেই সমানভাবে জলে গুলে যায় এবং কাপড়ের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে গিয়ে আনে শুভ্রতার জোয়ার।

এক লিটার জলে শুধু চার ফোঁটা উজালা মেশান । এবার সদ্য ধোওয়া জামাকাপড় তাতে ডুবিয়ে আলতো হাতে নিংড়ে নিন। তারপর দেখুন জামাকাপড় কেমন চোখের নিমেষেই হয়ে উঠেছে চোখধাঁধানো সাদা। এবং কত সহজেই !

এরপরও কী সাধারণ ডেলা পাকানো গুঁড়ো নীলের বিচ্ছিরি দাগ ভালো লাগবে আপনার ?

UJALA
Supreme
From Jyothy Laboratories

* ভি + সমৃদ্ধ উজালা সূতীর কাপড় ছাড়াও ব্লেণ্ডেড কাপড়, উলের এবং সিন্থেটিক কাপড়েও নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন।

ANANDAMELA 16 MARCH 1994 REGD. NO.
WB/CC/264 MH-BY-SOUTH-683 TN/MS(C) 731
আজও আছে
হার মানে, যার কাছে
Shalimar's COCONUT OIL
Chemical Works Limited
Shalimar's COCONUT OIL
Chemical Works Limited
Shalimar's COCONUT OIL
Chemical Works Limited
শালিমার
নারকোল তেল
বহু যুগ ধরে এক বিশ্বস্ত নাম
শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা-৭০০ ০২৭.
TSPL/SCWL/93-B1